আদিবাসী লোককথা

প্রথম খণ্ড

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

Adibasi Lokokatha (Volume One)

Dibyajyoti Majumdar

প্রথম প্রকাশ : ১ অক্টোবর ১৯৫৪

প্রকাশক

অরুণ ঠাকুর

গীতা প্রকাশনী

৫৪/১ সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৪

মুদ্রাকর

জি. আর. টি. প্রিন্টার্স

৫৪/১ সি শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদপট :

শংকর দাস

শ্রীব্যোমকেশ বিশ্বাসকে

যাঁর কাছে অনেক পেয়েছি অনেক অনেক শিখেছি

এই লেখকের অন্যান্য বই

আদিবাসী লোকসাহিত্যে বিদ্রোহী মন

লোকসমাজ ও পশুকথা

সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব

নানান দেশের লোককথা

দশদিগন্তের পশুকথা

লোকসমাজ ও আগুনের লোককথা (যন্ত্রস্থ)

প্রস্তাবনা

আদিবাসী লোককথা (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের ষোলটি ও ভারতের আঠারটি আদিবাসী লোককথা। রূপকথা, পশুকথা, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তির গল্প এতে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লোককথা। এবং তৃতীয় খণ্ডে আমেরিকা মহাদেশ, প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী লোককথা।

প্রকাশিত সমস্ত লোককথাই আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্যের উজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করছে। সমস্ত লোককথাই আগে সংগৃহীত হয়ে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই অর্থে এগুলি মূল আদিবাসী মৌখিক ভাষা থেকে অনুবাদের অনুবাদ। তবে, যেসব গ্রন্থ থেকে এগুলি নিয়েছি সেই গ্রন্থের গল্পগুলি মূল আদিবাসী ভাষা থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছিল। আমি অত্যন্ত পুরনো গ্রন্থের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছি। কারণ, সমাজ যখন আরও সংহত ছিল তখনকার মানসিকতার ছাপ এর মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃহত্তর দুনিয়ার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে এই সম্পর্ক নিবিড়তর হল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হল। অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। আধুনিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হল। এটাই অভিপ্রেত। আদিবাসীদের যে উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করতে হবে, সেইসঙ্গে আধুনিক দুনিয়ার বিজ্ঞাননির্ভর সভ্যতার আলোকও গ্রহণ করতে হবে। 'অতীত অন্ধকারের' মধ্যে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার পরিকল্পনা অমানবিক, সামাজিক অপরাধের আর এক নাম। এই যোগাযোগের ফলে তাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটবে, বৃহত্তর সমাজে আমরা সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হব, আমরা এক হব,—আজকের দিনে এই মানসিকতার প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য তাদের উন্নত ঐতিহ্যকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। এই ধারনায় বিশ্বাসী হয়েও পুরনো সংগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। কেননা, তাদের পুরনো সামাজিক জীবনের কিছুটা 'অকৃত্রিম' চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছি। অবশ্য, মৌখিক সাহিত্যে অকৃত্রিম বলে কিছু নেই।

কেননা, কথক তার মনের মাধুরী মেশাবেনই। যখন যোগাযোগ কিছুটা কম ছিল, চিন্তায় মিশ্রণ স্বল্প ছিল, তখনকার মনকে পাওয়া যাবে এইসব গল্পে। আর যে সব গল্পে রয়েছে সামাজিক জীবনের ছবি ও যে গল্পগুলো প্রায় অপরিচিত, সেগুলোই নির্বাচন করেছি।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমি অকুণ্ঠ উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত ও শ্রীদুলাল চৌধুরীর কাছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও সহায়তা আমি এদের কাছে লাভ করেছি তাতে আমি মুগ্ধ। তারা আমার বন্ধু, আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকলৌকিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতপন চক্রবর্তী 'পরিশিষ্ট' অংশ লিখবার সময় অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। তার সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোরের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছে নানাভাবে অনুপ্রাণিত হবার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার সরকার ও বন্ধু শ্রীসুহৃদ ভৌমিক সামাজিক অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় কিছু গরমিল শুধরে দিয়ে বিশেষ উপকার করেছেন। সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে একটি আপত্তির কথা জানাই। ট্রাইব-উপজাতি-আদিবাসী শব্দগুলো আমার কাছে আপত্তিজনক বলে মনে হয়েছে। নৃতাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক যে যুক্তিই দেখান না কেন, যাদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা হয় তারা খুব ভালোভাবে এটা গ্রহণ করেন না। আফ্রিকার আশান্তি ও হাউসা গোষ্ঠীর দুজন ছাত্রের সঙ্গে কলকাতায় পরিচয় হয়েছিল। তারা ট্রাইব শব্দটি ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৮২ সালের ৩১ জানুয়ারি কলকাতায় কেনিয়া থেকে এক নৃত্যদল এসেছিলেন। তাদের মধ্যে নানদি, মাসাই, আকিকুয়ু গোষ্ঠীর শিল্পী ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাদের ইণ্টারভিউ নিতে গেলে ট্রাইব শব্দটিতে তারাও আপত্তি জানান। আমার যেসব সাঁওতাল ও মুণ্ডা বন্ধু রয়েছেন, আদিবাসী শব্দে তারাও ক্ষুব্ধ। জনগোষ্ঠী যদি বিশেষ নামে আপত্তি করেন, তবে সৌজন্যের খাতিরেই সেটা ব্যবহার করা বোধহয় সঠিক নয়। নৃতাত্ত্বিকদের এ বিষয়টি ভাবতে হবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আপত্তি সত্ত্বেও আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। অন্য উপায় এখনও নেই। তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে এই সম্পদ সংহত সমাজের মনটিকে ধরে রাখে। মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত বলেই এর মধ্যে আদিমতা ও অকৃত্রিমতার কোনো 'পবিত্র বিশুদ্ধ' গুণ থাকতে পারে না। যেহেতু সংহত সমাজ তাদের সংস্কৃতিকে অন্য প্রভাব থেকে বাঁচাতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন, তাই লোককথাগুলি তারা যেমন শোনেন সেভাবেই উত্তর-পুরুষের কাছে বিবৃত করতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু যত ধীরগতিতেই হোক না কেন, প্রতি সমাজেই প্রতি মুহূর্তেই বিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অন্যদের সংস্পর্শে না এলেও পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ের ফলে অভিজ্ঞতা বাড়ছে, পিতার অভিজ্ঞতা পুত্র গ্রহণ করেছেন, আবার পুত্র নতুনভাবে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছেন। শিকার-কৃষি-বাসস্থান প্রভৃতিকে ঘিরে যন্ত্র ও অস্ত্রের বিবর্তন হচ্ছে, হাত ও মস্তিষ্ক আরও পটু হচ্ছে, চিন্তা-চেতনার উন্নয়ন ঘটছে। সহজে অনুভূত না হলেও সামাজিক বিবর্তন ঘটেই চলেছে। পৃথিবীর কোনো সমাজই প্রতিনিয়ত বিবর্তিত না হয়ে থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা যখন বাড়ছে, চিন্তা-চেতনায় যখন নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, তখন অজ্ঞাতেই তার মৌখিক ঐতিহ্যে পরিবর্তন ঘটবে, সচেতনভাবে না চাইলেও ঘটবে। যে সময়ে কথক লোককথা শোনাবেন সেই কালের কিছু কথা তার মধ্যে প্রবেশ করবেই। আবার পরবর্তী পুরুষে যদি সেই সমস্যা না থাকে হয়তো লোককথার মধ্যে থেকে সেটি বাদ পড়বে। এই গ্রহণ-বর্জনের রীতিকে ধরেই লোককথা বয়ে চলে। তাই বিশেষ কোনো কালের সামাজিক ইতিহাসের সুস্পষ্ট কোনো হদিস এর মধ্যে মিলবে না। হয়তো বিশেষ কালের রীতি-নীতি-লোকাচারের অস্পষ্ট রেশ থেকে যেতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র তার ওপরে ভিত্তি করে সেই কালের ইতিহাস খোঁজা নিরর্থক।

তবু একটা কথা মনে রাখতে হবে, লোককথার মধ্যে সামাজিক মনটি ধরা পড়ে। মানুষের এমন অনেক বেদনা-ক্ষোভ-আশা-আকাঙ্ক্ষা,চাওয়া-পাওয়া আছে যা বলা যেতে পারে সর্বজনীন। কৃষিভিত্তিক সমাজের মন একরকমের আবার পশুপালক সমাজের মন অন্যধরনের। কিন্তু সেখানেও কিছু কিছু মানসিকতার মিল থাকবেই! বিশেষ কালের চিত্র ধরা না পড়লেও সর্বজনীন ও সর্বকালিক এক সামাজিক মনের হদিস পাওয়া যাবেই। লোককথাগুলি পড়লেই মনে পড়বে,—গল্পগুলি শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথা, রূঢ় বাস্তবতার কথা লুকনো রয়েছে। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, ব্যর্থ প্রেম, সামাজিক অবিচার, উৎপীড়ন, জীবন-যুদ্ধের জ্বালা, ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, মহান আত্মত্যাগ, পবিত্র মাতৃত্ব ও প্রেম—চিরকালীন মানুষের মধ্যে যার সন্ধান মিলবে তারই কথা লুকনো আছে এইসব লোককথায়। জীবনের এইসব কথা হয়তো রয়ে গিয়েছে রূপকের আড়ালে। সামাজিক অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করলে আমরা লোকসমাজের মন ও মননকে অনুধাবন করতে পারব। একথা তো মানতেই হবে, হাজারো বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই সামাজিক মানুষ এবং একই উত্তরাধিকার সকলের।

লোককথার মধ্যে লোকসমাজ নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার অভিব্যক্তির রূপটি আন্তর্জাতিক। কথকতার ভঙ্গি, রূপ ও বিষয়বস্তু একই ধরনের।১ মানুষের আন্তর্জাতিকতাবোধ বলতে যা বোঝায় তার অনন্য নিদর্শন এই লোককথা। মহাসমুদ্রে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, গভীর বনভূমির দুর্ভেদ্য অঞ্চল, সুউচ্চ বরফঢাকা পার্বত্য উপত্যকা, বৃক্ষহীন মরুভূমির নির্জন এলাকা, বনে ঢাকা পাহাড়ী গুহা,—যেখানেই মানুষ রয়েছেন, সমস্ত বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একই ধরনের মন ও প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের সৃষ্ট মৌখিক লোককথার মধ্যে। এ এক বিস্ময়কর মানবিক সেতু।

আফ্রিকার আদিবাসী লোককথা

ইঁদুর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সর্দারের শক্ত বাড়ির অনাচে-কানাচে থেকে গরিব মানুষের রান্নাঘর, সব জায়গায় ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়।——ইঁদুর গল্পের সন্তান বুনল। এই গল্পগুলোই হল ইঁদুরের ছেলেমেয়ে। (এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য।) ইঁদুরের মতো ছোট্ট নগণ্য চঞ্চল একটি প্রাণীকে আফ্রিকার আদিবাসী মানুষ পশুকথার নায়ক করে তুললেন। এই

মানসিকতার মধ্যেই আফ্রিকার লোককথার প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে।২ পশুকে ঘিরে অগুণতি গল্পের জাল বুনেছেন এদেশের মানুষ। লোকপুরাণে দেবতাদের সম্পর্কেই গল্প বেশি থাকে, আফ্রিকার লোকপুরাণেও পশু-পাখির মেলা। অধিকাংশ দেবতাই পশুপাখি।

আফ্রিকার লোককথার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। লোককথার আন্তর্জাতিকতা সর্বজনস্বীকৃত। স্বাধীনভাবেই এগুলো গড়ে উঠেছে। কিন্তু আফ্রিকার লোককথা আক্ষরিক অর্থে মাইগ্রেটেড হয়েছে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিস্তৃত এলাকায়। উপনিবেশবাদীরা একসময় ক্রীতদাস আনতেন আফ্রিকা থেকে। তাদের উত্তরপুরুষেরা লোককথার অলিখিত মৌখিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। তাদের আদি বাসভূমির অন্য কোনো স্মৃতি আজ বেঁচে নেই, বেঁচে নেই তাদের মাতৃভাষা,—কিন্তু পুরুষ পরম্পরায় লোকসংগীত ও লোককথা আজও সজীব রয়েছে। এই অর্থে আফ্রিকার আদিবাসীদের লোককথা যেভাবে বিশ্ব-পরিক্রমা করেছে তার আর কোনো নজির নেই। অন্য অনেক দেশের লোককথা অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে নানাস্থানে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু লোকসমাজ সেগুলো কোনোভাবেই গ্রহণ করেন নি, সাক্ষর হয়েও নয়। আসলে সেগুলো পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ঐতিহ্যের গভীরে সেগুলো প্রবেশাধিকার পায় নি। এই ক্ষেত্রে আফ্রিকা সত্যিই বিশ্বজয় করেছে।

আফ্রিকার লোককথার সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে ভারত ছাড়া আর কোনো এলাকাই তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আফ্রিকায় যে হাজার হাজার আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছেন, তাদের একটি গোষ্ঠীরও সমস্ত লোককথা আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। ১৮৩৮ সালে এম. এ. ক্লিপ্‌ল্ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় হাজার আফ্রিকার লোককথার একটি পঞ্জি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশাল লোককথা ভাণ্ডারের কতটুকুই বা সেদিন অনূদিত হয়েছিল? বি. স্ট্রাক্ ১৯২৫ সালে বার্লিনে আফ্রিকার লোককথা বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুমান করেছিলেন, আড়াই লক্ষ লোককথা আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণ এই সংখ্যাকে বহুগুণ বাড়াবার সপক্ষে। কেননা, এখনও পর্যন্ত বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর তেমন কোনো লোককথার সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি।

আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘ লোককথা প্রায় অনুপস্থিত। এই গ্রন্থের 'যাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে'র মতো রূপকথা প্রায় বিরল। এল.

ফ্রোবেনিয়াস ও ডি. সি. ফক্স ১৯৩৭ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'আফ্রিকান জেনেসিস' গ্রন্থে কয়েকটি দীর্ঘ লোককথা প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদগণ মনে করেন, লোককথার আদি রূপ খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে কথকের চিন্তা মিশে সেগুলি দীর্ঘ হয়েছে। কেননা, আদিম মানুষ বিস্তৃত চিন্তাকে সূত্রবদ্ধ করতে অপারগ ছিলেন। তাই, দুটো গল্প যদি একই বিষয় ও নায়ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তবে সংক্ষিপ্ত গল্পটিকে পুরনো ঐতিহ্য-অনুসারী বলে এরা মত দিয়েছেন। এই হিসেবে আফ্রিকার অধিকাংশ লোককথা পুরনো কালের মৌখিক ঐতিহ্যকে বহন করে বয়ে এসেছে। অবশ্য, অনেক সময় একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্পের চক্র গড়ে উঠেছে। একটি সূত্রে যুক্ত করে গল্প থেকে অন্য অন্য গল্প গাঁথা হয়েছে। এগুলো অধিকাংশই প্রবঞ্চক ধূর্ত ট্যাটনের (ট্রিক্স্টার) গল্প।

আফ্রিকার আদিবাসী লোকপুরাণ ও কিংবদন্তির মধ্যে আদিবাসী ইতিহাসের সন্ধান করছেন অনেকেই। কেননা, অলিখিত মৌখিক উপাদান ছাড়া অন্য পথ অবশিষ্ট নেই। হয়তো একদিন যা ছিল সামাজিক ইতিহাস, পরে তাই হয়ে উঠেছে লোককথার প্রাণবস্তু। কিছু কিছু সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এখনও অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয়নি। এই শ্রমসাধ্য পদ্ধতি সকল জাতির ইতিহাস-অনুসন্ধানে একদিন পরম সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

আফ্রিকার আদিবাসী কথকেরা যখন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে লোককথা বলতে শুরু করেন, তখন তাকে মনে হবে তিনি শুধুই গল্প-বলিয়ে নন, তিনি অভিনেতা, তিনি নাট্যকার। বিভিন্ন চরিত্রে বিচিত্র সংলাপে তিনি একাই অভিনয় করে চলেছেন, নাটকীয় জাল বিস্তার করে চলেছেন।

অন্যান্য সকল দেশের আদিবাসীদের মতো আফ্রিকার আদিবাসীদের কাছে এসব লোককথার কাহিনী অবাস্তব নয়, জীবনের মতোই সত্য। এগুলো অবশ্যই ঘটেছে,—তারা সামান্য অবিশ্বাসও প্রকাশ করবেন না। মানুষের নানাবিধ দুষ্কর্মের জন্য আজ আর এসব ঘটে না। কিন্তু যা তারা গল্পে শুনছে তা সর্বাংশে সত্য বলে মানছেন। এখানে লোককথা ও আদিবাসী জীবনের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ব্যবধান নেই। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মে লোককথাগুলোর সামাজিক মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে।৩ এখনও আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবনাচরণকে এইসব

লোককথা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। আফ্রিকার আমাজুলু আদিবাসী গোষ্ঠীর একটি গল্পে রয়েছে, এই দুনিয়ায় কত কিছুই ঘটে, আমরা জানি না, জানে ঐ নুয়ে-পড়া বুড়োবুড়িরা। আমরা জানি না, কিন্তু ওদের কথাও অবিশ্বাস করি না। অবিশ্বাস করতে নেই।

ভারতের আদিবাসী লোককথা

ভারতের বিশাল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ উপনিবেশবাদীদের বহুকাল থেকে আকৃষ্ট করে এসেছে। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন আগেই উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিদেশিরা আমাদের দেশের আদিবাসীদের মধ্যে তাদের শাসনের জাল তেমনভাবে বিস্তার করেননি, যেমন করেছিলেন আফ্রিকায়। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী বিদেশিদের সংস্রবে এসেছিলেন, খনি ও চা বাগিচায় শ্রমিক হয়েছেন, স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা রুখতে বিদ্রোহ করেছেন, খ্রীস্টিয় মিশনারীদের দ্বারা প্রলুব্ধ ও ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ গোষ্ঠীই এই ছোঁয়াচ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। আর 'ভদ্রলোক হিন্দু জনগোষ্ঠী'র মানুষেরা আদিবাসীদের সঙ্গে কোনোকালে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন নি। স্বাধীনতার পরে রাস্তাঘাট, খনি এলাকার সম্প্রসারণ, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রভৃতির ফলে যোগাযোগ সহজ হয়ে আসছে। এইসব কারণে আমাদের দেশের আদিবাসী সংস্কৃতি অনেকাংশে অপরিচিতই থেকে গিয়েছিল। তাদের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাই কিছু উদারহৃদয় বিদেশিদের মাধ্যমে। তাদের অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে অসংখ্য লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু যা সংগৃহীত হয়েছে তার হাজার গুণ বেশি লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যেই রয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় আদিবাসী লোককথা যে কত সমৃদ্ধ তার পরিচয় এই স্বল্পসংখ্যক প্রকাশিত গল্পগুলো থেকেই অনুধাবন করা যাবে।

ভারততত্ত্ববিদ কিছু পণ্ডিত মনে করতেন, ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, পিলুপের গল্পসংগ্রহ থেকে অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বিষয়টি উলটো দিক থেকে বিচার করার সময় এসেছে। এবং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোক-সংস্কৃতিবিদ্‌রা সেইভাবেই চিন্তা করে চলেছেন। রামকথা গ্রথিত করবার জন্য কবি বাল্মীকি নাকি তার শিষ্যদের দূর-দূরান্তে পাঠিয়েছিলেন। রামের কাহিনী

তারা সংগ্রহ করে আনবেন। একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। লোকসমাজের মধ্যে ঐতিহ্যবাহিত হয়ে যেসব কাহিনী আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, শিষ্যদের মাধ্যমে সেসব কাহিনী শুনেই কবি বাল্মীকি সেগুলিকে লিখিত আকার দিয়েছিলেন। অবশ্য মহাকবির মনের মাধুরী যুক্ত হয়েই সেগুলো গ্রথিত হয়েছিল। বাইরে থেকে আরোপিত কোনো লোককথা লোকসমাজ বেশিদিন মনে রাখেন না। আপন সমাজের নিজস্ব সৃষ্টিই তাদের ঐতিহ্যে বহমান থাকে। তাই বেদ থেকে পিল্‌পের সংগ্রহ পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই যেসব লোককথা রয়েছে তার অধিকাংশই এসেছে লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। আর এই লোকসমাজের এক বিরাট অংশই হলেন ভারতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠি। যা সত্য তা কারও ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। লোকসমাজ থেকে লোককথা উন্নত লিখিত সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই সত্য নিয়ে আজ আর কোনো তর্ক চলে না।

দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে 'সন্ধি-বিগ্রহের সময়—মার্জার মুষিক বৃত্তান্ত' শুনিয়েছেন।৪ এই পশুকথাটি আজ থেকে সত্তর বছর আগে বস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যে বৃদ্ধার কাছে সংগ্রাহক গল্পটি শোনেন, তিনি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না, রামায়ণ-মহাভারতের নাম শোনেন নি। তাকে পাঁচবার বিভিন্ন দিনে গল্পটি বলতে বলা হলে একইভাবে গল্পটি তিনি শোনান। তাঁর রক্তে-চিন্তায় মিশে ছিল এই মৌখিক ঐতিহ্য। লোকসমাজের লোককথাই লিখিত উন্নত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের 'অকৃতজ্ঞের অধোগতি—কুক্কুর-শরভ বৃত্তান্ত' গল্পটি৪ সংগৃহীত হয়েছে মধ্যভারতের গোন্দ আদিবাসী এক বৃদ্ধের কাছ থেকে। এই বৃদ্ধের সামাজিক অবস্থান একই রকমের। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্পের উৎসস্থান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য।

যে কয়েক হাজার আদিবাসী লোককথা সংগৃহীত হয়েছে তার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য আমাদের বিস্মিত করে। এদের লোককথার প্রতিটি বিভাগই সমানভাবে উন্নত। আমাদের দেশের সকল আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত দরিদ্র, অধিকাংশই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর কিংবা ভাগচাষী, সবচেয়ে অমুর্বর জমিতে চাষ করেন, অরণ্যের সম্পদ থেকে বঞ্চিত, পুরনো অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন, আলোকিত জনসমাজের সঙ্গে নিবিড় একতা অনুভব করেন না,—এসবই সত্যি। কিন্তু

তাদের অনন্য মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত লোককথার পরিচয় পেলে মনে হবে, সে সংস্কৃতি তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতির চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। তাদের সংস্কৃতি বৃহৎ ভারতীয় বটবৃক্ষের সবুজ সতেজ পত্রগুচ্ছ, যেমন অন্য সংস্কৃতির পত্রগুচ্ছও একই গাছে পাশাপাশি মিলেমিশে রয়েছে।

আমার কথাটি .....

এক সময় পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ববিদ নৃতাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতজন মনে করতেন, পৃথিবীর যাবতীয় লোককথার উৎসস্থান ভারতবর্ষ। এই মূল ভূখণ্ড থেকেই অন্য প্রান্তে লোককথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তারা বলেছিলেন, সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির বিশাল গল্পভাণ্ডার দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বহুকাল ধরে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল।

এর কিছু পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের পাশে আফ্রিকার নামও যুক্ত হল। অর্থাৎ, তারা বললেন, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা থেকে লোককথা অন্যত্র ছড়িয়েছে। অবশ্য আজকের দিনে মাইগ্রেশনের এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে, এই দুই ভূখণ্ডের গল্প-সম্ভারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য একদিন তাদের এভাবে ভাবাতে বাধ্য করেছিল।

ব্যাপক মাইগ্রেশনের এই তত্ত্ব বর্তমানে কোনোভাবেই বিশ্বাস করার উপায় নেই। তবু আফ্রিকা ও ভারতের আদিবাসীদের লোককথায় সামাজিক মনের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই দুই ভূখণ্ডের আদিবাসীগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি গল্প বলেছেন পশুকে ঘিরে। খরার ফলে জীবনে দুঃসহ কষ্ট, অনুর্বর জমিতে চাষের দুর্বিষহ যন্ত্রণা, সামাজিক অবিচার,—বারবার গল্পে চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূল পরিবেশ অসংখ্য গল্পের প্রাণ। [পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য]। আর ট্যাটনের লোককথার বৈচিত্র্য তো অনন্য।

আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে আমরা যেন গর্ববোধ করতে পারি। কেননা, এই মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা সকলেই।

গল্প এল কোথা থেকে

ইঁদুর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সর্দারের শক্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে থেকে গরিব মানুষের রান্নাঘর, সব জায়গায় ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়। রাতের অন্ধকার, চারিদিক নিঝুম, শুধু দূরে শেয়ালের ডাক আর বাতাসের শনশন আওয়াজ। কেউ জেগে নেই। শুধু গোলগোল জলজ্বলে চোখ নিয়ে ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়। এমন কোনো গোপন জায়গা নেই যেখানে ইঁদুর যায় না, এমন কোনো দুর্গম দুর্ভেদ্য জায়গা নেই যেখানে ইঁদুর তার নরম ছোট্ট শরীর নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে না। সব গোপন খবর সে শোনে, অনেক লুকনো জিনিস সে দেখে।

এ তো সেই অনেক অনেক কাল আগের কথা। সেই পুরনো কালে ইঁদুর একটা গল্পের সম্ভার তৈরি করল। বরং বলা ভালো, গল্পের সম্ভার বুনল, যেমন করে তাঁতে পরনের কাপড় বোনা হয়। সে তো অনেক কিছু দেখেছে, তাই গল্পের সম্ভার বুনে তুলতে তার বেশি কষ্ট হল না। এইসব দেখা-শোনা-জানা গল্পকে সে এক এক রকম পোশাক পরিয়ে দিল। তাদের পোশাকের বিচিত্র সব রঙ। কোনোটার লাল, কোনোটার নীল, আবার কোনোটার বা কালো। এই গল্পগুলোই হল ইঁদুরের ছেলেমেয়ে। সবসময় তারা অন্ধকার ঘরেই থাকত, ইঁদুরের সব কাজকর্ম করত। ইঁদুরের নিজের তো কোনো ছেলেপেলে ছিল না, তাই এই গল্প ছেলেমেয়েরাই তার নিজের হয়ে উঠল।

সেই পুরনো কালে দূরের এক গাঁয়ে থাকত এক ভেড়া আর এক চিতা। অনেক দিন পরে ভেড়ার হল একটা মেয়ে আর চিতার হল একটা ছেলে।

এমন সময় সেই এলাকায় দেখা দিল প্রচণ্ড খরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, জমিজিরেত পুড়ে খাক হয়ে গেল। দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কোথাও খাবার মতো কিছুই নেই।

একদিন চিতা ভেড়ার কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, আর তো পারা যায় না! এসো, আমাদের ছেলেমেয়ে দুটোকে মেরে ফেলি, আমাদের খিদে মেটাই।'

ভেড়া মনে মনে ভাবল, 'এখন যদি চিতার কথায় সায় না দি, তাহলে হয়তো জোর করেই সে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে। আমিও কি বাদ যাব?'

একটু ভেবে ভেড়া বলল, 'বেশ তাই হবে।'

চিতা চলে যেতেই ভেড়া তাড়াতাড়ি তার বাড়িতে ঢুকল। খুব নির্জন গোপন জায়গায় তার মেয়েকে লুকিয়ে রাখল। তারপরে, তার ঘরে যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, সব কিছু নিয়ে এক প্রতিবেশীর কাছে বিক্রি করে দিল। এসবের বিনিময়ে প্রতিবেশী তাকে কিছুটা শুকনো মাংস দিল। সেই শুকনো মাংস খুব ভালোভাবে রান্না করল। শেষকালে গেল চিতার গুহায়। দুজনে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। এধারে চিতা তো তার ছেলেকে মেরে তার মাংস রান্না করেই রেখেছিল। সব তারা খেল।

এক বছর পরে আবার ভেড়া আর চিতার একটা করে বাচ্চা হল। এবারেও তেমনি খরা, তেমনি দুর্ভিক্ষ। সবাই খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। কোনো পথ নেই বাঁচবার।

একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। বলল, 'বন্ধু, আর তো পারি না। এবারেও ছেলেগুলোকে মেরে খিদে মেটাই।' ভেড়া ভয়ে রাজি হল।

কিন্তু এবারও সে আগের বারের মতো পরের বাচ্চাটাকেও নির্জন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল। দুই বাচ্চা একসঙ্গে রইল। বাচ্চাকে তো বাঁচাল, কিন্তু এখন করে কি? ঘরে যে বিক্রি করার মতো আর কিছুই বাকি নেই! ভেড়া ভিক্ষে করতে বেরুল। ঘুরছে ঘুরছে,—কিন্তু কে দেবে ভিক্ষে। মাথার ওপরে প্রখর তাপ, মাটি আগুন ছড়াচ্ছে, কাছে দূরে রোদ্দুর জ্বলছে। তবু ভেড়া বিশ্রাম নিচ্ছে না। শেষকালে একজন তাকে কিছু শুকনো মাংস ভিক্ষে দিল। দৌড়ে এসে রান্না করল সেই মাংস। আগের বারের মতো চলল চিতার গুহায়। দেহ আর চলে না, তবু যেতেই হবে।

এমনি করে সুখে-দুঃখে কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। তাকে দেখেই ভেড়ার মুখ শুকিয়ে গেল, পা-চারটে কাঁপতে লাগল। চিতা হাসিমুখে বলল, 'বন্ধু, আমার গুহায় আজ তোমার নেমন্তন্ন। সাঁঝের বেলায় আসবে কিন্তু।'

ভেড়া গুহায় গেল। দেখল, কাঠের টেবিলের ওপরে বিরাট শুকনো লাউয়ের এক পাত্র। ঢাকনা খুলতেই চোখে পড়ল, পাত্র-ভরা সুগন্ধি খাবার। আর পাশে রয়েছে তিনটে চামচ্।

ধারাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে চিতা ভেতরের কপাট খুলে ফেলল। ডাকল, 'ছোট্ট মেয়ে আমার, বেরিয়ে এসো। এসো, একসঙ্গে খাই।'

চিতার মেয়ে বেরিয়ে এল। সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। খেতে খেতে

মা চিতা বলল, 'সেবার তো ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খিদের জ্বালায় আমার প্রথম বাচ্চাটাকে মেরে ফেললাম। কতই না কষ্ট! কিন্তু একদিন জানতে পারলাম, তুমি তোমার মেয়েকে মেরে ফেলনি, বাঁচিয়ে রেখেছ, লুকিয়ে রেখেছ। আমিও ভাবলাম, পরের বারে আমিও চালাকি করব। তাই, আমার এই মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম। আর ভুল করি নি।' চিতা হাসতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। সুখেই কাটে দিন। ভেড়ার মেয়েদুটো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বেশ মোটাসোটা তারা।

একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। চিতা বলল, 'আমার মেয়ে বড় একা একা থাকে। তোমার একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দাও আমার গুহায়। দুজনে মিলেমিশে আমোদে থাকবে।'

ভেড়া রাজি হল। রাজি না হয়ে উপায় কি? চিতা যে সাংঘাতিক হিংস্র!

এখন হয়েছে কি, ভেড়ার দুটো মেয়েই ছিল মিশমিশে কালো, মায়ের মতোই তাদের গায়ের রঙ। ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ভেড়ার কয়েকটা ছাগল ছিল, তারা ছিল ভেড়ার ক্রীতদাস। এই ছাগলগুলো ছিল ভেড়ার অনুগত। এই ছাগলগুলো ছিল একেবারে ধবধবে সাদা। মেয়েকে চিতার গুহায় পাঠাবার আগে ভেড়া নিজের মেয়ের সারা গায়ে ভালো করে সাদা রঙ করে দিল। দেহের কোথাও এতটুকু কালো আর রইল না। আর ক্রীতদাস এক ছাগলকে কালো রঙে রঙ করে দিল। তার দেহে আর কোথাও সাদা রঙ রইল না। তারপরে তাদের দুজনকে একসঙ্গে চিতার গুহায় পাঠিয়ে দিল।

চিতার গুহায় পৌছবার পরে চিতা ভাবল, কালো মেয়েটাই নিশ্চয়ই ভেড়ার মেয়ে। তিনজনে খেলাধুলো করতে লাগল। রাত হল। অন্ধকারে চুপিচুপি এল চিতা। থাবার এক আঘাতেই হত্যা করল ছাগলকে। সেই মাংস রান্না করে নিজের মেয়েকে খেতে দিল। চিতা ভাবল,—'খুব হয়েছে, ভেড়ার মেয়েকে কেমন মেরে ফেললাম। আমার সঙ্গে চালাকি!'

পরের দিন চিতা আবার গেল ভেড়ার বাড়ি। হাসি হাসি মুখে বলল, 'তোমার অন্য মেয়েটাকেও আমার সঙ্গে যেতে দাও। তাহলে আমাদের তিন মেয়েই বেশ আনন্দে থাকবে, খেলাধুলো করবে।'

ভেড়া রাজি হল। কিন্তু যাবার আগে সে মেয়েকে শিখিয়ে দিল গুহায় গিয়ে তাকে কি কি করতে হবে। খুব সাবধানে সব বলল।

ভেড়ার সেই মেয়ে চিতার গুহায় পৌছল। তিনজনকে একসঙ্গে দেখে চিতা বাইরে কোথায় চলে গেল। চিতা চলে যাওয়ার পরে ভেড়ার দ্বিতীয়

মেয়ে চিতার মেয়েকে সরবতের মতো মিষ্টি খেতে পানীয় খেতে দিল। বলল, 'আমার মা তোমাকে এই উপহার পাঠিয়েছে।' সরবত ছিল খুব মিষ্টি, খেতে অপূর্ব। ঢক্‌ঢক্ করে চিতার মেয়ে তা খেয়ে নিল। আসলে সেটা ছিল গাছের রস থেকে তৈরি একরকমের মিষ্টি পানীয়। এটা খেলে ভীষণ ঘুম পায়, চোখ ভারী হয়ে বন্ধ হয়ে আসে। কথা বলতে বলতেই চিতার মেয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল। ভেড়ার মেয়েদুটো জেগে রইল।

তারপরে, যখন চিতার মেয়ে ঘুমে একেবারে বিভোর তখন দুজনে তাকে ধরে তাদের জন্য তৈরি বিছানায় শুইয়ে দিল। আর চিতার মেয়ের জন্য যে বিছানা তাতে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইল।

রাতের অন্ধকার। গুহার ভেতর আরও অন্ধকার। চোখে কিছুই ঠাহর করা যায় না। চিতা চুপিসারে গুহায় ঢুকল। ভুল করে সে তার মেয়েকে এক আঘাতে মেরে ফেলল। সে তো আর জানে না, ভেড়ার মেয়ের বিছানায় শুয়ে রয়েছে তারই মেয়ে। মনে মনে ভাবল, 'ভেড়া চালাকি করে তার মেয়ে দুটোকে বাঁচিয়েছিল, এবার দুটোকেই শেষ করতে পারলাম। আঃ, কি আনন্দ।'

পরের দিন কাকভোরে চিতা বনে গেল। কাঠকুটো নিয়ে আসতে। ভেড়ার মেয়ের মাংস বেশ জুত্ করে রান্না করতে হবে। যেই না চিতা বনের পথে এগিয়ে গেল, অমনি ভেড়ার দুই মেয়ে দৌড় দিল বনের অন্য পথে। একজন চলে গেল তার মায়ের বাড়ি, আর আরেকজন একটু ঘুরপথে চিতার পেছন পেছন গেল। চিতা তখন কাঠকুটো কুড়োচ্ছে, দূর থেকে চিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভেড়ার মেয়ে চিৎকার করে বলল, 'কেমন চিতা, বেশ হয়েছে। কাল রাতে তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে। তার বদলে মেরেছ নিজের মেয়েকে। তারও আগে মারতে চেয়েছিলে আমার বোনকে, মেরেছ আমাদের ছাগলকে। কেমন মজা!'

যেই না এ কথা শোনা, চিতা লাফ মেরে ভেড়ার মেয়ের পিছু ধাওয়া করল। ভেড়ার মেয়েও তৈরি ছিল, সেও দিল দৌড়। বনের এক জায়গায় এসে ভেড়ার মেয়ে দেখল অনেকগুলো সরু মেঠো পথ এদিক ওদিক চলে গিয়েছে। কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে একটা পথ বেয়ে ভেড়ার মেয়ে তিরিং বিরিং করে লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে চলে গেল। সেখানে এসে চিতা ভাবল, কোনদিকে যাব। তারপরে ভুল পথে উল্টো দিকে দৌড় দিল চিতা। ভাবল, ঠিক পথেই চলেছি।

অনেক দূর গিয়ে বনের পথে ভেড়ার মেয়ের সঙ্গে দেখা হল এক বুড়ির। বুড়ির কোমরে ঝুলছে জুজু দেবতার মূর্তি। বুড়ি খুব ক্লান্ত, বহু দূর থেকে সে হেঁটে হেঁটে আসছে। দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুড়ি হাঁটছে।

ভেড়ার মেয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'বুড়ি মা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। দাও, জুজুকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

বুড়ি তক্ষুণি রাজি। শেষকালে তারা বুড়ির বাড়ি এল। বুড়ি এসেই উঠোনে বসে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছে।

ভেড়ার মেয়ে বলল, 'বুড়ি মা, তুমি বরং জিরিয়ে নাও, ততক্ষণে আমি ডোবা থেকে জল আর বাগান থেকে আগুন ধরাবার কাঠকুটো নিয়ে আসি।'

বুড়ি তো খুব খুশি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বুড়ি ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল বুড়ির। সারা গায়ে তখন তার ব্যথা। ভেড়ার মেয়েকে বলল, 'বাছা, থানের ওপরে যে গাছ-গাছড়ার ওষুধ আছে, আমাকে একটু এনে দেবে?'

ভেড়ার মেয়ে বলল, 'হায় কপাল, তুমি কি ভুলেই গেলে? ঐ ওষুধ থেকেই তো কাল রাতে আমার জন্ম হল। আর ওষুধ থাকবে কি করে?'

বুড়ি গেল বেজায় রেগে। মুখ ঝামটা দিয়ে সে লাফিয়ে উঠল। তাড়া করল ভেড়ার মেয়েকে। বেগতিক দেখে ভেড়ার মেয়েও দৌড় দিল। এলো-মেলো ছুটে চলেছে ভেড়ার মেয়ে। তার ওপরে সে পথ চেনে না। ছুটতে ছুটতে একটা গাছের গুঁড়িতে এসে সে ধাক্কা খেল। ধাক্কা লেগে গাছের বাকল খসে গেল। আসলে সেটা ছিল সেই ইঁদুরের বাড়ি। বাকলটা ছিল দরজার মত আঁটা। অনেক পুরনো হয়েছে দরজা। ভেড়ার মেয়ের ধাক্কা সে সহ্য করবে কেমন করে? আলো এসে ঢুকল সেই গাছের ফোকরে। গল্পের ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল। ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

বাইরে সূর্যের অপরূপ আলো, বনভূমির সবুজ বিস্তার, মাঠের সবুজ ঘাস, গাছের পাতার শনশন্। গল্পের ছেলেমেয়ে আলোয় এল, তারা আর কখনও ইঁদুরের গাছের ফোকরে ফিরে গেল না।

সেদিন থেকে সব গল্প, সব ইতিহাস দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। যা ছিল ইঁদুরের একান্ত, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে গেল। সেইসব গল্প আর ইতিহাস সেদিন থেকে দুনিয়ার এক দিক থেকে অন্যদিকে মুখে মুখে সবার জানা হয়ে গেল।

কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন

মিষ্টি জলের এক মস্ত বিলে থাকত এক কচ্ছপ আর তার বৌ। তাদের এক বন্ধু ছিল। সে শকুন। সময় পেলেই শকুন সেই বিলের ধারে উড়ে আসত দূর পাহাড় থেকে। শুকনো চবায় তিন বন্ধু মিলেজুলে খোশমেজাজে গল্পগুজব করত। কচ্ছপের তো ডানা নেই, সে উড়তে পারে না। তার ভারি দুঃখ সে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারে না। এই এক দুঃখে কচ্ছপ সবসময় মনমরা হয়ে থাকে।

একদিন মনে মনে কচ্ছপ এক ফন্দি আঁটল। বেশ খুশি খুশি মনে বৌকে ডাকল। বৌ গলা বাড়িয়ে টুক্‌টুক্ করে তার কাছে এল।

কচ্ছপ বলল, "আচ্ছা বৌ, শকুনের কাছে আমরা কেমন দিনদিন হেয় হয়ে যাচ্ছি, এটা তুমি বুঝতে পারছ?"

বৌ গোলগোল চোখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, হেয় হতে যাব কেন? শকুন তো আমাদের বন্ধু।"

কচ্ছপ নরম গলায় উত্তর দিল, "হেয় হওয়ার কারণ আছে। দেখ, বারবার শকুন আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তো একবারও তার ওখানে যেতে পারিনি! সে আমার বন্ধু! তার বাড়িতে না গেলে কি সম্মান থাকে বল? সে-ই শুধু আসবে, আর আমি যেতে পারব না?"

বৌ আরও অবাক হল, "সে আবার কি কথা। আমি তো মোটেই বুঝতে পারছি না এতে শকুনের কাছে আমরা হেয় হতে যাব কেন। আমাদের তো ডানা নেই, উড়তে পারি না। শকুন তাই ওসব ভাববে কেন। হ্যাঁ, আমাদের যদি ডানা থাকত আর তখন যদি আমরা বন্ধুর বাড়িতে না যেতাম, তাহলে কথা উঠতে পারে বটে। কিন্তু এখন তো সে কথা ওঠে না। কি যে সব মাথামুণ্ডু চিন্তা কর!"

"বৌ, তুমি যা-ই বল না কেন, বড্ড হেয় হয়ে পড়ছি। একটু ভেবে দেখ।"

"এতই যদি ভাবনা হয় তাহলে দুটো ডানা গজিয়ে নাও। আর উড়ে উড়ে বন্ধুর বাড়ি চলে যাও।"

"বৌ, তা কেমন করে হবে? আমি ডানা পাব কেমন করে? সে-ভাবে তো আমার জন্ম হয়নি!"

"বেশ, তাহলে কি করতে চাও?"

কচ্ছপ মাথা তুলিয়ে বলল, "একটা বুদ্ধি বের করেছি। অনেক ভেবে এক সুন্দর কায়দা মাথায় এসেছে।"

বৌ বলল, "তাহলে বলেই ফেল। শুনি তোমার বুদ্ধিটা কি!"

একটু ভেবে নিল কচ্ছপ। এধার ওধার চোখ ঘুরিয়ে সে বলল, "বৌ, তুমি এক কাজ কর। প্রথমে তুমি আমাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তারপরে ঝুড়ির মুখ তামাক পাতা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দাও। তারপরে সবটা ঘাসের দড়ি দিয়ে খুব ভালো করে বেঁধে দাও। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, কেমন?"

বৌ বলল, "তারপর?"

কচ্ছপ গলাটা আরও লম্বা করে বলল, "শকুন তো বেড়াতে আসবেই। শকুন এলে বোঁচকাটা তাকে দেবে। বলবে, 'বন্ধু, এর মধ্যে অনেক তামাক পাতা আছে, এগুলো বিক্রি করে আমাদের জন্য কিছু শস্যের দানা আনতে হবে।' ব্যাস, তাহলেই হবে।"

বৌ তখন পাশের বনে গেল। বেশ কিছু শুকনো তালপাতা কুড়িয়ে আনল। ধীরে ধীরে শক্ত মজবুত এক ঝুড়ি তৈরি করল। তার মধ্যে কচ্ছপকে ঢুকিয়ে, তামাক পাতায় চাপা দিয়ে ভালো করে বেঁধেছেঁদে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

শকুন যেমন আসে তেমনি এল। বিরাট ডানা মেলে মাটিতে পা ফেলে এধার ওধার কাত্ হয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়াল শকুন। ঠোঁটে দু-একবার পালক পরিষ্কার করে হাসিমুখে বলল, "কি ব্যাপার? বন্ধুকে দেখছি না যে, কোথায় গেল?"

বৌ বলল, "আর বল কেন বন্ধু, তোমার বন্ধুর যে কি কাণ্ড! সেই সাত-সকালে অনেক দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করা নাকি খুব জরুরি। আর এধারে দেখ, বাড়িতে একরতি দানা নেই। খিদেতে মরে গেলাম। তোমার বন্ধুর কথা আর বলে কাজ নেই।"

শকুন বলল, "হায় কপাল! খাবার কিছু নেই। ইস্! তুমি তো খিদেয় বড় কষ্ট পাচ্ছ!"

বৌ বলল, "এমন বিপদে কেউ পড়ে না বন্ধু! কেউ ভাবতেই পারবে না, কি ভীষণ কষ্ট চলছে। আচ্ছা বন্ধু, তোমাদের এলাকায় কিছু শস্যদানা কিনতে পাওয়া যায় না?"

"কেন পাওয়া যাবে না! প্রচুর আছে। কিনতে চাইলেই কেনা যাবে। কেন বলত ?"

বৌ বোঁচকাটা নিয়ে এল। উঃ, বড্ড ভারি। বলল, "তোমার বন্ধু এই বোঁচকাটা রেখে গিয়েছে। এর মধ্যে অনেক তামাক পাতা আছে। বলে গিয়েছে, বন্ধু শকুন এলে এটা দিতে। সে এর বদলে খাবার-দাবার কিনে আনবে। দেখ, কি করতে পার। আর যে পারি না।"

শকুন তো বড় দয়ালু। সে তক্ষুণি রাজি। সময় নষ্ট না করে, কথা না বাড়িয়ে সে শক্ত ঠোঁটের ফাঁকে বোঁচকা ঢুকিয়ে নিয়ে দুবার ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে গেল। চলল তার বাড়ির পথে, পাহাড়ী এলাকার পথে।

শকুন উড়ছে, উডছে। বোঁচকাটা বড ভারি, তার ডানা দুটো কাঁপছে, ডানা ঝাপটাতে কষ্ট হচ্ছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পডছে, বুক ফুলে ফুলে উঠছে। তবু শকুনকে যে যেতেই হবে! এ যে বন্ধুর জন্য কষ্ট। এ-তো কষ্টই নয়। আহা, বন্ধুর বৌ খিদের জ্বালায় কতই না কষ্ট পাচ্ছে! উডে চলেছে শকুন।

পাহাড় এসে পড়েছে। উঁচু পাহাডে শকুনের বাড়ি। সে আরও উপরে উঠছে। এই তো এসে গেল তার বাড়ি।

ডানার কাজ শেষ হয়েছে। ডানা শান্ত করে নেমে চলেছে শকুন। হঠাৎ শকুন হাওয়ায় শুনতে পেল কে যেন বলছে, "শকুন, বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু কচ্ছপ। শুনতে পাচ্ছো? আমার বাঁধন খুলে দাও। বলেছিলাম না, তোমার বাড়ি বেড়াতে আসব! কেমন!"

হাওয়ার শন্‌শন্ শব্দের মধ্যে কথা শুনে শকুন কেমন যেন হয়ে গেল। সে ভয় পেল, বিস্মিত হল। অবাক বিস্ময়ে আপনা থেকেই ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। তার দেহ যেন কেমন করে উঠল। ঠোঁট ফাঁক হতেই বোঁচকা আলগা হয়ে নিচে পড়তে লাগল।

শকুন নিচু হয়ে দেখতে লাগল, বোঁচকা গাছের ডালের মতো আছড়ে পড়ল পাহাড়ের শক্ত পাথুরে ঢালুতে। পিড়িড়ি-পিড়িড়ি। চৌচির হয়ে গেল, কচ্ছপের শক্ত খোলা, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এধারে ওধারে। আর কচ্ছপ মারা গেল।

সেদিন থেকে কচ্ছপ আর শকুনের বন্ধুত্ব চিরকালের জন্য ছুটে গেল। সে বন্ধুত্বে আর জোড়া লাগেনি। শুধু কি তাই? সেদিন থেকে কচ্ছপের পিঠের খোলে অমন কাটাকাটা দাগ হয়ে গেল। আজও সে দাগ মিলিয়ে যায় নি। তাকালেই দেখতে পাবে।

মাকড়সা সব ধার শোধ করল

এক যে ছিল গভীর বন। আর সেই বনে বাস করত এক মাকড়সা। ঘন-পাতার এক বিরাট গাছের নিচে ছিল তার কুঁড়ে। মাকড়সা ছিল ভীষণ দুষ্টু আর তেমনি আল্‌সে। কোনো কাজ সে করত না, বসে বসে খেতেই তার ভালো লাগে। কুঁড়েমি যার স্বভাব, তার কি আর খাটতে ইচ্ছে হয়। আর কুঁড়ে হলেই যত বদ বুদ্ধি মাথাতেই হবে। কেননা, কাজ না করলে খাবার আসবে কোথা থেকে? কিন্তু খিদে তো পাবেই! খেতেও হবে। আর খাবার যোগাড় করতে ফন্দি আঁটতেই হবে। তাই মাকড়সা সবার কাছে ধার চাইত। বনের এমন কোনো পশুপাখি ছিল না যারা তাকে ধার দেয়নি। আহা বেচারা মাকড়সা, নাহয় ধার নিলই,—বলেছে তো শোধ দিয়ে দেবে।

বনের সব পশুপাখিই মাকড়সাকে ধার দিয়েছিল। কিন্তু ধার শোধের নামগন্ধও নেই। এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল।

এখন হয়েছে কি, একদিন মাকড়সা মিঠে রোদে ফুরফুরে হাওয়ায় ঘাসে ঘাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একসঙ্গে অনেক পশুপাখির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, মাকড়সা সবার কাছে ধার নিয়েছে, কিন্তু ধার শোধ করছে না। সবাই ঘিরে ধরল তাকে। সবাই একসঙ্গে তাদের পাওনা চাইল। এবারে মাকড়সা ধার শোধ করবে কেমন করে? তার যে কিছুই নেই। খুব ফাঁপরে পড়ল সে। আর বুঝল, আজ আর বাঁচার পথ নেই। কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি মাকড়সার মাথায় এক ফন্দি এল।

সে ঠ্যাঙাগুলো নেড়েনেড়ে বলল, "হায় কপাল, আমি ধার শোধ করে দেব বলেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি কি তেমন লোক যে ধার নিয়ে শোধ দেব না? শুনুন, আপনারা সবাই শুক্রবারে আমার বাড়িতে যাবেন, আমি সবার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেব। হাঁ, এই সামনের শুক্রবারে। ভুলবেন না কিন্তু!"

সবাই রাজি হল। মনে মনে লজ্জাও পেল। ছিঃ ছিঃ, মাকড়সা আমাদের ধার শোধ করবার জন্য এত কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর আমরা কিনা ভুল বুঝলাম। মানুষকে এত ছোট কখনও ভাবতে হয়! লজ্জা, লজ্জা! শেষকালে শুক্রবার এল। মাকড়সাও তৈরি হয়ে রইল।

সাত সকালে মাকড়সা বাড়ির পাশে এক গাছতলায় বসে রয়েছে। সূর্য সবে উঠেছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে। এমন

সময়ে মুরগী এল। মাথা নামিয়ে তাকে অভিবাদন করে মাকড়সা বলল, "এসো বন্ধু, এসো, এসো। তোমার জন্যই বসে আছি, তা, তুমি ঘরের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমার জন্য একটু খাবার বানিয়ে আনি। হাজার হলেও তুমি তো আমার অতিথি। যাও, ঘরে বিশ্রাম কর।"

মুরগী খুশিমনে ঘরে ঢুকল। মাকড়সার বুক ধুক্‌পুক করতে লাগল। এমন সময় জ্বল্‌জ্বল্‌ চোখে বনবেড়াল এল। তাকে দেখেই মাকড়সার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসিমুখে বলল, "বন্ধু বনবেড়াল, তোমার দেনা শোধের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমায় তোমরা যাই বল না কেন, কাউকে আমি ফাঁকি দেব না। যাও, ঘরে যাও। তোমার পাওনা রেখে দিয়েছি।"

"আরে, ওসব কথা কেন।"—বলতে বলতে বনবেড়াল ঘরে ঢুকল। মুরগী কিছু বুঝবার আগেই বনবেড়াল তার ঘাড় মট্‌কে দিল। তারপরে একটু ঝট্‌পট্‌ করেই মুরগী মরে গেল। বনবেড়াল তাকে দাঁতে চেপে চলে যাবে ভাবছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় কুকুর এল। তাকে দেখেই মাকড়সা বলে উঠল, "বাঃ বন্ধু, ঠিক সময়েই এসেছ। তোমার পাওনা ঘরেই রেখে দিয়েছি। আমার কি কখনও কথার খেলাপ হয়? যাও, ঘরে যাও।"

ঘরে ঢুকল কুকুর। বনবেড়াল মুরগীকে দাঁতে চেপে দোর দিয়ে বেরুতে যাবে, সামনে পড়ল কুকুর। এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনবেড়ালের ওপর। পালাবার পথ খোঁজার আগেই বনবেড়াল মারা পড়ল। মুরগীটা দূরে ছিটকে পড়েছে। কুকুর ভাবল, কাল রাতে তো কিছু জোটেনি। এখন মুরগীটাকে খাই, বনবেড়ালকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেলে-বৌ সবাই মিলে খাওয়া যাবে। কুকুর দাঁত বসাল মুরগীর নরম দেহে।

মাকড়সা বেশ ফুর্তিতেই রয়েছে। এমন সময় হায়না এল। মাটি শুঁকতে শুঁকতে ধারাল দাঁত বের করে সে মাকড়সার সামনে দাঁড়াল।

মাকড়সা বলল, "আঃ আপনার কি সময়জ্ঞান! সব ঠিকঠাক আছে, পাওনা তৈরি। সোজা ঘরে চলে যান।"

হায়না ঘরে ঢুকল। পেছন ফিরে কুকুর মাংস চিবোচ্ছে। হঠাৎ হায়নার গায়ের গন্ধে কুকুর লাফিয়ে উঠল। লেজ গুটিয়ে পালাবার আগেই হায়না লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। একটু ধস্তাধস্তির পরেই কুকুরের দেহ নিথর হয়ে গেল।

হায়না ক্যাক্‌ক্যাক্‌ করে হাসতে লাগল। গোটা কুকুর, আস্ত বনবেড়াল, অর্ধেকটা মুরগী। না, মাকড়সাটা লোক ভালো, কথা রেখেছে। হায়না

আধখানা মুরগী চিবোতে বসল। সকালবেলা খিদেটা ভালোই পেয়েছে। এখনি কিছুটা না খেলেই নয়।

মাকড়সা চোখ পিটপিট করছে আর এধার ওধার চাইছে। এমন সময় চিতা এল ডুলকি চালে। বিরাট দেহ এলিয়ে দিয়ে সে মাকড়সার সামনে বসল।

মাকড়সা খুব বিনয় করে বলল, "আমি আপনার জন্যই বসে রয়েছি। বনের সবাইকে তো আর আপনার মতো ভক্তি করা যায় না! আপনি হলেন বনের প্রভু। তা, আপনারা যে যাই বলুন, আমি কিন্তু লোক খারাপ নই। কাউকে আমি ফাঁকি দেব না। আপনার পাওনাও ঘরে তৈরি রেখেছি। যান, ঘরে যান।"

জিব্ দিয়ে কয়েকবার গোঁফ চেটে, দুবার হাই তুলে দেহ তুলল চিতা। লেজ নেড়ে সে ঘরে ঢুকছে।

গন্ধ পেয়েই হায়না লাফিয়ে উঠেছে। টেনে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময় মুখের ওপরে পড়ল এক প্রচণ্ড থাবা। উলটে পড়ল হায়না। আবার উঠতে যাবে, আর এক থাবায় তার কোমর গেল ভেঙে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করছে। গলার কাছে চেপে বসল ধারাল দুটো দাঁত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। হায়নার দেহ কাঁপতে কাঁপতে পাথর হয়ে গেল, চারটে পা ছড়িয়ে পড়ল কাঠির মতো।

চিতাবাঘ ভাবল, নাঃ, মাকড়সা তো মন্দ লোক নয়, বেশ ভালো। বিবেচনা আছে। গোটা তরতাজা হায়না, আস্ত কুকুর, বেশ বড়গোছের একটা বনবেড়াল। আর সবই টাটকা। মাকড়সা খুব ভালো। তারিয়ে তারিয়ে শিকারের খাদ্য দেখছে চিতা। কিভাবে তিনটেকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে তাই ভাবছে।

এমন সময় কেশর ফুলিয়ে সিংহ এল গাছের নিচে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মাকড়সা। দাঁড়া উঠিয়ে মাথা নিচু করে মাকড়সা বলল, "প্রভু, আপনি বনের রাজা। সেই সাতসকাল থেকে আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি আপনি আসেন, এই বুঝি আসেন। যাক সব তৈরি। আপনার পাওনা আপনি বুঝে নিন। আপনি আমাদের প্রভু, দোষত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। যান প্রভু, ঘরে যান।"

সিংহ ঘরের দিকে পা বাড়াল। আর মাকড়সা তরতর করে গাছের উঁচু মগডালে চেপে বসল।

সিংহ ঘরে ঢুকেই দেখে চিতা তিন শিকারকে একজায়গায় করছে। এতবড় স্পর্ধা! গর্‌গর্‌ শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। কেশরগুলো ফুলেফুলে উঠল। পেছন দিকে টান্‌টান্‌ হয়ে মস্ত লাফ দিল চিতার ঘাড়ে। চিতাও তৈরি। সেও লাফিয়ে পড়ল।

তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল সিংহ আর চিতায়। মাকড়সার বাড়ি কাঁপছে, এই বুঝি ভেঙে পড়ে। দুজনেই হুংকার ছাড়ছে। আছাড়ি-পিছাড়ি লড়াই চলছে। দুজনের দেহেই অসীম শক্তি, দুজনের দাঁতই ধারাল তীরের মতো, দুজনের থাবাতেই ক্ষুরধার নখ। একজন আর একজনকে হারিয়ে দেবে, অত সহজ নয়। লড়াইয়ে বাড়ি কাঁপছে, বন কাঁপছে,। মাকড়সাও কাঁপছে, ধরা পড়ে যাবে না তো?

লড়াই এখন তুঙ্গে। মাকড়সা তৈরিই ছিল। আস্তে আস্তে গাছের মগডাল থেকে নেমে এল। পাতায় মোড়া জিনিসটি লুকনো গর্ত থেকে বের করে তার বাড়ির কাছে গেল। তারা দুজনেই তখন এমন লড়াই করছে যে, মাকড়সাকে দেখতেই পেল না। দেয়াল বেয়ে সামান্য ওপরে উঠে মাকড়সা অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে পাতার মোড়ক খুলল। তার ভেতরে ছিল শুকনো লংকার গুঁড়ো। যেই সিংহ-চিতা লড়াই করতে করতে মাকড়সার কাছে এসেছে, অমনি সবটুকু গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল তাদের চোখে-মুখে। ছিটিয়েই নেমে এল দেয়াল থেকে। লংকার ঝালে তাদের চোখ কট্‌কট্‌ করে উঠল, তারা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে লড়াই করে চলেছে।

মাকড়সা বাইরে থেকে মস্ত বড় একটা মোটাসোটা গাছের ডাল নিয়ে এল। আর তাই দিয়ে পেটাতে লাগল দুজনকে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এমনিতেই তারা ক্ষতবিক্ষত, তার ওপরে চোখে জ্বালা, চারদিক অন্ধকার। এমন সময় শুরু হল ডালের আঘাত। মাকড়সা মারছে তো মারছেই, তারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এরা না মরলে তাকে যে মরতে হবে। মারের পর মার, আঘাতের পর আঘাত। শেষকালে সিংহ ও চিতা দুজনেই কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সব মাংস জড়ো করে মাকড়সা ঘরের এককোণে রেখে দিল। অনেক অনেক দিন চলবে।

সমস্ত ধার শোধ করে দিল মাকড়সা। আর কারও কাছে সে ঋণী রইল না।

কেমন করে পৃথিবীর মানুষ আগুন পেল

মোটু মস্ত এক বাগান তৈরি করল। সেই বাগানে নানা জাতের কলাগাছ আবাদ করল। এমনিতেই বাগানের মাটি খুব ভালো। তার ওপরে মোটু মাটিকে খুব আলগা করে তুলল বারবার চাষ করে। প্রচুর আলো সেই বাগানে। দেখতে দেখতে কলাগাছ বেড়ে উঠল, তাতে মোটা মোটা কলা হল। একদিন সে কলা পেকেও গেল।

মোটু খুশি। আজকের রাত পোহালেই সে সব কলার কাঁদি কেটে নামাবে। কত কলাই না হবে!

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোটু কাস্তে নিয়ে বাগানে ঢুকল। কিন্তু একি? বাগানের অনেক কলাগাছ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গোড়া থেকে গাছ কাটা। আর সেসব গাছে কলা নেই। সব খোয়া গিয়েছে। হায়! হায়!

কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না! চোরকে ধরতেই হবে। চুরি যাওয়ার পরদিন থেকে মোটু আর বাগানে ঢুকল না। এমন ভাব করে থাকল যেন তার বাগানে কোনো কিছুই ঘটে নি। এমনি করে দিন যায়।

বাগানের বেড়ার পাশেই ছিল এক ঘন ঝোপ। রোজ রাতে মোটু সেই ঝোপে লুকিয়ে থাকে। চোরকে সে ধরবেই।

মোটুকে বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে হল না। একদিন রাতে সে দেখল, আকাশ থেকে মেঘের দলবল নিচে নামছে। সোজা নেমে এল তার বাগানে। তারা বাগানে নেমেই কয়েকটা কলাগাছ কেটে ফেলল। গোরু আর কুমিরের মত গাব্‌গাব্‌ করে অনেক কলা খেল। যেগুলো খেতে পারল না, সেগুলো একসঙ্গে বেঁধে আবার আকাশ-পানে রওনা দিল। মোটু ঝোপ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, তাড়া করল তাদের। তারাও মেঘের গতিতে উড়ে চলল। পেছনে ছিল একজন মেয়ে মেঘ। সে পালাতে পারল না। ধরা পড়ল মোটুর হাতে। একটু নড়াচড়া করল, কিন্তু মোটুর হাত সে ছাড়াতে পারল না।

মোটু তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। কয়েকদিন পরে মোটু মেঘ মেয়েকে বিয়ে করল। মেঘকন্যার নাম রাখল আদরিণী।

আদরিণী মেঘ রাজ্যের মেয়ে, আকাশে সে জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে আকাশে। তবু কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতী। সংসারের সব কাজ একা হাতে করে, আবাদে সাহায্য করে মোটুকে, পশুদেরও দেখাশোনা করে যত্নে। ঠিক পৃথিবীর মানুষের বৌ যেমনটি করে। সত্যি, আদরিণী খুব ভালো।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু মোটু আর তার গাঁয়ের কোন মানুষ আগুন দেখেনি। আগুন যে কি তাও তারা জানে না। তারা সবকিছু কাঁচা খায়। আর কন্‌কনে শীতের রাতে, ঝড়ো হাওয়ার দিনে কিংবা ঝম্‌ঝম্ বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। আগুন জ্বালিয়ে ঘর আর দেহ গরম করার কোনোকিছুই তারা জানে না। জানে শুধু কষ্ট পেতে।

ঝগড়া মিটে গিয়েছে। মেঘের দলবল পৃথিবীতে নামে, তাদের দেশের মেয়ের সঙ্গে গল্পগুজব করে। আদরিণীকে তারা সবাই বড় ভালোবাসে।

আদরিণী বড় ভালো বৌ। এ গাঁয়ের কষ্ট দেখে সেও কাঁদে। একদিন মেঘের দলবলকে বলল, "এবার আসার সময় কিছু আগুন আনিস্ তো ভাই। এদের বড় কষ্ট।"

পরের বার দেখা করতে এসে তারা আগুন বয়ে আনল। আগুন পেয়ে আদরিণী সবাইকে শিখিয়ে দিল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়, কেমন করে আগুন জিইয়ে রাখতে হয়, কেমন করে রান্না করতে হয়, শীতের রাতে বর্ষার সময় ঝড়ো হাওয়ার দিনে কেমন করে আগুনের চারপাশে বসে আগুন পোয়াতে হয়, দেহ গরম করতে হয়।

বৌ-এর ওপর বেজায় খুশি মোটু। গাঁয়ের সবাই ভালোবাসে আদরিণীকে। এমনিতেই সে খুব ভালো বৌ, তার ওপরে এমন উপকার করেছে গাঁয়ের। সবার প্রিয় আদরিণী।

বরের দেশের মানুষকে খুব ভালোবাসে আদরিণী। কিন্তু নিজের দেশের মানুষকেও সে সব সময় কাছে পেতে চায়। একদিন আদরিণী গল্প করছে মেঘের দলের সঙ্গে। হঠাৎ সে বলল, "তোরা কেউ কেউ এখানে ঘর বাঁধবি ? আমার খুব ভালো লাগবে।" তারাও ভালোবাসে তাকে। কয়েকজন রাজি হয়ে গেল। পাকাপাকি ঘর বাঁধল মোটুর গাঁয়ে। তাদের দেশের মেয়ের বরের গাঁয়ে তারাও বাসিন্দা হয়ে রইল।

সুখে দিন কাটে। একদিন আদরিণী ঢাক্‌না-দেওয়া একটা ঝুড়ি পেল। ঘরে নিয়ে এসে কাঠের তাকে সেটা তুলে রাখল। রেখে দিয়ে মোটুকে বলল, "দেখ, আমরা দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসি। গাঁয়ের লোকের সঙ্গেও

খুব মিতাল হয়েছে। তুমি তো আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাস। কিন্তু আজ থেকে তোমাকে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমার এই কথাটা তুমি কখনও ভুলে যেও না, এ কথাটা রেখো। আমি যখন বাগানে আবাদ করতে যাব কিংবা পশুদের দেখাশোনা করতে যাব তখন কিন্তু তুমি ঝুড়িটা খুলে দেখো না। কক্ষনো খুলবে না। যদি তা কর তবে আমি আর আমার দেশের মানুষজন তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। ঐ দূর আকাশে মিলিয়ে যাব।”

মোটু সায় দিয়ে বলল, “বাঃ! তা আমি কেন খুলতে যাব? তুমি যখন মানা করলে তখন আমি কক্ষনোই ওটা খুলে দেখব না।”

মোটুতো এখন মনে মনে দারুণ খুশি। কত লোকজন তার চারপাশে, গাঁয়ের লোক তার কথা শোনে, তার রয়েছে বুদ্ধিমতী বৌ। বৌ-এর জন্যই গাঁয়ের লোক তাকে সর্দারের মত মান্য করে। তার আর কি-ই বা চাই।

কিন্তু আজ থেকে এক নতুন আপদ এসে জুটল। বেশ ছিল সে। বৌ কেন বলল, তুমি ঝুড়িটা খুলো না। তাকে কেন নিষেধ করল।

খটকা নিয়েও দিন কেটে যায়। প্রতিদিন সকালে বৌ তাকে ঐ কথা মনে করিয়ে দেয়। একদিনও ভোলে না।

কি আছে ঝুড়ির মধ্যে? কি লুকিয়ে রেখেছে তার বৌ? তাকে কেন জানতে দিতে চায় না? আদরিণী তো তারই আদরের বৌ। তবে? কেন তাকে সকাল হলেই নিষেধের কথা মনে করিয়ে দেয়?

মন তার বাগ মানে না। চনমনিয়ে ওঠে। দেখিই না কি আছে ঝুড়ির মধ্যে! আর তো কৌতূহল চেপে রাখা যায় না। মোটু মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আজ ঠিক দেখব।

তকেতকে থাকল, বৌ-এর বাইরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল। বৌ তাকে নিষেধ করে বাগানে আবাদের কাজে চলে গেল।

এই তো সুযোগ! বুক ওঠাপড়া করছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। কাঠের তাক থেকে ঝুড়িটা নামাল, পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল,— শেষকালে খুলে ফেলল ঝুড়ির ঢাকনা। কিন্তু একি? ঝুড়িতো খালি। কিছুই নেই তার মধ্যে। মুচকি হেসে ঢাকনা বন্ধ করে আবার তুলে রাখল তাকের ওপরে। যেমন ভাবে ছিল ঠিক তেমন করে রেখে দিল।

আবাদের কাজ শেষ করে আদরিণী ফিরে এল ঘরে। বড় ক্লান্ত সে। স্বামীর মুখের [illegible] সে চমকে উঠল [illegible] চোখে বলল,

"তোমাকে বলেছিলাম, তবু তুমি কেন ঝুড়ির ঢাকনা খুলেছিলে? কেন তুমি খুলতে গেলে?"

বৌ-এর কথা শুনে মোটু অবাক হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কোনো কথা বেরুল না। শুকনো গাছের মত, পাহাড়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এমনি করে দিন যায়। একদিন মোটু শিকার করতে গেল। তীর-ধনুক-বর্শা নিয়ে পিঠে লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে সে গভীর বনের পথে হাঁটা দিল।

বাড়িতে আদরিণী একা। তার দেশের লোকজনকে সে ডেকে আনল তার ঘরে। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর সবাই মিলে মেঘের রাজ্যে ভেসে চলল। পথে ভেসে যেতে যেতে আদরিণী কয়েকবার নিচে পৃথিবীর দিকে তাকাল। শেষকালে পৌঁছে গেল আকাশে, নিজের দেশ মেঘের রাজ্যে। এখান থেকেই একদিন সে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে আবার ফিরল।

আদরিণী আর কোনোদিন পৃথিবীর বুকে নামেনি।

এমনি করেই পৃথিবীর মানুষ প্রথম তাদের আগুন পেয়েছিল। এমনি করেই শিখেছিল কেমন করে রান্না করতে হয়। আর এমনি করেই বড় বেশি কৌতূহলী হয়ে নিষেধ না মেনে মোটু তার আদরের বৌকে হারাল। আদরিণী চলে গেল, গাঁয়ের লোক বড় ব্যথা পেল। তারা জানল, মোটুর জন্যই আদরিণী মেঘকন্যা হয়ে মিশে গিয়েছে দূর আকাশে। তারা তাই মোটুকে আর সর্দারের মত মান্য করত না। সব হারাল মোটু। আদরিণী চলে গেল, আগুন রইল মানুষের মাঝে।

পোষা পশুপাখির বিশ্বাসঘাতকতা

সেকালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো কালে সব পশুপাখি মিলেমিশে আকাশে বাস করত। তাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল, কেউ কাউকে হিংসে করত না। মনের সুখে তাদের দিন কাটত। বিপদে-আপদে সবাই সবাইকে দেখাশোনা করত।

এমনি করে দিন কাটে, রাত কাটে। একদিন শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামে না, অঝোরে জল পড়েই চলেছে। এমন বৃষ্টি তারা দেখেনি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া আর হাওয়ার দাপটে তারা শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এমন কাঁপুনি যে মনে হল তারা বুঝি মরেই যাবে। আর কতক্ষণ সহ্য করা যায় এমন শীত!

কাঁপতে কাঁপতে পাখিরা বলল, "ভাই কুকুর! তুমি তো খুব জোরে ছুটতে পার, তোমার তো শীতও কম লাগে, তুমি নিচে পৃথিবীতে দৌড়ে যাও। কিছুটা আগুন নিয়ে এস। আগুনে আমরা শরীর গরম করি, নইলে যে সবাই মারা পড়ি।"

কুকুর সব শুনল। বন্ধুদের জন্য আগুন আনতে সে দৌড় দিল। প্রচণ্ড তার গতি, দুর্বার তার বেগ। কিছুক্ষণ পরেই সে পৃথিবীতে পৌঁছে গেল। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে! আগুনের খোঁজ করতেই কুকুরের চোখে পড়ল,—মাঠের মধ্যে মাংসের কয়েকটা হাড় আর কতকগুলো মাছ পড়ে রয়েছে। লোভে তার জিব বেরিয়ে এল। জিব থেকে জল গড়াতে লাগল। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে কুকুর হাড় আর মাছ চিবোতে লাগল। খাওয়ার আনন্দে আধবোজা চোখে সে শুধু হাড়ই চিবোতে লাগল।

আকাশে পশুপাখিরা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে আছে কুকুরের ফেরার আশায়। এই বুঝি কুকুর আসে, মুখে তার জলন্ত আগুন। আহ্! সেই আগুনে গরম হবে শরীর, শীত পালাবে দূরে। তাকিয়েই থাকে তারা, বন্ধু কুকুর কিন্তু আসে না। অনেক সময় কেটে যায়, তবু কুকুর ফেরে না।

কি আর করে! উপায় না দেখে পশুপাখি সবাই মিলে মোরগকে বলল, "ভাই মোরগ! কুকুর তো এল না, এদিকে আমরা যে শীতে মরি। তুমি তো ধনুকের তীরের মত নিচে নেমে যেতে পার। তুমিই পৃথিবীতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু আগুন নিয়ে এস। তুমি গেলেই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে।"

মোরগ সব বুঝল। কুকুরের ব্যবহারে মোরগ বেশ রেগে গেছে। রাগের চোটে লাল-ঝুঁটি নেড়ে মোরগ ধনুকের তীরের মত ছুটল পৃথিবীর পথে। পশু-পাখি ওপর থেকে দেখল, পা দুটো সোজা রেখে ঝুঁটি লম্বা করে উঁচিয়ে মোরগ নেমে চলেছে, নেমেই চলেছে। পৃথিবীর পথে আরও এগিয়ে চলল মোরগ, ওপর থেকে মেঘের ধোঁয়ায় আর তাকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই মোরগ পৌঁছে গেল পৃথিবীতে। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে!

আগুনের খোঁজ করতেই মোরগ দেখল এক গাছের তলায় অনেক শস্যদানা, অনেক গম আর ছোট ছোট ফল ছড়িয়ে রয়েছে। লোভে মোরগের গলা থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। লম্বা লম্বা পায়ে ঝুঁটি নামিয়ে এগিয়ে গেল খাবারের দিকে। শক্ত ঠোঁটে ঠুকে ঠুকে মুখে পুরতে লাগল সেইসব শস্যদানা। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে মোরগ খাওয়ার আনন্দে গাছের তলা চষে ফেলতে লাগল। মোরগ কুকুরের কোনো খোঁজ নিল না, নিজেও আগুন বয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গেল।

তুমি যদি সন্ধ্যার সময় কান পেতে শোনো, তবে শুনতে পাবে গাছের ডালে ডালে পাখিরা গান গাইছে, কিচির-মিচির করছে! এ কিন্তু পাখিদের গান নয়, এ পাখিদের কিচির-মিচির নয়। তারা ঐ শব্দের মধ্যে বলে চলেছে—"কুকুর লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল, মোরগ লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল। হায়! হায়!"

তাই তোমরা দেখতে পাবে, সব পাখি কুকুর আর মোরগদের দেখলেই তাদের ভাষায় গালাগাল দেয়, তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। পাখিরা গালাগাল দেয়, বিদ্রূপ করে,—কেননা তারা আজও ভুলতে পারেনি সেই কথা। কুকুর আর মোরগ বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়ে, তাদের আকাশে ছেড়ে এসে নিজেদের দেহ গরম করেছে, নিজেরা পেটপুরে খেয়েছে,—তখন তাদেরই বন্ধু সমস্ত পশুপাখি শীতে কেঁপেছে, হাওয়ার দাপটে মরে যেতে বসেছে, আগুনের অভাবে তাকিয়ে থেকেছে পৃথিবীর পথে,—যে পথে তাদের বন্ধু দুজন গিয়েছে কিন্তু আর কখনও ফেরেনি!

কুকুর ও মোরগ সেইদিন থেকে ঘরের পোষা পশু ও পাখি হয়ে গেল তারা হল গৃহপালিত।

আজও শুয়োর মাটি খোঁড়ে

সে অনেককাল আগের কথা। এক বনে দুই বন্ধু ছিল। তাদের একজন শুয়োর আর অন্যজন ছিল কচ্ছপ। দুজনের খুব মনের মিল। কেউ কারও কাছে কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। সব কথাই দুজনে দুজনের কাছে মন খুলে বলত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন কচ্ছপ মন ভারি করে শুয়োরের কাছে গেল। তার মুখখানা শুকনো দেখে শুয়োর কেমন মুষড়ে গেল। আমতা আমতা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ভাই কচ্ছপ? তোমার শরীর-মন ভালো নেই বুঝি?'

কচ্ছপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আধবোজা চোখে বলল, 'আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি ভাই। ছেলে-বৌকে খাওয়ানোর মত সামান্য পয়সাও আজ আমার হাতে নেই। কি যে করি?'

'এই ব্যাপার?' বলেই শুয়োর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে নিয়ে আবার বলল, 'কিছু ভেবো না। কয়েকদিন আগে আমি কিছু টাকা পেয়েছি। এখন খরচ করার মতো কিছু নেই। তাই তুমি সেটা নিয়ে নাও ভাই, তোমার উপকার হবে।'

কচ্ছপ কিন্তু আরও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তোমার হয়ত ঐ টাকাটার দরকার নেই এখন। কিন্তু কালই তো দরকার হতে পারে।'

'কি যে তুমি বল ভাই! বিপদের সময় বন্ধুকে যদি সাহায্য করতে না পারলাম, তবে আর বন্ধুত্ব কিসের? তুমি আমার বিপদেও তো এইভাবেই সাহায্য করবে। কি, করবে না?' শুয়োর বলল।

'এ অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু।' কচ্ছপ মাথা ঝাঁকাল!

'আমি আর তোমায় দেরি করে দেব না,' বলেই শুয়োর তার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরের কোণায় এক গোপন গর্ত থেকে সে কিছু টাকা বের করে গুণল। অর্ধেকটা নিয়ে বাকি অর্ধেকটা গর্তে রেখে গর্তের মুখ বন্ধ করে ফিরে এল কচ্ছপের কাছে।

'এই নাও ভাই কচ্ছপ।' টাকাগুলো সে তুলে দিল কচ্ছপের হাতে।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে কচ্ছপ বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ! তুমি যে আমার কি উপকার করলে।'

'ভুলে যাও ওসব কথা। আমি তোমায় সাহায্য করতে পেরেই আনন্দিত !'

'এ টাকা আমি তোমায় পনের দিনের মধ্যেই ফেরৎ দেব। আর যদি খুব দেরি হয় তবে একুশ দিন। তুমি কিন্তু কিছু মনে কোর না ভাই।"

'তাড়াতাড়ি কেনো দরকার নেই। যখন তোমার সুবিধে হবে তখন দিও। তোমায় আমি বিশ্বাস করি, তুমি যে আমার বন্ধু।'

'শুয়োরভাই, তোমার নজর খুব উঁচু। তুমি বড়ই দয়ালু। তোমার মতন এত ভালো মন আমি আর কোথাও দেখিনি।' ধরা গলায় একথা বলে কচ্ছপ বিদায় নিল।

এদিকে টাকা নিয়ে যাওয়ার পর কচ্ছপের আর দেখা নেই। সে এ পথে আর হাঁটেই না। একমাস যায়, দু'মাস যায়। কিন্তু কচ্ছপের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সে এখন শুয়োরকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চায়।

একদিন একটা কাজে শুয়োর গিয়েছে দূরে। ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। ক্লান্ত পায়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকছে, তখন তার বৌ তাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেলল। তাকে দেখে শুয়োরের যেন কেমন মনে হল।

হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ?'

'ওগো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।' এবার সে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলল। কোন কথা না বলে শুয়োরের বৌ সোজা তাকে ঘরের কোণে সেই গর্তের কাছে নিয়ে গেল যেখানে শুয়োর টাকাগুলো রেখেছিল।

'আমাদের টাকাগুলো সব চুরি হয়ে গিয়েছে।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল।

'চুরি গেছে ?' অবাক হয়ে গেল শুয়োর। আর কোনো কথা বেরুল না তার মুখ থেকে। কেননা, সে ভেবেছিল সে ছাড়া আর কেউ ও গর্তের খবর জানে না।

'আমাদের সব টাকা চুরি হয়ে গেল।'

'আমাদের টাকা মানে ?'

'হ্যাঁ, গো, আমাদের দুজনের টাকা। আমি মাঝে মাঝেই এর মধ্যে সামান্য করে টাকা রাখতাম। তোমার আসার আগে আমি গুণতে গেলাম কেমন জমছে আমাদের টাকা। গিয়ে দেখি অর্ধেকটা চুরি হয়ে গিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই চোরকে ধরতে পারবে।'

'ও, অর্ধেকটা, তাই বল! আমার তো হয়ে এসেছিল তোমার কথা শুনে। ওটা চুরি হয়নি বৌ।' শুয়োর নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

'তাহলে, টাকাগুলো কি হল?' শুয়োরের বৌ চিৎকার করে উঠল।

রেগে গিয়ে শুয়োর বলল, 'শোন, টাকা আমার, আর তাই আমার যা ইচ্ছে তাই করব। তোমার নাক গলাতে হবে না।'

'আমার টাকার অংশও তুমি নিয়েছ। তাই আমার জানার অধিকার আছে। কাকে তুমি টাকা দিয়েছ?'

'আমি কাউকেই টাকা দিই নি। শুধু এক বন্ধুকে তার বিপদে সাহায্য করেছি। সে খুব সৎ লোক, শিগ্‌গিরই টাকা ফেরৎ দেবে।' শুয়োর বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'তুমি ও টাকা আর ফেরৎ পাবে না।' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বৌ।

'আমি টাকা ফেরৎ পাবই। বন্ধু কচ্ছপ কখনও আমাকে ফাঁকি দেবে না।'

'হুঁঃ, তোমার হাতে যখন ফেরৎ-দেওয়া টাকা আমি দেখব, তখনই শুধু বিশ্বাস করব। তার আগে নয়।'

'বেশ, শিগ্‌গিরই তুমি তা দেখতে পাবে।'

'সেই শিগ্‌গির-টা তোমার কবে হবে শুনি?' শুয়েরের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বৌ জিজ্ঞেস করল।

'এরই মধ্যে একদিন।'

'ও একটা কথা।' হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এইভাবে শুয়োরের বৌ বলল, 'আচ্ছা, তুমি কতদিন আগে তোমার বন্ধুকে টাকা ধার দিয়েছ বলতো?'

'মানে, এই—এই তো কয়েকদিন আগে।' শুয়োর সত্যিকথাটা ভয়ে বলতে পারল না।

কিন্তু অত সহজে ভুলবার পাত্রী শুয়োরের বৌ নয়। সে বলে বসল, 'তোমার বন্ধু কচ্ছপকে তো আমি দুমাস আগে একবার এধারে দেখেছিলাম। তারপরে আর তো সে এমুখো হয়নি।'

'বাইরে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার এখন সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না। নইলে,—'থেমে গেল শুয়োর তার বৌয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'তাই বুঝি?' বৌ চোখ ঘুরিয়ে বলল।

শুয়োর গেল ক্ষেপে, 'আচ্ছা মুশকিল, ব্যাপারখানা কি বলতো?'

'আমি কালকে বাজারে গিয়ে কচ্ছপের বৌকে দেখতে পেয়েছি। সে জলের মত টাকা খরচ করছে। এটা কিনছে, ওটা কিনছে, সেটা কিনছে।'

এবার সত্যি সত্যি শুয়োরের অবাক হওয়ার পালা।

'তাই বুঝি ? কচ্ছপ তাহলে টাকা পেয়েছে ! সে যদি টাকা পেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আমাকে টাকা দিয়ে যাবে। তার কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই ঠিকসময়ে আমার কাছে আসবে টাকা ফেরৎ দিতে।'

কিন্তু অবাক হল শুয়োর। সেইদিন কিংবা তার পরের দিনও কচ্ছপ এল না। তৃতীয় দিনে শুয়োর বেশ ঘাবড়ে গেল। সে ঠিক করল আজই সে কচ্ছপের সঙ্গে দেখা করবে। এই ভেবে সে রওনা দিল কচ্ছপের বাড়িমুখো।

এদিকে দূর থেকেই গাছের ফাঁক দিয়ে কচ্ছপ দেখতে পেল, দ্রুতপায়ে শুয়োর আসছে তারই বাড়ির দিকে। সবই বুঝল সে। বৌকে ডেকে তাই বলল, 'শুয়োরবেটা এই ধারেই আসছে। আমি ওর সঙ্গে মোটেই দেখা করতে চাই না।'

'ওটা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। দেখ না, কি করি।' কচ্ছপের বৌ বলে উঠল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কচ্ছপের বৌ ফিরিয়ে দিল শুয়োরকে। শুয়োর বাড়ি ফিরে এসে তার বৌকে কোনো কথাই বলল না।

দুদিন পরে আবার এল শুয়োর। এবারও সে শুনল কচ্ছপ বাড়িতে নেই, বাইরে গিয়েছে জরুরী কাজে। তার কেমন সন্দেহ হল, কচ্ছপের বৌ বোধহয় সত্যি কথা বলছে না।

'আচ্ছা, কখন এলে কচ্ছপের দেখা মিলবে ?' মনের সন্দেহ চেপে রেখে শুয়োর জিজ্ঞেস করল।

'সেটা বলা খুবই মুশকিল। সে ইচ্ছেমত যাওয়া-আসা করে আজকাল।'

'আপনি কি তাকে বলেছিলেন যে, আমি সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম ?'

'হাঁ, তাকে আমি বলেছিলাম আপনার আসবার কথা। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে তিনি খুব দুঃখ করলেন। আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তবে তার দেখা পেতে পারেন। এরই মধ্যে তিনি এসে পড়বেন মনে হচ্ছে,' কচ্ছপের বৌ গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল যেন এখনি কচ্ছপ এসে পড়বে।

এটাও কিন্তু তার মিথ্যাকথা।

আশায় ভর করে শুয়োর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমি কখন তাকে পেতে পারি ?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না। তিনি আজকাল যখন-তখন আসেন আর বাইরে বেরিয়ে যান যে সঠিক করে কিছু বলা কঠিন।'

শুয়োর সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে এল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল, কচ্ছপ ঠিক যেন বন্ধুর মতো ব্যবহার করছে না। সে বাড়িতে গিয়ে এবার বৌকে বলল, 'দেখ,আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, আমার টাকাটা হয়তো আমি আর ফেরৎ পাব না।'

'কিন্তু ওটা যে আমাদের টাকা?' বৌ বলল।

'কচ্ছপের এই ব্যবহার আমি ভাবতেই পারিনি। সে আমার অত বন্ধু।'

'যে আদৌ বন্ধু নয়, তাকে যদি হারাতে চাও তাহলে সামান্য টাকা ধার দিলেই যথেষ্ট। সে আর তোমার ঘরমুখো হবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বৌ। তোমার কথাই ফলল। তুমি প্রথমেই আমাকে একথা বলেছিলে। আমি তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমি টাকা ফেরৎ আনবই, নইলে আমার নাম শুয়োর-ই না।'

'আমি তোমার কথা শুনে খুবই খুশি হলাম। তুমি যত তাড়াতাড়ি একাজ করবে, ততই মঙ্গল।' শুয়োরের বৌ ঘরের কাজে মন দিল।

সেদিন ভাগ্য ভাল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কচ্ছপের সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে প্রীতিসম্ভাষণ করল।

'তুমি কেমন আছ ভাই কচ্ছপ?' শুয়োর মনের রাগ চেপে রেখে বাইরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভালো ভাই, খুব ভালো। কিন্তু আজকাল বড্ড ব্যস্ত আমি। বাড়িতে একেবারে থাকতে পারি না ভাই। বৌ বলেছিল, তুমি কয়েকবার গিয়েছ আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কয়েকবার নয়, মাত্র দু'বার।' শুয়োর উত্তর দিল।

কচ্ছপ বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এত ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম যে আর যেতেই পারি নি। হ্যাঁ, একটা কথা। সেই সামান্য ব্যাপারটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

শুয়োর মাথা নাড়ল, হাসল, তারপর বলল, 'আমি বড় ঝামেলায় পড়েছি। আবার বৌও ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। আর তুমি তো জানই মেয়েরা কি ধরনের হয়।'

'যাকগে ঘাবড়িও না ভাই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, তুমি কাল সন্ধ্যের সময় আসতে পারবে? কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

'না না অসুবিধার কি আছে? আমি নিশ্চয়ই আসব।'

'খুব ভালো হল। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।' মিষ্টি সুরে কচ্ছপ বলে ওঠে।

শুয়োর আনন্দে অন্য সবকিছু ভুলে গেল। বাড়ি গিয়ে সে বৌকে সব জানাল।

'আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আরও আগে তার কাছে যেতাম টাকা আদায় করতে।' সমস্ত কিছু শুনে শুয়োরের বৌ উত্তর দিল।

যাই হোক, সন্ধ্যে লাগার আগেই শুয়োর বাড়ি থেকে রওনা দিল। তাকে আসতে দেখে কচ্ছপের বৌ দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে খবর দিল। অল্পক্ষণের জন্য কচ্ছপ কি যেন ভাবল, ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল, তারপর তাদের শোবার ঘরের মধ্যে যে ঝুড়িটা ছিল, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'আমি ওর মধ্যে লুকোচ্ছি।'

'কেন?'

'এখন খুলে বলার সময় নেই! শুধু সে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে থাকো। কিন্তু কখনও যেন সে বুঝতে না পারে, তুমি তাকে তাড়াতে চাইছ! মনে থাকবে তো?'

'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' খুব প্রসন্ন না হয়েই বৌ জবাব দিল।

'তোমাকে করতেই হবে।' এই আদেশ দিয়ে কচ্ছপ ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে বলল, 'আমাকে ঠিক করে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে দাও!'

কচ্ছপের বৌ তাকে এমনভাবে ঢেকে দিল যাতে সে নিঃশ্বাসটুকু শুধু নিতে পারে। একটু পরেই শুয়োরের দরজা নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সমাদরে কচ্ছপের বৌ তাকে ঘরে ডেকে আনল। 'আপনি ভালো আছেন তো?' সে শুয়োরকে জিজ্ঞেস করল।

'ভালোই। কচ্ছপ বাড়ি আছে তো?' শুয়োর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু আগেই চলে এসেছি।'

'আপনি কি কিছুক্ষণ বসবেন না?' খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল কচ্ছপের বৌ।

'হ্যাঁ, বসব।'

তারা দুজন এবার বসল। শুয়োর চেষ্টা করতে লাগল যাতে কচ্ছপের বৌ কথাবার্তা বলে, কিন্তু কচ্ছপের বৌ কোনো কথাই বলছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে শুয়োর অস্থির হয়ে পড়ল।

'কালকে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে আজ সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিল।'

'আমাকে সে এসব কোনো কথাই বলে নি।' পরিষ্কারভাবে রূঢ় গলায় কচ্ছপের বৌ একথা জানাল।

এই ধরনের উত্তর কিন্তু শুয়োরের মোটেই ভালো লাগল না।

'ওঃ!' শুয়োর বলে উঠল, 'কচ্ছপ কি এই গাঁয়ের বাইরে কোনো কাজে গিয়েছে?'

'তা আমি কি করে জানব?'

'শ্রীমতী কচ্ছপ আপনি ঠিক কথা বলছেন না। আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'আমি!' আঁৎকে উঠল কচ্ছপ-গৃহিণী।

'আপনার স্বামী কি ভেতরেই আছেন?' শুয়োরের জিজ্ঞাসায় কচ্ছপের বৌ মুখে কেমন শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'আপনি আমাকে কোনো কথা বলবেন না জানি, তাহলে, আমিই নিজে দেখি কোথায় কচ্ছপ।' রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল শুয়োর।

সে উঠে শোবার ঘরের দিকে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজার কাছে তার পথ আটকে দাঁড়াল শ্রীমতী কচ্ছপ।

'আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।'

'তাহলে বলুন, কোথায় আপনার স্বামী লুকিয়ে আছে?'

'সে কোথাও লুকিয়ে নেই। সে বাইরে গিয়েছে কাজে।'

'আপনি কি আমায় কচি ছেলে পেয়েছেন যে, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব? যদি আপনি সত্যিকথাই বলছেন তাহলে আমাকে ভেতরে যেতে দিতে আপনার এত আপত্তি কেন?'

'আমাকে না মেরে আপনিও ঘরে যেতে পারবেন না।' তীক্ষ্ণস্বরে কচ্ছপের বৌ জানাল।

শুয়োরের তখন ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, 'আমি এক-দুই-তিন গুণব, এর মধ্যে আপনি যদি পথ থেকে সরে না যান তবে যা ঘটবে তার জন্য আপনাকেই পস্তাতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন।' শান্তভাবে জবাব দিল কচ্ছপের বৌ।

'এক-দুই-তিন! আপনি আমার পথ ছাড়বেন?'

কচ্ছপের বৌ সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, শুয়োর ছুটে এসে মারল প্রচণ্ড

এক গুঁতো! কিন্তু ঠিক সময়ে হঠাৎ ফট্ করে সরে গেল কচ্ছপের বৌ আর সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল শুয়োর, হাওয়ার বেগে। ঢুকেই সে গুঁতো খেল সেই ঝুড়িটার সঙ্গে। রাগে সে ঝুড়িটাকে তুলে ঘরের বাইরে এনে টেনে ফেলে দিল দূরে। তারপর আবার ঢুকল শোবার ঘরে। সে পই পই করে সবদিক খুঁজল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

যখন সে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন যা-নয়-তাই বলে কচ্ছপের বৌ তাকে বকতে লাগল। সেও ক্ষেপে ছিল, গলা চড়িয়ে সেও দিল গালাগালি। দুজনের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল।

এদিকে দুইজনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড বচসা হচ্ছে, তখন কচ্ছপ ঝুড়ি থেকে গুটি গুটি বের হয়ে বাড়ির দিকে এল।

'এখানে সব হচ্ছেটা কি ?' গোলমালকে ছাড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল।

হঠাৎ তাদের ঝগড়া গেল থেমে। তারপর কচ্ছপের বৌ সব ঘটনা কচ্ছপকে খুলে বলল। আর সমস্ত দোষ চাপাল নিরীহ শুয়োরের ওপর।

'তোমার কিছু বলার আছে শুয়োর ?' কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল।

'আমি খুব দুঃখিত, আমি আমার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।' খুব বিনীতভাবে শুয়োর জানাল।

'আশ্চর্য! আমি ভাবতে পারিনি বন্ধু, তুমি এই ব্যবহার করবে। আমি ভাবতাম তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। ওঃ ভাই, আজকে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতটি পেলাম।' দুঃখের ভান করল কচ্ছপ।

'আমায় ভাই তুমি ক্ষমা কর!'

উপহাস করে রেগে কচ্ছপের বৌ বলল, 'জানেন, আপনি আমার ঝুড়ি ভেঙে ফেলেছেন ?' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'সেই যে আমার শিল-পাটা, তুমি তো জান, তাতে আমি পেঁয়াজ টমাটো আর লঙ্কা বাঁটতাম। ভেঙে ফেলেছে। তোমার বন্ধু শুয়োর ঝুড়ির সঙ্গে ওটাও বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

'তাই নাকি শুয়োর-ভাই ?'

'আমি একই সঙ্গে বোধহয় ও দুটোকে ফেলে দিয়েছি।' এই বলে শুয়োর বাইরে গিয়ে ঝুড়িটা নিয়ে এল কিন্তু শিল-পাটা কোথাও দেখতে পেল না।

'আমার বৌ-এর শিল-পাটা কোথায় ?'

'ওটা তো আমি দেখতে পেলাম না। আচ্ছা, আমি আবার খুঁজে আসছি।'

এবারও খালিহাতে ফিরে এল শুয়োর।

'যতক্ষণ না তুমি ঐ শিল-পাটা খুঁজে পাচ্ছ, ততক্ষণ তোমার টাকা কিছুতেই শোধ করব না আমি, তা বলে রাখছি কিন্তু।' এতক্ষণে কচ্ছপ তার রূপ প্রকাশ করল।

'বেশ আমি ওটা খুঁজছি।'

'দেখ শুয়োর, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না। আমি আমার বৌ-এর সেই শিল-পাটা চাই, অন্য কোনোটা আনলে চলবে না। এ আমি তোমায় স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

ওপরে-নিচে আশে-পাশে সব জায়গায় বন্ধু শুয়োর সেই হারিয়ে-যাওয়া শিল-পাটাটি খুঁজল, কিন্তু কোথাও সেটা সে পেল না। কেননা, শিল-পাটাটি ছিল ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে-থাকা কচ্ছপ নিজেই।

তাই আজও শুয়োরকে নাক দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখা যায়। সেইদিন থেকে মাটি খুঁড়ে সে শ্রীমতী কচ্ছপের শিল-পাটা খুঁজছে। আজও সে খুঁজেই চলেছে, এখনও পায়নি। যেমন ফেরৎ পায়নি সেই টাকা অকৃতজ্ঞ কচ্ছপের কাছ থেকে।

বাদুড়ের স্বভাব

অনেকদিন আগের কথা। সেইকালে একবার পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। সেইসময় পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব তর্ক বাধল। তর্ক বাদুড়কে নিয়ে। বাদুড় কোন দলে যোগ দেবে? পশুদের দলে না পাখিদের দলে? বাদুড় খুব চতুর। সে জানে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। তার খুব বুদ্ধি। অনেক দিক ভেবেচিন্তে সে কাজ করে। পাখিরা যখন প্রভু ছিল, পাখিরা যখন পশুদের ক্রীতদাস করে রেখেছিল, তখন বাদুড় ছিল পাখিদের সঙ্গে। তার ভাগ্যকে সে পাখিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। তখন পাখিরা ছিল রাজা, পশুরা ছিল পরাধীন।

এমনি করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। পশুদের অশেষ কষ্ট। শেষকালে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সিংহ ও বাঘ প্রস্তাব দিল যে, অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে আমরা কখনও পেরে উঠব না, তাদের সঙ্গে রেষারেষি বা যুদ্ধ করেও কিছু হবে না, তাই এসো বন্ধুগণ, আমরা শান্তির প্রস্তাব রাখি। তাদের কাছে মাথা নত করলে তারা খুশি হয়ে আর অত্যাচার করবে না।

এই পরামর্শ শোনামাত্র অন্য সব পশু হৈ হৈ করে উঠল। তারা সবাই মিলে শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, এভাবে অত্যাচার বন্ধ হবে না। আমরা লড়াই করব, আর শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব। আমাদের শক্তি তো কম নেই? এসো, সবাই মিলে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। সিংহ আর বাঘ বাধ্য হয়ে মেনে নিল তাদের কথা। আবার যুদ্ধ বাধল অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে।

এতদিন বাদুড় ছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর পাখিদের দলে। কিন্তু যখনই পশু আর পাখিদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তখন সে আলাদা হয়ে থাকল। পাখিদের কাছ থেকে সরে এল, কিন্তু পশুদের দলেও যোগ দিল না। সে দেখছে, কে জেতে। তারপরে তার দলে যোগ দেবে। পশুরা নজর রাখল, বাদুড়ের ভাবগতিক দেখল। সবই বুঝতে পারল তারা।

পশুরা জোর লড়াই চালাচ্ছে। সেইসময় তারা শেয়ালকে পাঠাল বাদুড়ের কাছে। শেয়ালকে বলল, বাদুড়কে বন্দী করে নিয়ে এসো।

শেয়াল তক্ষুণি বাদুড়ের কাছে গিয়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে এল। পশুদের নেতারা বসে রয়েছে, বন্দী বাদুড়কে নিয়ে আসা হল তাদের সামনে। তারা বলল, বাদুড় দু'রকম চরিত্রের। আগে ছিল পাখিদের দলে এখন আলাদা হয়ে সরে আছে। এ কাজ জঘন্য। বাদুড়কে আমরা অভিযুক্ত করছি। বাদুড় কেন এরকম করেছে তার জবাব দিক।

বাদুড় বলল, "এতে কোনো দোষ নেই। এরকম কাজ করতে আমি বাধ্য

হয়েছি। আমার বৌ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। আমার বৌ আমাকে বলেছে, 'গণ্ডগোলের সময় সরে থাকবে, আর যেই একদল জিতবে তখন তার দলে গিয়ে বলবে, আমি তো তোমাদের দলেই ছিলাম। তাতে যুদ্ধ জেতার ফলে যতো ভালো ভালো জিনিস, তা সবই পাবে।' আগে আমি বৌয়ের কথায় জেতাদল পাখিদের সঙ্গে ছিলাম, আর এখন দেখছিলাম কি হয়। আমার কোনো দোষ নেই।"

বাদুড়ের এই দু'রকমভাবে চলাফেরার জন্য সব পশু তাকে ভীষণভাবে গালাগালি দিল। তারপর তাকে নিজেদের জঙ্গলে ঘেরা একটা ঘরে বন্দী করে রাখল। ঠিক হল, যুদ্ধের পরে তার বিচার হবে। এখন যুদ্ধ নিয়ে তারা ব্যস্ত, পরে ঠিকমতন বিচার করা যাবে।

দশ বছর ধরে চলল এই ভীষণ যুদ্ধ। কত পাখি, কত পশু মারা পড়ল, কতজন আহত হয়ে পড়ে রইল। শেষকালে পশুরাই জয়ী হল। তারা মরণপণ লড়াই চালিয়ে পাখিদের একেবারে হারিয়ে দিল।

পশুদের মধ্যে যাদের খুব বুদ্ধি তাদের নিয়ে একটা দল করা হল। তারপরে তাদের সামনে বাদুড়কে ডাকা হল। এবার তার বিচার হবে।

বাদুড় বুঝল, সে এবার বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছে। এতদিন বুদ্ধি করে সে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার? ব্যাপারটা খুব শক্ত, তাই সে আরও বুদ্ধিমান একজনকে অনেক ভেট দিয়ে তার হয়ে কথা বলতে বলল। লোভে পড়ে সে রাজি হল।

বাদুড়ের সেই বুদ্ধিমান বন্ধু বলল, "বাদুড়ের অধিকার আছে যে-কোনো দলে যোগ দেবার। তার স্বভাব, তার চেহারা, তার চরিত্র এমনই যে, সে যে-কোনো দলে সুন্দরভাবে মিশে থাকতে পারে, আর তাই সে করেছে। যদিও সে পাখি নয়, তবু তার দুটি ডানা আছে, সে আকাশে উড়তে পারে। তাই সে যখন আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায় তখন কেউ বলবে না যে সে অন্যের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই নিশ্চয়ই মানবে, তার যখন ডানা আছে তখন তার আকাশে উড়বার অধিকারও আছে। আবার বাদুড়ের অন্যদিকে তাকান, দেখবেন যে, তার সারা দেহ লোমে ঢাকা, তার দাঁত আছে, বেশ বড় কান আছে। অথচ পাখিদের লোম দাঁত এবং কান কোনোটাই নেই। লোমের বদলে রয়েছে পালক। তাহলে সে তো পশু। তাই যখন সে পশুদের দলে যোগ দিতে চায় তখন তার বাধা কোথায়? তার দেহই এমন যে, সে পাখি বা পশু যে-কোনো দলেই ভিড়ে যেতে পারে। এতে তার নিজের দোষ কোথায়? বিচার করে দেখুন, বুঝতে পারবেন বাদুড় নির্দোষ, তার কোনো দোষই নেই।"

ছিঃ কি লজ্জা

গ্রামের মানুষ খুব বিপদে পড়েছে। বিপদ বলে বিপদ, এক মহাবিপদ। তালের গাছ থেকে ফলের সব শাঁস কে যেন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এত তালগাছ গাঁয়ে, কিন্তু সব শাঁস চুরি যাচ্ছে। গ্রামের মানুষের কষ্টের সীমা নেই। এই শাঁস থেকে তারা তেল তৈরি করে। সেই তেল দিয়ে রান্না করে, তরিতরকারি বানায়, মাংস রাঁধে। তেল নেই, রান্না করা যাচ্ছে না, যা-ও বা রান্না হয়, মুখে রোচে না। বড় কষ্ট তাদের। এমনিতে কত কষ্ট, কত বিপদ-আপদ, তার ওপরে আর এক নতুন বিপদ।

তারা অনেক চেষ্টা করল, বারবার চেষ্টা করল, অনেক কায়দা করল, বহু ধরনের বুদ্ধি খাটালো—কিন্তু চোর আর ধরা পড়ে না। যতরকম কৌশল করে, বৃথা যায়। চোর অনেক চালাক, বারবার সে তাদের বোকা বানাতে লাগল। তাদের মাথায় হাত। চোর ধরা পড়ল না।

শেষকালে তারা সবাই মিলে সন্ধ্যেবেলা সর্দারের বাড়ির উঠোনে পরামর্শ করতে বসল। নানা রকমের কথা উঠল, নানা ধরনের বুদ্ধি এল, কথা কাটাকাটি চলল। শেষে একজন বুড়োমতন লোক বলল, 'আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। আসলে বাপু, দেবতা রাগ করেছেন। তিনি রাগ করলে ওসব চোর-টোর ধরা যায় না। অন্য ব্যবস্থা দেখ।' সবাই মেনে নিল বুড়োর কথা, সায় দিল তার পরামর্শে।

তারা দেবতার থানে ভক্তিভরে ছাগল বলি দিল, ভেড়া বলি দিল, মুরগীর ছানা বলি দিল। যার যেরকম সামর্থ্য তাই দিয়ে দেবতার পুজো করল। সবাই দিনে-রাতে দেবতার থানে আর্জি জানাল,—হে দয়াল দেবতা, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের বাঁচান, আমরা বড় গরিব।

দিন যায়, রাত যায়। আবার ফিরে আসে দিন, ফিরে আসে রাত। চোর কিন্তু ধরা পড়ে না। কে যে চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ তা বুঝতে পারল না। সবার মনে ভয়, সবার মনে চিন্তা।

চোর আর কেউ নয়, একটা কচ্ছপ। গভীর রাত, কালো কুকুরের গায়ের মত কালো আঁধার চারিদিকে, কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও, বাইরে ঘুরছে কেবল বুনো জানোয়ার। সেই সময় কচ্ছপ হামাগুড়ি দিয়ে তার বাড়ি থেকে

নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে, চলার সময় পায়ে কোনো শব্দ হয় না। হাতে থাকে একটা ধারাল ছুরি আর একটা বস্তা, বস্তার মধ্যে এক টুকরো শক্ত দড়ি। দড়ি পায়ে জড়িয়ে কচ্ছপ তর্‌তর্‌ করে তাল গাছে উঠে পড়ে, ছুরি দিয়ে তালের শাঁস কাটে,—তারপরে সেগুলো বস্তায় ভরে। নেমে আসে গাছ থেকে। আবার ওঠে অন্য গাছে। রাতের অনেকক্ষণ ধরে তার এই কাজ চলে। তারপরে পুব দিকে লাল থালাটা উঠবার অনেক আগেই নিঃশব্দ পায়ে গুটি-গুটি ফিরে চলে নিজের বাড়িতে। সব রাতেই একভাবে কাজ করে চলে কচ্ছপ। সকালের দিকে ঘুমটা তার ভালোই জমে। কেনই বা জমবে না!

এমনি করে চলে রাতের পর রাত। এক রাতে কচ্ছপ ছুরি বস্তা ও দড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবে,—এমন সময় বৌ বলল, 'আজ ঘরে থাক, আজ আর যেও না। সত্যি যেও না।'

'কেন?'—লম্বা গলা আরও লম্বা করে কচ্ছপ তাকাল। বিরক্ত হয়ে কথা বলল।

কচ্ছপ-বৌ ভয়ে ভয়ে বলল, 'দেখ, বাইরে কী ভীষণ অন্ধকার। কালো চুলের মতো। যদি তোমার কিছু হয়। বড্ড ভয় করছে।'

কচ্ছপ ফিক্‌ করে হেসে ফেলল। বলল, 'বৌ, আঁধার রাতই তো ভালো। বড় পছন্দ করি আঁধার রাত। কিচ্ছু ভয় নেই। আমি ঠিকঠিক ফিরে আসব।'

বৌ জলভরা চোখে বলল, 'না, তুমি যেও না। অন্তত আজকের রাতটুকু ঘরে থাক। কেন যেন বড় ভয় করছে।'

কিন্তু কাজ হল না। কচ্ছপের লোভ খুব বেড়ে গিয়েছে। অনেক দিন ধরে চুরি করছে, একদিনও ধরা পড়েনি। সাহসও তাই সীমা ছাড়িয়েছে। লোভ ও সাহস তাকে রাতে ঘরে থাকতে দেয় না। আরও তালের শাঁস চাই; আরও আরও। ঘরের দোরের কাছে গিয়ে কচ্ছপ বলল, 'বৌ, আজ বড় কালো আঁধার রাত। আজকে আমায় যেতেই হবে। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ কালকে আমি ঘরে থাকব, কালকে বাইরে যাব না। আজকে আমায় যেতেই হবে।'

'হায় কপাল!' বৌ কাঁদতে কাঁদতে ঘরের বাইরে এল।

কচ্ছপ অন্ধকার বনে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আজকে যেন খুব বেশি অন্ধকার। অন্ধকারে চলতে-ফিরতে কচ্ছপ খুব পারে, অনেক দিন ধরে তার এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কোনোই অসুবিধে হয় না। কিন্তু তারও আজ কষ্ট হচ্ছে

লাগল। দু-একবার হোঁচট খেল, মাথাটা গিয়ে লাগল গাছের গুঁড়িতে। এত অসুবিধে তো আগে কখনও হয়নি! ভাবল, নাঃ, আজকে নাহয় বাড়ি ফিরেই যাই। আর বৌ যখন অমন করে বারবার বলল। বৌ পেছন থেকে একবার ডাকলেই সে ফিরে যেত। কিন্তু বৌ তখন কাঁদছে। কচ্ছপ ফিরল না। এগিয়ে চলল গুটি গুটি।

কিন্তু এগোনো আজ বড় কঠিন। বেশ ব্যথা পেল কয়েকবার। একবার উল্টে এক গর্তে গেল পড়ে। পায়ে কাঁটার খোঁচা লাগল, 'নাঃ, আজ বেরিয়ে ভালো কাজ করিনি। ঘরে থাকলেই হত। আজ কাজে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেশ বেগতিকে পড়লাম।'

ভাবতে ভাবতেই এক মস্ত শক্ত গাছের গুঁড়িতে তার মাথা প্রায় থেঁতলে গেল। ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল মাথাটা, চোখ অন্ধকার হয়ে এল। হঠাৎ চোখ মেলে কচ্ছপ দেখল,—গাছটা এদিক ওদিক দুলছে আর হাসছে, দুলছে আর হাসছে। কচ্ছপ এক মুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কি অবাক কাণ্ড! তারপরে ঘুরেই দৌড় লাগাল বাড়ির দিকে। ভয়ে পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে, তবু সে ছুটছে। মাথার ব্যথার কথা একেবারেই ভুলে গেল। শেষকালে থামল তার বাড়ির দরজায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি এসেছি বৌ, দরজা খোল।'

বৌ খুব খুশি হল। তার কথায় কচ্ছপ শেষকালে ফিরে এসেছে। আবার অবাকও হল। তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু কচ্ছপ কোনো কথাই বলল না। যা ঘটেছে তার কথাও কিছু ভাঙল না।

দিন হল। দিন শেষ হল। আবার রাত এল। আবার অন্ধকারে গুটিগুটি এগিয়ে চলল কচ্ছপ! আজ সে বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছে। কচ্ছপ তালগাছে উঠল, শাঁস কেটে বস্তায় ভরল, নেমে এল। সে জানে না. সেই গাছ সব কিছু দেখল। যে গাছ আগের রাতে দুলছিল হাসছিল,—সে সব দেখল। কচ্ছপ ফিরে চলল বাড়িতে। না আজ কিছু অঘটন ঘটে নি। সে খুশি।

যে গাছটি হেসেছিল, সে হল আলুমো,—সে হল হাসির রাজা। আলুমো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে পাশের অন্য গাছগুলোকে কচ্ছপ চোরের কথা বলল। তারাও ভয় পেয়ে গেল।

'চোর!' নারকেল গাছ অবাক হল।

'তাহলে সে তো খুব শয়তান।' আমগাছ বলল।

'একরাতে তার সর্বনাশ হবে।' বাদাম গাছ বলল।

'কিন্তু কিছু তো করা দরকার।' পেয়ারা গাছ বলল।

'তাহলে? তাহলে আমরা কি করতে পারি?' শিরীশ গাছ জিজ্ঞেস করল।

'ওকে শাস্তি পেতেই হবে। এসব ছাড়াছাড়ি নেই।' পিপুল গাছ বলে উঠল।

'কি শাস্তি তাকে দেওয়া হবে?' লেবু গাছ মাথা নেড়ে বলল।

অন্য গাছগুলো একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'গাঁয়ের লোকজন কি মরে যাবে? ওদের সাহায্য করতেই হবে।'

সবাই সায় দিল। তারপরে তাকাল আলুমোর দিকে। আলুমো বলল, 'ওকে এমন ভয় পাইয়ে দিতে হবে যে জীবনে না ভোলে। তাহলেই ও জব্দ হবে।'

সব গাছ বলে উঠল, 'খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। ঠিক বলেছে আলুমো।'

আলুমো একটু চুপ করে রইল। তারপরে আস্তে আস্তে বলল, 'কি করতে হবে পরে আমি তোমাদের বলে দেব। চোর যখন আসবে তখন বুঝিয়ে বলব।'

পরের রাতে কচ্ছপ আবার রাতের আঁধারে বের হল। আজ তার ভয় একটু কম। গত রাতে তো কিছুই অঘটন ঘটেনি। সে হেলেদুলে গুটিগুটি এগিয়ে চলল। তাকে দেখতে পেয়েই আলুমো হাসতে লাগল। সে হাসছেই, হাসছেই।

আশেপাশের গাছগুলো হাসি শুনে জিজ্ঞেস করল, 'ও আলুমো, আলুমো,—তুমি এমনভাবে হাসছ কেন? কি হয়েছে বলই না। তুমি তো হাসির রাজা, আলুমো' 'এমন করে হাসছ কেন?'

আলুমো তখন হাসি থামিয়ে একটা গান গেয়ে উঠল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সব গাছ গেয়ে উঠল:

চলে কচ্ছপ গুটিগুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
রাতের আঁধার পড়ে লুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
ডান হাতে তার ছুরি,

আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
বাম হাতে তার দড়ি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
পেছনেতে বস্তা ধরি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো।

হঠাৎ তারা গান থামিয়ে দিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। গানের পরে আরও আরও নিস্তব্ধ মনে হল। পাতার শব্দও যেন নেই, সব চুপচাপ।

গাছগুলোর তলা দিয়ে কচ্ছপ এগোচ্ছে। হঠাৎ গাছগুলো তাকে টিট্‌কিরি দিতে শুরু করল, নানাধরনের মজার মজার নামে কচ্ছপকে ডাকতে লাগল। এবার কচ্ছপ সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেল, চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। তবু গাছেরা থামে না। কচ্ছপ আর সহ্য করতে পারল না। ভয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিল। পথে কোথাও থামল না।

কচ্ছপ শেষকালে বাড়ি পৌঁছল। এবার সে ভীষণ রেগে গিয়েছে। তার সবকিছু ভেস্তে গেল। আজ রাতে শাঁস চুরি করা হল না। তার ওপরে এমন টিট্‌কিরি! এমন আজেবাজে নামে ডাকা! বাড়িতে এসে বৌয়ের সঙ্গে সে একটিও কথা বলল না। কিছু খেল না। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম কি আসে!

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে যখন এসব কাণ্ড চলছে তখন সেই পথে গাঁয়ে ফিরছিল এক কিষান। সে সব কিছু শুনল, সব কিছু দেখল। একটু ভয় পেল, খুব অবাক হল। আবার নতুন কিছু জেনে ফেলার আনন্দও আছে। সে সোজা ছুটে এল গাঁয়ে। গাঁয়ে এসেই গোষ্ঠীপতির ঘরে গেল। গোষ্ঠীর সর্দারকে সব কিছু খুলে বলল।

সর্দার বলল, 'খুব ভালো। আজ তো অনেক রাত হল। তুমিও ছেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। বাড়িতে গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে আমার কাছে চলে আসবে।'

কিষানের কি আর রাতে ঘুম হয়! বারবার মনে পড়তে লাগল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। সকাল হতেই সে ছুটে গেল সর্দারের বাড়িতে। গিয়ে দেখে এর মধ্যেই আরও কয়েকজন গাঁও-বুড়ো সেখানে হাজির। সবাই মিলে পরামর্শ করতে বসল।

একজন গাঁও-বুড়ো বলল, 'এতদিন পরে দেবতা তাহলে মুখ তুলে

তাকালেন। আমাদের প্রার্থনা জানানো ঠিক হয়েছে। বলিতে দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন। যাইহোক, আমরা এই কজনা ছাড়া ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে। খুব সাবধান। আগে চোর ধরি, তারপরে সব বলা যাবে।'

অল্পবয়সী কিষান বলল, "কখনই না, আমি আর কাউকে কিছুই বলব না।'

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, রাতের বেলা কিষান ছেলের সঙ্গে দুজন গাঁও-বুড়ো সেই গাছের কাছে যাবে। যেই কচ্ছপ তালের শাঁস চুরি করতে আসবে, অমনি তারা চেপে ধরবে তাকে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

পরপর তিন রাত তারা সেই গাছের কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু কিছুই ঘটল না,—না হাসি, না গান, না কচ্ছপের দেখা। দুজন গাঁও-বুড়ো ভীষণ রেগে গেল। তাদের ধৈর্য আর কয় রাত থাকবে? আসলে, কচ্ছপ সেই যে ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরেছিল এই তিন রাত আর বেরোয় নি। তাই ঘটেও নি কিছু।

একজন বুড়ো বলল, 'কাল রাতে যদি কিছু না ঘটে আমি আর এমুখো হচ্ছি না। আর ভালো লাগে না।'

'আমিও আসব না।' অন্যজন বলল।

কিষান আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে বলল, 'একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে। চোর ধরা তো সহজ কাজ নয়! চোরেরও বুদ্ধি কম নয়। তাছাড়া, একটা কথা তো বুঝতেই হবে। সেদিনের ব্যাপারে কচ্ছপ নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে। তাই কয়েকটা দিন তো সে আর বাইরে বেরুবেই না, ঘরেই থাকবে। যা ভয় পেয়েছে। তারপরে একটু সাহস ফিরে এলে তবেই না আবার চুরি করতে আসবে! একটু অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আমি বলছি, সে আসবেই আজ হোক কাল হোক, তাকে আসতেই হবে। আমরা তাকে ধরবই।'

একজন বুড়ো বলে উঠল, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আর যে পারি না। তুমি নাহয় এখন অল্পবয়সী, সে কাল আমাদের অনেকদিন আগে চলে গিয়েছে। আমরা তো বুড়ো হয়েছি। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে থাকি কি করে বল? পারি না। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ কট্‌কট্‌ করে। কি করি বল!'

'আমিও পারি না।' অন্য বুড়ো বলল। অনেক কষ্টে সে চোখ খুলে রেখেছে।

পরের রাত। চারদিকে আঁধার। আবার তারা তিনজনে গাছের নিচে এল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ তারা শুনতে পেল, মনে হল হাসির শব্দ। কান খাড়া করে তারা শুনতে চেষ্টা করল।

একজন বুড়ো বলল, 'মনে হচ্ছে হাসির শব্দ আসছে ?'

কিযান বলল, 'হ্যাঁ, হাসির শব্দ।' উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে, চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আলুমোর হাসির শব্দ শোনা গেল, হাসি ছড়িয়ে পড়ছে নির্জন রাতে : হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

অন্য সব গাছ এক সুরে বলে উঠল, 'আলুমো, ও আলুমো, তুমি অমন করে দুলছ কেন ? অমনভাবে হাসছ কেন ? হলটা কি ?'

আলুমো গান গেয়ে উঠল, সব গাছ গলা মেলালো। রাতের বনভূমি সরব হয়ে উঠল। তারাও শুনল সে গান :

চলে কচ্ছপ গুটিগুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
রাতের আঁধার পড়ে লুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
শাঁস চুরি, শাঁস চুরি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
ডান হাতে তার ছুরি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
বাম হাতে তার দড়ি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
পেছনেতে বস্তা ধরি,
ধরো ধরো ধরো তারে,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো।

গান থেমে গেল। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। কচ্ছপ সাহসে ভর করে এগিয়ে চলেছে। লোক তিনজন তার পেছনে পেছনে চুপচাপ এগোচ্ছে। তারা হাঁটছে যেন কচ্ছপ মোটেই টের না পায়। চোরকে আজ ধরতেই হবে।

একটা তাল গাছের নিচে এসে কচ্ছপ থামল। ওপরে তাকিয়ে দেখল, গাছভর্তি তাল। বস্তাটাকে গাছের তলায় রেখে দিল। পায়ে জড়িয়ে নিল

দড়িটা, ডানহাতে ছুরিটাকে বাগিয়ে ধরে সাবধানে গাছে উঠতে শুরু করল। উঠতে উঠতে দু-একবার নিচে ও আশেপাশে তাকাল। হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ তালশাঁস পড়ার শব্দ হল। পড়ছেই, পড়ছেই। এখন আর চারিদিকে চুপচাপ নেই।

হঠাৎ সেই তিনজন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি তিনজনে মিলে বস্তাটাকে তুলে নিল। ছয় হাতে সেটাকে বিছিয়ে ধরল। তারপরে চিৎকার করে উঠল, 'এইবার কচ্ছপ কোথায় যাবে?' কচ্ছপ মানুষের গলা শুনে ভয় পেয়ে নিচে তাকাল, লোকদের দেখে তার হাত-পা আলগা হয়ে গেল। ঝুপ্‌ করে পাকা তালের মতো বস্তায় এসে পড়ল। মাটিতে পড়লে তো সে চৌচির হয়ে যেত।

তাকে ধরে নিয়ে তারা গাঁয়ে ফিরল। আঃ কি আনন্দ! চোর ধরা পড়েছে। আর অনেককাল পরে।

সর্দারের বাড়ির উঠোনে বিচার-সভা বসল। তার বিচার হল। তাকে কয়েকমাস গাঁয়ের খোঁয়াড়ে রাখার ব্যবস্থা হল। কচ্ছপ কিছু বলল না। সে যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

খোঁয়াড়ের মেয়াদ শেষ হল। কচ্ছপ ছাড়া পেল। মাথা নিচু করে সে গাঁ থেকে বেরিয়ে এল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! তারপর থেকে কাউকে দেখতে পেলে সে দেহের খোলের মধ্যে তার মুখ লুকিয়ে ফেলে। সে যে চোর, ধরা পড়েছিল! মুখ দেখাবে কেমন করে? তাই আজও কাউকে সামনে দেখলেই সব কচ্ছপ অমন করে খোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নেয়। মনে মনে বলে, ছিঃ কি লজ্জা!

মানুষ-খেকো রাজা

অনেকদিন আগে এক মিষ্টিজলের নদীর পাশে ছিল এক রাজার বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের অন্যদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বন আর বন। সেই প্রাসাদে থাকত এক রাজা। তাকে সবাই খুব ভয় করত। রাজার প্রাসাদের চারিদিক ঘিরে অনেক প্রজা তাদের বাসা বেঁধেছিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা উঠোনে রাজার খাবার তৈরি হচ্ছে। ওপরে খোলা আকাশ, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ফুটন্ত সব খাবারের ওপরে। প্রায় সব রান্নাই শেষ, শুধু মাংসটাই বাকি আছে। আজকে রাজার জন্য ভেড়ার মাংস করা হচ্ছে।

মাংস যখন কড়াইতে ফুটছে, সেই সময় উড়ে যাচ্ছিল একটা বাজ-পাখি, পায়ে তার একটুকরো মানুষের মাংস। সে নদীর পাশে পড়ে-থাকা একটা মৃত-দেহ থেকে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ টুপ করে সেটা পড়ে গেল রাজার উঠোনের সেই ফুটন্ত কড়ায়ের মধ্যে। রান্না যারা করছিল তারা কেউ তেমন খেয়ালই করে নি যে, ওপর থেকে কিছু পড়ল।

রান্না শেষ হলে রাজার ঘরে সব খাবার দিয়ে এল তারা। সব খেল সেই পেটুক রাজা; কিন্তু আজকে যেন একটুকরো মাংসের কেমন চমৎকার স্বাদ লাগল। তিনি জীবনে এমন সুন্দর মাংস খান নি, তার অবাক লাগল—তিনি তো শুধু এই খেয়েই থাকতে পারেন—যদি পাওয়া যায় এমন সুস্বাদু মাংস।

যে রান্না করেছে তার ডাক পড়ল। সে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল আর

ম. সে রান্না করেছে ভেড়ার মাংস।

জানাল যে, তিনি ভেড়ার মাংস খেলেন, কিন্তু আগের দিনের সেই

পরের দিন ন তুলনাই হয় না। তিনি শেষে ছাগল, গোরু, মোষ,

টুকরোটার সঙ্গে কোনে. ন। কিন্তু কিছুতেই সেইরকম স্বাদ লাগছে না।

এইসবের স্বাদ নিতে লাগলে.. পতিদিন বনের নতুন পশু মেরে আনতে।

তারপরে তিনি আদেশ দিলেন, নি, তোদের মাংস খেতে লাগলেন।

এতদিন তিনি যে সব পশুর মাংস খান. তিনি সেইদিনকার মতো এক

তবু তার লোভ মিটল না—কোথায় পাবেন

টুকরো মাংস। -পড়া এক টুকরো

আসলে সেই টুকরোটা বাজপাখির পা থেকে খসে স্বাদ পাবেন

মানুষের মাংস। তাই যতই তিনি নানা পশু খান না কেন অমন

কোথা থেকে?

সেই রাজার একটা কেনা চাকর ছিল। তিনি চাকরকে যখন কিনেই নিয়েছেন, তখন যা-খুশি-তাই তিনি করতে পারেন তাকে নিয়ে। একদিন হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল, মানুষের মাংস তো খাওয়া হয় নি? সেইদিন সেই কেনা চাকরকে বলি দেওয়া হল আর তার মাংস দিয়েই সেদিন রাজার খাবার তৈরি হল।

মাংসের টুকরো মুখে দিয়েই রাজা উঠলেন লাফিয়ে। এতদিন পরে ঠিক মাংসের হদিস্ পাওয়া গিয়েছে। আজ থেকে নিত্য তার চাই মানুষের মাংস।

তারপরের দিন থেকে তার প্রাসাদে যারা চাকরি করত তাদের এক একজনকে তিনি বলি দিতে লাগলেন। মনের সুখে জিভের সুখ মেটাতে লাগলেন। জীবনে এতদিনে যেন তিনি বাঁচার সত্যিকার মানে খুঁজে পেলেন। গুন্ গুন্ করে গান করেন, প্রাসাদের ছাদে ঘুরে বেড়ান আর খাওয়ার সময়ের জন্য চেয়ে থাকেন।

এমনি করে প্রাসাদের সব্বাইকে তিনি খেয়ে ফেললেন, এমন কি লোভের নেশায় ছেলে-বৌও মারা পড়ল। প্রাসাদ এখন শূন্য, তিনি মাত্র একা, চারিদিকে লোক নেই জন নেই খাঁ খাঁ শ্মশান।

এইসব না দেখে আর রাজার রাক্ষসপনা স্বভাবের জন্য প্রাসাদের আশেপাশের লোকজনও নদী ডিঙিয়ে পালাল অনেক দূরে। এমন জায়গায় তারা চলে গেল যেখান থেকে রাজা আর তাদের খুঁজে পাবে না।

কেউ রইলনা মানুষখেকো রাজার কাছে। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য। প্রাসাদের ছাদে ঘোরাফেরা করতেন, ছট্‌ফট্ করে বেড়াতেন, হাতের চামড়ায় কামড বসাতেন।

শেষকালে আর থাকতে না পেরে তিনি নিজের হাঁটুর ওপরের কিছুটা মাংস কেটে রান্না করে তাই খেলেন। অনেক তৃপ্তি পেলেন তিনি। পরের দিন অন্য হাঁটুর ওপরের মাংস কাটলেন। পরের দিন বুকের, অন্যদিন পেটের, আরেকদিন হাতের।

এমনি করে দিন পনের যেতেই তার গায়ে শুধু হাড় ছাড়া আর কিছুই থাকল না। গোটা দেহের হাড়ের ওপরে মাথায় কোঁকড়ানো চুল, দেহে মাংসের একরত্তিও নেই। তিনি যখন চলতেন খটাখট্ করে হাড়ের আওয়াজ হত, কট্ কট্ করে পায়ের পাতার হাড়গুলো কথা কয়ে উঠত।

শেষে তিনি বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদের বাইরে, মানুষের মাংস খোঁজে

করতে। তিনি চলেছেন এগিয়ে, নদী ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে। কিন্তু কোথাও নেই মানুষ, সবাই রাজার কথা শুনে সে মুলুক ছেড়ে একেবারে পালিয়েছে। মানুষ আর তাই কোথায় পাবেন রাজা!

তবু হাল তিনি ছাড়েন নি। অন্যের মাংস তার চাইই, নিজের দেহে তো একরত্তিও মাংস নেই!

এমনি করে কয়েকদিন কাটল। না খেয়ে তিনি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছেন, হাড়গুলো কেমন রোগা রোগা কাঠির মতো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু যে তাকে চলতেই হবে! একসময় খুব ক্লান্ত হয়ে বিরাট মোটা একটা গাছের তলায় তিনি ঠক্ করে বসে পড়লেন। হাড়গুলোর খটাখট্ আওয়াজ হয়েই থেমে গেল, তিনি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

হঠাৎ গাছের অন্য পাশে তিনজন লোক এসে বিশ্রাম করতে বসল। পোঁট্লা খুলে কিছু খেল, গল্পগুজব করল। রাজা গুটিসুটি মেরে এমনভাবে বসে রইলেন যেন তারা তার হাড়-দেহ না দেখতে পায়। তিনি নিঃশ্বাসও চেপে চেপে ছাড়লেন, হাত-পা একটুও নড়ালেন না, যদি খটাখট্ আওয়াজ হয়!

বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই তিনজন লোক তাদের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে রাস্তা হাঁটতে শুরু করল। তারা কিন্তু এসেছে অনেকদূর থেকে, তাই মানুষখেকো রাজার নাম শোনে নি। তারা উঠতেই রাজা তাদের পিছু নিলেন। আস্তে আস্তে তিনি এগোলেন, খেয়াল রাখলেন একজনের ওপর, একটু কায়দামাফিক পেলেই ধরবেন চেপে তার গলা...আর---যেন জিভের রসে রাজা আর চিন্তা করতে পারছেন না।

হঠাৎ একটা মোড় বেঁকতেই খপাৎ করে মুখটা জোরে চেপে ধরলেন তিনি তার হাড়-হাত দিয়ে। অন্য হাতে চেপে ধরলেন গলায় শক্ত মুঠোয়। একে আঘাত, তায় হাড়ের দেহ দেখে লোকটা তক্ষুণি মরে গেল। গড়িয়ে পড়ল তার দেহ। ঘন বনের অন্ধকারে সামনের দুজন ভাবল, বন্ধু বুঝি আসছেই।

রাজা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। রাস্তা থেকে দেহটা সরানো দরকার। নইলে অন্য কেউ যদি চলে আসে। তিনি প্রাণপণে দেহটাকে টানতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দেহটার ওপর। এত দুর্বল তিনি হয়ে পড়েছেন না খেয়ে খেয়ে যে পড়েই তিনি মরে গেলেন। তার হাড়ের শরীরের নিচে বলিষ্ঠ লোকটার নরম দেহটি তখনও বেশ গরমই ছিল।

তিন পড়শী

সমস্ত মাঠ ভরে সোনার রঙের ধান ফলেছে। তার ওপর দিয়ে মিষ্টি বাতাস ঢেউ খেলে চলেছে। দুই পড়শী ভালুক আর নেকড়ের আনন্দের সীমা নেই—অন্তত খিদের চিন্তা আর সারাবছর করতে হবে না। কিন্তু কাজ তো কম নয়। তাই তারা তাদের আর এক পড়শী শেয়ালকে ডাকল। ভালুকের দেহ বিশাল, খাটতেও সে পারে তেমনি। শেয়াল খুশি মনে তাদের দলে এল, তারও চিন্তা থাকবে না পেটের। মাঠ ভর্তি যে সোনার রঙের ধান।

ধান কাটা হয়ে গেল। শেয়াল একটু কাজও করল না, পুরো ফাঁকি দিল। এখন ধান ঝাড়া-বাছার সময় হল। নেকড়ে বলল, 'এখন শুধু কাজের কথা, এই বিরাট কাজ আমাদের তিনজনকে ভাগ করে নিয়ে শেষ করতে হবে।' শেয়াল তৎক্ষণাৎ ঘেরা-দেওয়া কাঠের পাঁচিলের ওপর উঠে গিয়ে বলল, 'এই কাঠগুলো যাতে তোমাদের মাথায় পড়ে না যায় তার জন্য আমি এগুলোকে জোরে ধরে রাখি। এগুলো যদি গোড়া উপড়ে পড়ে তাহলে আর তোমাদের বাঁচতে হবে না।' দুজনে রাজি হয়ে গেল তার ভয়-পাওয়ানো কথায়, সত্যি তারা বড্ড ভয় পেয়েছে।

নিচে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে লাগল সেই নেকড়ে আর ভালুক। তারা কাঠের পাটাতনে খড় থেকে ধান ছাড়াচ্ছে, ধান ভানছে, কুটছে ও ঝাড়ছে। ওপরে ঠায় বসে রইল সেই শেয়াল, গতর সে খাটাবে না। মাঝে মধ্যে শেয়াল ঝুলে পড়া-গাছের ডাল থেকে টুকরো ভেঙে নিয়ে নেকড়ে ও ভালুকের মাথায় মারতে লাগল। ওরা কাজে ব্যস্ত, তাই বুঝল না শেয়ালের শয়তানী। হঠাৎ ভয় পেয়ে ভালুক বলল, 'শেয়াল, এমন হচ্ছে কেন?'

শেয়াল খুব গলা কাঁপিয়ে বলল, 'এই কাঠগুলো ধরে রাখা খুব কঠিন, আমি একা পারছি না। তাও তো দু-একটি কাঠের টুকরোই ছিট্‌কে পড়ছে, তাই রক্ষে। গোটা কাঠ পড়লে তো একেবারেই মরে যাবে। ছোট কাঠের টুকরো মাঝে মাঝে ছুটে যাবে, কিন্তু ওতে ভয় পেও না।' সে শয়তানী করে একটু বাদে বাদেই কাঠ ছুড়তে লাগল।

সমস্ত দুপুর হাড়ভাঙা খাটুনির পরে কাজ শেষ হল। যেই ওপর থেকে শেয়াল দেখল যে, সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, অমনি উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে তাদের মাঝখানে। মাটিতে পড়েই সে চিত হয়ে শুয়ে লম্বা জিভ্ বের করে হাঁইফাঁই করে নিঃশ্বাস টানতে লাগল, যেন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পাশে নেকড়ে ও ভালুক তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। শেয়াল বলল, 'ওঃ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই

ভেবে যে, আমার কাজটা আমি খুব ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি। জীবনে এত খাটুনি আমি কোনোদিন করি নি।'

নেকড়ে বলল, 'তাহলে এখন আমাদের উচিত এই শস্যগুলো তিনজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া।'

শেয়াল খুব মিষ্টি গলায় বলল, 'তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি।'

নেকড়ে আর ভালুক একসঙ্গে বলল, 'সেকি কথা! তুমি কিছু বলবে তাতে আর বলার কি আছে! বল বল।'

শেয়াল তখন বলল, 'আমরা এখানে তিনজনে আছি, আর দেখ ভগবানের দয়ায় শস্যও মাটিতে তিনভাগ হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে যার দেহ সবচেয়ে বড় সে পাবে বড় ভাগটা, মধ্যের ভাগটা পাবে যার দেহ মাঝারি, আর ছোট ভাগটি পাবে সে যার দেহ সবচেয়ে ছোট। তাই ভালুক পাবে বড় ভাগটি, মধ্যের ভাগটি পাবে নেকড়ে আর সবচেয়ে ছোট ভাগটি পাব আমি শেয়াল। কি তোমরা খুশি তো?'

বোকা নেকড়ে ও হাঁদারাম ভালুক তাই মেনে নিল। ভালুক পেল বিরাট খড়ের গাদা, নেকড়ে পেল জড়ো-করা ধানের তুষের পাহাড়। আর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার আসল ধানের অংশটি পেল শেয়াল।

এইভাবে নিজেদের অংশ পেয়ে তারা চলল ধান ভাঙতে। তিনজনেই একসঙ্গে ধান-ভাঙার কলের কাছে গেল। প্রথমে ভালুক ও তারপরে নেকড়ে তাদের খড় ও তুষ কলে দিল ও আনন্দে নাচতে লাগল। কিন্তু যেই শেয়াল তার অংশ কলে দিল, সেই মুহূর্তে কি রকম একটা ঘরঘর আওয়াজ শোনা গেল, এ আওয়াজ ভালুক ও নেকড়ের ভাগ দেওয়ার সময় হয় নি।

এই আওয়াজ শুনে তারা বলল, 'শেয়াল, আমাদের সময় এরকম শব্দ হল না কেন?'

শেয়াল বলল, 'হায় কপাল! তোমাদের ভাগে বোধহয় বালি মেশাও নি? কিছুটা বালি মিশিয়ে কলে দাও, তোমাদেরটাতেও শব্দ হবে।'

এই কথা শুনে ভালুক ও নেকড়ে তাদের ভাগে কিছুটা করে বালি মিশিয়ে নিল। তখন তাদের শস্যের শব্দ হল, এমন কি শেয়ালের শস্যের শব্দের চেয়েও বেশি। তারা সাদাসিদে, তাই সেই আনন্দেই নাচতে লাগল। সেই ফাঁকে পিঠে চালের বস্তা নিয়ে শাঁকালুর মত দাঁত বের করে হাসতে হাসতে শেয়াল লেজ ফুলিয়ে বনের পথে মিলিয়ে গেল।

একশ' গোরুর বদলে একটি বৌ

অনেক পুরনো কালের কথা। সেই কালে এক গাঁয়ে থাকত একজন লোক আর তার বৌ। বহুদিন ধরে তারা সেই গাঁয়ে ঘর-সংসার করছে। অনেক অনেক বয়সে তাদের একটা ছেলে হল। দুজনের মনেই খুব আনন্দ। সকাল বেলার রোদের মত ঘর আলোতে ভরে গেল। সে যে কি আনন্দ তা তারা বোঝাবে কেমন করে ?

তাদের অবস্থা মোটামুটি বেশ ভালোই ছিল। কেননা, তাদের ছিল একশ' গোরু। যদিও গোরুগুলোর কোনো বাছুর ছিল না তবু সুখে দিন কেটে যেত। তাদের জমি-জিরেত ছিল না, কিন্তু একশ'টা গোরু কম কিসে !

বাগানের গাছ যেমন দেখতে দেখতে বড় হয়, পুষ্ট হয়, ছেলেও তেমনি বেড়ে উঠল। ছেলের বয়স হল পনেরো। মাঠে-বনে গোরু চরিয়ে ছেলের স্বাস্থ্য হয়েছে সুন্দর, সবল। তাকে এখন জোয়ান বলেই মনে হয়।

কিন্তু হঠাৎ ছেলেটির বাবা মারা গেল। একটু মুষড়ে পড়ল সে। আবার কয়েকদিন পরে সব ঠিক হয়ে গেল। বছর তিনেক পরেই তার মা-ও মারা গেল। ছেলেটি খুব কাঁদল। বড় একা সে। বাবা-ও নেই, মা-ও নেই। শুধু বাবা-মায়ের রেখে-যাওয়া একশ' গোরু সে পেল। আর তো কেউ নেই, তাই সে-ই হল এসবের উত্তরাধিকারী।

কয়েকদিন সে বাড়িতেই রইল। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি করল। যা যা ছেলেদের করতে হয়। সবই ভালোভাবে করল। বাবা-মা যে তার বড় আপনার জন ছিল !

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। যতক্ষণ বাইরে থাকে, বেশ থাকে। কিন্তু বাড়িতে এলেই বড় একা একা লাগে। কথা বলার কেউ নেই, সুখ-দুঃখের গল্প করার কেউ নেই। এমন করে আর কতদিন চলবে ? তাই ছেলেটি ঠিক করল,—সে বিয়ে করবে।

একদিন এক পড়শীকে সে বলল, 'আমি বিয়ে করব। বাবা-মা মারা গেল, আর তো আমার কেউ নেই। আমি বড় হয়েছি। একা একা ভালো লাগে না। তাই বিয়ে করতে চাই। তুমি কি বল ?'

পড়শী খুব খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক কথা, বিয়ে তো করাই উচিত। বড় হয়েছ, তার ওপর বাবা মা নেই। একা একা তো লাগবেই! বিয়ে তো করতেই হবে!'

ছেলেটিও পড়শীর কথা শুনে খুব খুশি হল। লাজুক লাজুক মুখে বলল, 'তাহলে, তাহলে মেয়ে তো তোমাদেরই খুঁজেপেতে দিতে হবে। আমি তো কিছু জানি না।'

পড়শী মাথা নেড়ে বলল, 'আরে! সে তো আমাদেরই করতে হবে। এ তো আমাদের কর্তব্য। তোমার বাবা নেই, মা নেই, আমরাই তো এসব দেখব। তোমার জন্য একটা খুব সুন্দরী মেয়ে দেখব, সে তোমার খুব ভালো বউ হবে।'

'তাহলে, তাই দেখ।' ছেলেটি বলল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'একজন যদি কেউ মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তবে খুব ভালো হয়। তাড়াতাড়ি করাই ভালো।'

পড়শী বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন। তার ইচ্ছেতেই সব হবে।'

গাঁয়ের সবাই মিলে পরামর্শ করল। বৌ হবে সুন্দরী আর খুব ভালো। পরের দিন সকালে একজন পড়শী বেরিয়ে পড়ল মেয়ের খোঁজে। অনেক অনেক দূর যেতে হতে পারে, তাই সঙ্গে নিল খাবার। যতক্ষণ আর যতদিন সে মেয়ে খুঁজে না পাবে, ততদিন আর গাঁয়েই ফিরবে না। ঘুরতে ঘুরতে সে ভালো পাত্রী পেল। গাঁয়ে ফিরে এল।

পড়শী ছেলেটিকে বলল, 'হ্যাঁ, শেষকালে পাত্রী পেলাম। কিন্তু সে এ গাঁয়ের মেয়ে নয়, পাশের গাঁয়েরও নয়। সে থাকে এখান থেকে অনেক দূরে। তবে তুমি যেমনটি চাও ঠিক তেমনি।'

ছেলেটি বলল, 'তাহলে সে থাকে কোথায়? কতদূরে?'

পড়শী বলল, 'সে অনেক দূর। ভিন্ গাঁয়ে থাকে সে মেয়ে। আমাদের গাঁ থেকে মেয়ের সেই গাঁয়ে যেতে আট ঘণ্টা সময় লাগবে। বড় দূরে হয়ে গেল। কিন্তু বৌ হিসেবে মেয়েটি খুব ভালো!'

ছেলেটি বলল, 'সে কার মেয়ে?'

পড়শী খুব উৎসাহে বলতে লাগল, 'সে মেয়ে খুব বড়লোকের মেয়ে। তার ছয় হাজার গোরু-মোষ আছে। শুধু কি তাই? ঐ মেয়েই তার একমাত্র

সন্তান। একটাই মেয়ে, আর কোনো ছেলেপুলে নেই। বুঝতেই পারছ, সব পাবে ঐ মেয়েই।'

একথা শুনেই ছেলেটি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। সে ভাবল, এমন মেয়েকেই বিয়ে করতে হয়! এ মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। মুখে বলল, 'ভাই, আমি রাজি। এই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। তুমি কালকেই মেয়ের বাবাকে আমার মতটা জানিয়ে দিতে পারবে?'

পড়শীও পাত্রী ঠিক করতে পেরে খুব খুশি। তার পছন্দ-করা মেয়েকে ছেলেটি বিয়ে করতে চেয়েছে, এটা কি কম কথা? তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে, এ আর বেশি কথা কি? বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন, তার ইচ্ছেতেই সব হবে। কাল সকালেই আমি মেয়ের বাবার গাঁয়ে রওনা হব। কোনো কিছু ভেবো না তুমি।'

সবে পুব দিকে সূর্য লাল হয়েছে। লাল ছটা আকাশে রক্ত ছড়াচ্ছে। পড়শী খাবার বেঁধে রওনা দিল দূর গাঁয়ের পথে। সূর্য যখন আকাশে আগুন ছড়াচ্ছে, পথের মাটি যখন উনুনের ধারের মতো গরম হয়ে উঠেছে, তখন পড়শী পৌছল সেই গাঁয়ে, মেয়ের বাবার বাড়িতে। ছেলেটির মনের কথা সব জানাল। ছেলেটির কথা সব খুলে বলল।

বাবা বলল, 'বেশ, শুনলাম তোমার কথা। শুনলাম ছেলেটির মনের কথা। কিন্তু বাপু, আমার মেয়ে কেমন তা-তো জানই। কন্যাপণ তো তেমন কম নিতে পারি না! তা যখন ছেলেটির মনে ধরেছে, তখন একশ'টা গোরু দিলেই চলবে। ছেলে যদি রাজি থাকে, তবে আমি কথা দিচ্ছি মেয়েকে আমি তার হাতেই দেব। একশ'টা গোরু! দেখ, সে রাজি কিনা।'

ঘটক পড়শী বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন, তার ইচ্ছেতেই সব হবে। আমি একথাই ছেলেটিকে জানাব। তাহলে চলি।'

বাবা বলল, 'হ্যাঁ, ঐ কথাই রইল।'

ঘটক পড়শী মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সেখান থেকে রওনা হল। গাঁয়ে ফিরে এসে সে সব কথা ছেলেটিকে জানাল। মেয়ের বাবার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সব খুলে বলল।

সব শুনে ছেলেটি বলল, 'ভাই, সব তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়ের বাবা একশ'টা গোরু চেয়েছে, আর আমার তো ঐ একশ'ই সম্বল। জমি নেই, জিরেত নেই, অন্য কোনো কিছুই নেই। মনে কর আমি তাকে সব দিয়ে দিলাম, তাহলে আমি আর বৌ খাব কি? বাঁচব কেমন করে? আমার

তো একশ'টা গোরু ছাড়া আর কিছুই নেই। বাবা -মা আমার জন্য আর তো কিছু রেখে যায়নি! কি করি বলতো?'

পড়শী বলল, 'সে তো ঠিক কথা। সব দিয়ে দিলে তোমরা দুজনে খাবে কি? তা এই যখন অবস্থা, তুমি কি আর সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে? তুমি বলে দাও, ও মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। বড় বেশি চাহিদা। আমি তাহলে মেয়ের বাবাকে সে কথাই জানিয়ে আসি! আর তোমার যদি বাপু মত থাকে, তাও বল। সে খবরও পৌঁছে দিতে পারি।'

চুপ করে রইল ছেলেটি। মাথাটি তার ঝুঁকে রয়েছে, হাতদুটো কোলের ওপরে। বেশ চিন্তিত সে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারা। ছেলেটি কোনো কথা বলছে না দেখে পড়শী উঠে পড়ল। হঠাৎ ছেলেটি বলল, 'নাঃ যা হবার হবে। ঐ মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। বাবার শর্তে আমি রাজি। তুমি সেকথাই বল, একশ' গোরু আমি দেব, অমন মেয়ের বদলে সবই আমি দেব। মেয়ের বাবাকে খবর দাও, আমি গিয়ে একশ' গোরু দিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে আসব।'

পরের দিন ভোর হতেই পড়শী চলল দূর গাঁয়ের পথে। আজ সে আরও তাড়াতাড়ি চলছে। অন্য দিনের চেয়ে সে আগেই পৌঁছে গেল। মেয়ের বাবার বাড়িতে পৌঁছেই খবর দিল, 'হ্যাঁ, ছেলে রাজি হয়েছে। সে একশ' গোরুই পণ দেবে। যদিও তার আর কিছুই নেই তবু সে সব দেবে। ছেলে মত দিয়েছে।'

বাবা হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আমিও রাজি। সে আমার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারে।'

তারপরে পড়শী ও বাবা খাওয়া-দাওয়া সেরে খুঁটিনাটি সব আলোচনা করল। অনেক কথা হল। শেষকালে ঠিক হল, সেই গাঁয়ের একজন মাতব্বর ছেলেকে আনতে যাবে। সব কথা পাকা করে নিজের গাঁয়ে ফিরে এল পড়শী।

যে দিন ঠিক করা ছিল সে দিন মাতব্বরা ছেলেটির বাড়ি এল। খুব যত্নআত্তি করে ছেলেটি তাকে সেবা করল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর বিয়ে নিয়ে নানান কথা হল।

মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেল। কথামতো ছেলেটি মেয়ের বাবাকে তার সম্পদ একশ'টা গোরু দিয়ে দিল। মেয়েকে বিয়ে করবার পণ হিসেবে। বিয়েতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। পাড়া-পড়শী সবাই প্রাণ খুলে আনন্দ করল। সবাই খুশি।

ছেলেটি বৌকে নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে এল। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কিছু খাবার-দাবার এল। সেগুলো মেয়ের বাবাই দিল। চোখের জল মুছে মেয়ে নতুন সংসার পাতল।

এমনি করে দশদিন কাটল। বাবার পাঠানো খাবার-দাবারে বেশ আনন্দেই দিন কাটল। দুজনেই খুব খুশি।

দশদিন পরে ছেলেটি চমকে উঠল। সব খাবার শেষ। অন্য কোনো উপায় নেই। এখন সে-ই বা কি খাবে আর বৌকেই বা কি খেতে দেবে? পেটে দেবার কিছুই যে অবশিষ্ট নেই! এ কি হল?

ছেলেটি শুকনো মুখে বলল, 'বৌ, আমার তো আর কিছুই নেই। তুমি বাপের বাড়ি থেকে যা এনেছিলে সব ফুরিয়ে গেল। তোমার আমার পেট চলবে কেমন করে? সে একদিন ছিল যখন আমার বাড়িতে প্রচুর দুধ হত। অনেক গোরু। আমি দুধ দোহাতাম, অনেক দুধ। তার বিনিময়ে কত কিছুই পেতাম। কিন্তু সব গোরু তোমার বাবাকে দিতে হল। তোমাকে পাবার জন্য আমি সবই দিয়ে দিলাম। বৌ এখন কি করি?'

বৌ কোনো কথা বলল না। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। স্বামীর মুখের দিকেও তাকাল না। ছেলেটি কেমন যেন ভেঙে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি আবার বলল, 'বৌ, এক কাজ করি। তোমার হয়তো খারাপ লাগবে। কিন্তু উপায় কি বল? আমার গাঁয়ে অনেক পড়শীর গোরু মোষ আছে। আমি তাদের দুধ দোহাবার কাজ নি। তাতে দিন-মজুরি পাব। তাতেই পেট চালাতে হবে। অন্য উপায় তো দেখি না বৌ।'

বৌ আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তোমার বৌ, তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি তাই কর।'

ছেলেটি তো এখন আর ছোট নেই। সে পুরো যুবক হয়ে উঠেছে। অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। একদিন তার কত কি ছিল, আজ তার কিছু নেই। তার মনে খুব কষ্ট হল। বিয়ের পর দশদিন যেতে না যেতেই তাকে এমন অবস্থায় পড়তে হল। কিন্তু কি আর করে! পড়শীদের গোরু-মোষের দুধ দুইতে গেল। আর সেদিন থেকে এই গোরু দুইবার দিন-মজুরিই হল তার পেশা। প্রতিদিন এই কাজে সে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। ফিরত দুপুর বেলা, আকাশ যখন আগুন ছড়ায়।

এমনি করে কষ্টে দিন যায়। তারা দিন আনে দিন খায়। স্বামী যতক্ষণ না ফেরে বৌয়ের তেমন কোনো কাজ নেই। সে এলে তবেই রান্না শুরু হয়। খেতে খেতে প্রতিদিনই অনেক দেরি হয়ে যায়।

একদিন দুপুরবেলা। বৌ দোরের সামনে চুপচাপ বসে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে নানান কথা ভাবছে। ছেলেবেলার কথা, পুরনো দিনের কথা। এমন সময় সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। যুবক তাকিয়ে দেখে একটি মেয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। যুবকটি ভাবল, একে বিয়ে করতে পারলে খুব ভালো হয়। এমন সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মেয়েটি তো অন্যের বৌ, সে কি তাকে বিয়ে করবে? দেখাই যাক না।

সে একজন ঘটক ঠিক করল। মেয়েটিকে খুব সুখে রাখবে তাও জানাল। ঘটক একদিন এসে মেয়েটিকে যুবকটির মনের কথা জানাল।

বৌ বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা শুনলেন তুমি কি প্রস্তাব দিলে। তুমি যা বললে তা দেবতাও শুনেছেন, আমিও শুনলাম। কিন্তু যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তাকে যে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনও আমার মত নেই। আমার মত হলেই তোমাকে জানাব, তুমি যুবকটিকে তখন খবর দিও। আমি একটু চিন্তা করে নি। এক্ষুণি আমি কিছু বলতে পারব না।'

ঘটক আশা নিয়ে ফিরে গেল। বৌয়ের সব কথা যুবককে জানাল।

আরও তিন মাস কেটে গেল। একইভাবে দিন কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের বাড়িতে বৌয়ের বাবা এল। অনেকদিন মেয়ের কোনো খোঁজখবর পায় না। কেমন আছে মেয়ে-জামাই? এইসব ভেবেই বাবা জামাই-এর গাঁয়ে এল। গাঁয়ে পৌছে পড়শীদের জিজ্ঞেস করে মেয়ের বাড়ি পৌছল। মেয়ে তখন ভেতরে শুয়ে রয়েছে। কাজ নেই, স্বামী বাইরে। সে আর কি করে? তাই শুয়ে ছিল। দরজায় শব্দ হতেই মেয়ে বলল, 'কে'?

বাবা বলল, 'আরে খোল। আমি এসেছি, তোর বাবা।'

মেয়ের তো চোখে জল চলে এল। আনন্দে বুক কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠেই সে দরজা খুলে দিল। বাবা মেয়েকে কাছে টেনে নিল। তারপরে ঘরে গিয়ে শুধু গল্প আর গল্প। বাবা বলল, 'তা কেমন আছিস বল্।'

মেয়ে বলল, 'বাবা, খুব ভালো আছি। তোমার কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। খুব ভালো আছি। তুমি বিশ্রাম কর, আমি আসছি।'

মেয়ে অন্য ঘরে যেতে যেতে শুনতে পেল, বাবা বলছে, 'আরে, আমার খাবার জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

অন্য ঘরে গিয়ে মেয়ে ঝরঝর্ করে কেঁদে ফেলল। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কান্না চাপতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ কি হল? এতদিন পরে বাবা এসেছে মেয়েকে দেখতে, অথচ মেয়ের ঘরে একরত্তি খাবার নেই। সব শূন্য। বাবাকে সে কি খাওয়াবে? বাবার জন্য কি রাঁধবে? এখন কি করে সে মুখ দেখাবে? ভাবছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে সে পেছনের দরজায় এল। দরজা খুলে উদাস চোখে স্বামীর আসার পথে চেয়ে রইল। হঠাৎ সেই যুবকটিকে সে দেখতে পেল। বুকে বল পেল। বুদ্ধি এল মাথায়। সে যুবকটিকে ডাকল। যুবকটি কাছে এল।

বৌ বলল, 'এখানে একা একা কি করছ?'

যুবকটি বলল, 'বেশ কয়েক মাস আগে তোমার কাছে একজন ঘটক পাঠিয়েছিলাম। তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই। তা তখন তুমি রাজি হও নি। এখনও কি তোমার মত পালটায় নি? আমি যে দিনেরাতে তোমাকেই স্বপ্ন দেখছি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে না? আমার বাড়ি যাবে না?'

বৌ বলল, 'তুমি যা বললে বনের দেবতা, খানের দেবতা তা শুনলেন। আমি যা শুনলাম দেবতারাও তা শুনলেন। আমি আর তোমাকে অপদস্থ করব না। তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, আমি দেরি না করে এক্ষুণি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে। তার জন্য কিছুটা মাংস চাই। তাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। রান্না-খাওয়া হলেই আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব, তোমার বাড়ি যাব।' কথা বলে উত্তেজনায় বৌ হাঁপাচ্ছিল।

'অতিথিটি কে? কোথা থেকে এসেছে?' যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

বৌ বলল, 'আমার বাবা। দূর গাঁ থেকে আমার বাড়িতে এসেছে। সে-ই অতিথি।'

যুবকটি বলল, 'কোনো চিন্তা নেই তোমার। একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি মাংস নিয়ে আসছি।'

আনন্দে যুবক চলে গেল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল বৌ। আবার চোখ বেয়ে জল পড়ছে, বুক ফুলে ফুলে উঠছে। এমন সময় যুবক ফিরে এল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল বৌ। যুবক কাছে এল, তার হাতে পাতায় জড়ানো কিছুটা গোরুর মাংস। বৌয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মাংস বৌয়ের হাতে দিয়ে যুবক বলল, 'তুমি চেয়েছিলে, তাই এনে দিলাম। বেশিক্ষণ দেরি ক'র না। কতক্ষণ অপেক্ষা করব?'

বৌ বলল, 'বনের দেবতা, ধানের দেবতা তোমার কথা শুনলেন। আমিও শুনলাম। তোমায় আর বেশি দেরি করতে হবে না।'

যুবকের হাত থেকে মাংস নিয়ে বৌ উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে মাংস রান্না করতে বসে গেল বৌ।

যে তাকে মাংস দিয়েছিল সেই যুবক বৌয়ের বাড়ি থেকে বেশি দূরে গেল না। আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। সেও উত্তেজনায় কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। গাছতলায় বসে আবার উঠে পড়ে, আবার অন্য গাছের নিচে বসে। মেয়েটি আসবে তো? না শুধুই মুখের কথা!

মাটির হাঁড়িতে মাংস ফুটছে। পাশে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে বৌ। মনে নানা চিন্তা। এমন সময় দিন-মজুরির কাজ শেষ করে তার স্বামী ঘরে ফিরল। ঘরে ঢুকেই দেখে বৌয়ের বাবা বসে রয়েছে। তাকে দেখেই সে আঁৎকে উঠল, মুখে ছলাৎ করে রক্ত উঠে এল। এমন অবস্থা যে, কোনো কথা তার মুখে এল না। তাকে দেখে বৌয়ের বাবা খুব খুশি হল। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে ডাকল। কেমন আছে, সংসার কেমন চলছে—অনেক কিছু জানতে চাইল। কোনোরকমে মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েই সে চলে এল বৌয়ের কাছে। এসে দেখে বৌ কি যেন রান্না করছে।

বৌকে জিজ্ঞেস করল, 'বৌ, কি রাঁধছ?' বৌ বলল, 'মাংস।'

অবাক হল স্বামী। সে জিজ্ঞেস করল, 'মাংস? কোথায় পেলে বৌ?'

একটু চুপ করে থেকে বৌ বলল, 'পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি। পড়শীর বৌ দিয়েছে।'

একথা শুনে তার স্বামী একেবারে চুপ করে গেল। কোনো কথা বলল না। হায়! সে এত গরিব! আজ অন্যের কাছে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। হায়! এমন অবস্থা তার!

তারপরে আস্তে আস্তে স্বামী বলল, 'বৌ, আমরা এখন কি করব?

আমাদের দুজনেরই খাবার জোটে না, তার ওপরে একজন অতিথি। কি হবে?'

বৌ ধরা গলায় বলল, 'আমি কি বলব বল? কেমন করে চলবে তাই-বা বলি কেমন করে? আমি জানি না।'

স্বামী বলল, 'আমি যাদের যাদের বাড়ি কাজ করি মানে গোরু দোয়াই, তারা তো বেশ ধনী। তাদের কাছে গিয়ে বলি,—আমার বাড়িতে অতিথি এসেছে। তার জন্য আমায় যা-হোক কিছু দাও, তাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে তো! আমি বেশি খেটে সেগুলো শোধ দিয়ে দেব। নাহয় আরও বেশিক্ষণ খাটব। কি বল বৌ?'

বৌ কোনো কথা বলল না। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মালিকদের গিয়ে সব বলল। আসলে এই লোকটি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। তাই মালিকরা সবাই তাকে ভালোবাসে। তার দুর্দিনে তারা তাকে কিছু কিছু জিনিস সাহায্য করল। তাকে তারা মাংস দিল, দুধ দিল, জোয়ার বাজরা দিল। সে রওনা দিল বাড়ির পথে।

বৌয়ের মাংস রান্না শেষ হয়েছে। এমন সময় স্বামী ফিরে এল। বৌয়ের হাতে মাংস-দুধ জোয়ার-বাজরা দিল। বৌ সেগুলো রান্নাঘরের একপাশে গুছিয়ে রাখল। স্বামী হাতমুখ ধুতে উঠোনে গেল। হাঁড়ি থেকে মাংস ঢেলে বৌ সেটা বারকোশে রাখল। বাবাকে খেতে দেবে।

এদিকে যে মাংস দিয়েছিল সেই যুবক বাড়ির আশেপাশেই ঘুরছিল। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বৌ তো এল না? সে ব্যস্ত হল। সাতপাঁচ ভেবে সে বাড়ির খুব কাছে এল। সামনের দিকের দরজা খোলা দেখে সে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল। হয়তো বৌকে দেখা যাবে। দেখল, ভেতরে বসে একজন বুড়ো-মতন লোক ও বৌয়ের স্বামী পাশাপাশি গল্প-গুজব করছে। চোখাচোখি হতেই যুবক মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, বৌয়ের স্বামীও মাথা নোয়াল। স্বামী ছেলেটিকে চেনে না, কিন্তু অভিবাদন যখন করেছে তখন ভেতরে ডাকাই উচিত। তার ওপরে ভর-দুপুরে একজনকে কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা যায়? স্বামী তাকে হাত নেড়ে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি দাওয়া পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল আর স্বামীর পাশে বসল।

স্বামী তো আর অচেনা লোকটার মনের কথা কিছুই জানে না, তাই বন্ধুর মতো আলাপ করতে লাগল। সে তো জানে না, এই লোকটিই তার বৌকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেতে চায়। সব পাকা করে ফেলেছে। তারা

তিনজন আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা বলতে লাগল। বৌয়ের বাবা, বৌয়ের স্বামী আর এই অসাধু জানোয়ার—এই তিনজনে। এই জানোয়ার তাদের ঘরের শান্তি নষ্ট করতে চায়। তারা গরিব তবু শান্তিতে রয়েছে। তারা গরিব তাই শান্তি নষ্ট করা সহজ। সেই সুযোগই নিচ্ছে জানোয়ারটা। পাশাপাশি বসে তারা গল্প-গুজব করছে। কতই না বন্ধুত্ব! হায়!

বৌ বারকোশে মাংস নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখে তিনজন পাশাপাশি বসে গল্প-গুজব করছে। ছোট ছোট তিনটে বারকোশে মাংস ঢেলে সে এগিয়ে দিল তাদের দিকে। তিনজন যখন হাত বাড়িয়ে খাবার নিতে গেল, তখন বৌ বলল, 'এখন তিন বোকা মিলে খাওয়া শুরু কর।'

বাবা অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'আমি বোকা? বোকামির কি কাজ করলাম?'

মেয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা, আগে তোমরা খেয়ে নাও। পরে বলব তোমরা তিনজনেই কি বোকামি করেছ।'

বাবা রেগে গেল। বলল, 'আমি কিছুতেই খাব না। এক টুকরোও মুখে দেব না। আগে তোমায় বলতে হবে কেন তুমি আমায় বোকা বললে? তারপরে তোমার বাড়িতে আমি খাব। নইলে নয়।'

মেয়ে আর কি করে! তাকে বলতে হল। সে বলল, 'বাবা, তুমি এক মহামূল্য জিনিস খুব সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ। মানে, অতি সামান্য জিনিসের বদলে খুব দামী জিনিস বিক্রি করেছ।'

বাবা অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি? দামী জিনিস সস্তায় বিক্রি করেছি? মনে পড়ছে না তো! কোন্ জিনিস?'

মেয়ে মাথা নামিয়ে বলল, 'সে জিনিস আমি। তুমি আমাকে বড় সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ।'

বাবা আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কেমন করে?'

মেয়ে এবার সোজা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'বাবা আমি ছাড়া তোমার আর কোনো মেয়ে নেই। এমন কি আমার আর কোনো ভাইও নেই। আমি তোমার একমাত্র সন্তান। সেই তুমি একশ'টা গোরুর বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিলে। অথচ তোমার নিজেরই ছয় হাজার গোরু-মোষ রয়েছে। একশ'টা গোরু তোমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান হল,—আমার চেয়েও বেশি! তুমি বেশি দামী জিনিসের মূল্য বুঝলে না, তাকে এইভাবে

বিকিয়ে দিলে। তাই তোমাকে বলেছি, তুমি মহামূল্য জিনিস খুব সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ। ঠিক না?'

বাবা মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। অল্পক্ষণ পরে বলল, 'ঠিক কথা। আগে কোনোদিন ভাবিনি। তুমি ঠিক ধরেছ। এ আমি কি করেছি? সত্যি আমি বোকা।'

তারপরে বৌয়ের স্বামী ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কেন বোকা? আমি কিরকম বোকামি করেছি?'

বৌ বলল, 'তুমি আরও বেশি বোকা। বাবার চেয়েও বেশি।'

স্বামী বলল, 'কেমন করে?'

বৌ করুণভাবে হাসল। বলল, 'তোমার ছিল একশ'টা গোরু। এগুলো তুমি তোমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে পেয়েছিলে। তুমি জানতে, তোমার গোরুগুলোর কোনো বাচ্চা-কাচ্চা নেই, শুধুই একশ' গোরু। আমাকে বিয়ে করার লোভে তুমি জ্ঞান হারালে। আমার বিনিময়ে সব গোরু কনেপণ হিসেবে দিয়ে দিলে। তোমার তো আর কিছুই নেই। তোমার গাঁয়ে কত মেয়ে রয়েছে। তাদের কনেপণ ছিল দশটা কি বিশটা গোরু। তুমি তোমার অবস্থা বুঝলে না। তাদের বিয়ে করলে তোমার আরও অনেক গোরু থাকত। তবু তুমি আমাকেই বিয়ে করতে গেলে। বিয়ের পর তুমি কি খাবে, বৌকে কি খেতে দেবে—এসব মোটেই চিন্তা করলে না। বিয়ের দশদিন পরেই সব ফুরিয়ে গেল। আমাদের দুজনের খাওয়ার মতো কিছুই রইল না। তোমার অনেক ছিল, বুদ্ধির দোষে তুমি আজ দিনমজুর। অন্যের দয়ায়, অন্যের অপমান সহ্য করে তোমায় দিন চালাতে হয়! অথচ তোমার তো এমন হবার কথা নয়! অন্যদের গোরুর দুধ দুইয়ে তোমার পেট চালাতে হয়। অথচ তোমার অনেক গোরু ছিল। তুমি যদি অর্ধেক গোরু কনেপণ দিয়েও তোমার গাঁয়ের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে, তবে আরও অর্ধেক গোরু তোমার থাকত। খাওয়ার চিন্তা করতে হত না। তাই মনে করে দেখ, তুমি আরও বেশি বোকা কিনা।'

হতচ্ছাড়া জানোয়ার যুবকটি কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করল, 'খুব তো বড় বড় কথা হচ্ছে। তা, আমি বোকা কিসে? আমি তো কোনো বোকামি করিনি। এবার বল।'

বৌ বলল, 'বাবা আর স্বামীর চেয়ে তুমি আরও বেশি বোকা। তিনজনের মধ্যে তোমার বোকামি সবচেয়ে বেশি।'

যুবকটি বলল, 'কেমন করে?'

বৌ ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে উত্তর দিল, 'তুমি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। তুমি আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। কিসের বিনিময়ে? কিছুটা গোরুর মাংসের বিনিময়ে। হায় কপাল! তুমি আমাকে কিছুটা মাংসের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিলে! সেই আমি যাকে একশ'টা গোরুর বিনিময়ে কিনতে হয়েছে। তাই মনে করে দেখ, তুমি কি এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোকা নও?'

অসাধু জানোয়ার বসার চৌকি থেকে এক লাফে নেমেই দৌড় দিল। একবারও পেছনে তাকাল না। বনের পথে সে মিলিয়ে গেল।

বাবা মেয়ে-জামাই-এর সঙ্গে আরও দুদিন থাকল। তৃতীয় দিনে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। মেয়ে জলভরা চোখে বাবাকে বিদায় দিল। বাবার চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৌ। বাবাকে আর দেখা যাচ্ছে না। পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল বৌ। হায়! বনের দেবতা। হায়! থানের দেবতা।

বাবা গাঁয়ে ফিরে এসে জামাইয়ের একশ'টা গোরুকে এক জায়গায় আনল। নিজের গোরু-মোষ থেকে আরও দুশ'টা গোরু-মোষ তার সঙ্গে রাখল। একজন কিষাণকে সঙ্গে দিল। কিষাণ তিনশ' গোরু-মোষ নিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের গাঁয়ের দিকে রওনা দিল।

মেয়ে-জামাইয়ের আর কোনো অভাব রইল না। তারা সুখে শান্তিতে নিজেদের গাঁয়ে বাস করতে লাগল।

আকাশের সূর্য আকাশের চন্দ্র

ঠাকুমা, তাকিয়ে দেখ চাঁদ কত ওপরে উঠে গেল, তবু তুমি গল্প শুরু করলে না!

ঠাকুমা, সূর্য কখন দূর আকাশে মিলিয়ে গেল, তবু তুমি গল্প শুরু করলে না!

নাত্তিপুত্তিদের অভিযোগ শুনে ঠাকুমা বললেন, 'বেশ, শুরু করছি। চাঁদ-সূর্যের গল্পই বলছি। নাত্তিপুত্তি, তোরা কি ভাবছিস্ সূর্য চিরকাল ঐ দূর আকাশেই ছিল? চাঁদও ছিল আকাশে? তা কিন্তু নয়। ওরা চিরকাল ওখানে ছিল না।'

'সেই গল্পই বল তাহলে।' ডাগর চোখে চেয়ে রইল তারা। ঠাকুমা শুরু করলেন:

অনেক অনেক কাল আগে সূর্য আর জল ছিল দুই বন্ধু। দুজনের গলায় গলায় ভাব। দুজনেই তখন থাকত পাশাপাশি এই পৃথিবীতে। ওদের ভাব দেখে অন্য অনেকেই খুব হিংসে করত। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। ওদের দুজনের দেহেই যে ভীষণ শক্তি!

বন্ধু জলের বাড়িতে সূর্য প্রায়ই প্রত্যেকদিন বেড়াতে যেত। গল্পগুজব করত। দেখা হলেই দুজনে প্রাণ খুলে মনের কথা বলত। এমনিভাবে অনেক কাল কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন সূর্যের মনে হল,—আচ্ছা, আমি তো নিত্যনিত্যি বন্ধুর বাড়ি যাই। কিন্তু কই, বন্ধু তো একদিনও আমার বাড়ি এল না! আশ্চর্য! এ কথা তো আগে কোনোদিন মনে হয়নি! আজকে বন্ধুকে এ কথা বলতে হবে।

সূর্য সেদিনও বন্ধু জলের বাড়ি গেল। সে অভিযোগ জানাল,—বন্ধু কেন একদিনও তার বাড়িতে গেল না? এটা কি তার উচিত কাজ হয়েছে?

জল কিন্তু কিছুই ভাবল না। সে হাসতে হাসতে বলল,—'এতে মনে করার কি আছে। দুজনের দেখা হওয়াই আসল কথা, বন্ধুত্ব থাকাটাই আসল। দুজনে দুজনকে কত ভালোবাসি, কত সুখ-দুঃখের গল্প করি। তাই না?'

সূর্য কিন্তু মনমরা হয়েই রইল। সে অভিযোগ জানাল,—সবই ঠিক। তবু জল যদি তার বাড়িতে একবারও না যায় তাহলে কেমন ভালো লাগছে না।

অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করবার পর শেষকালে জল আস্তে আস্তে বলল, 'বন্ধু, তুমি কিছু মনে ক'র না। আমি সব খুলেই বলছি। আমার কি ইচ্ছে করে না যে আমি তোমার বাড়ি যাই! খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করব বল। আমিই যে আমার শত্রু। তুমি রাগ ক'র না বন্ধু। তোমার বাড়ি যে বড়ই ছোট। আমি যদি আমার লোকজন নিয়ে তোমার বাড়িতে যাই, তাহলে তুমি যে ভেসেই যাবে, তোমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে। বন্ধু, সেটা কি আমি চাইতে পারি?' জল চুপ করে মাথা নিচু করে সূর্যের দিকে চেয়ে রইল।

সূর্য তবু তাকে একই কথা বলতে লাগল। জল ভাবল, বন্ধুর মনে আর আঘাত দেব না। বেশ তার বাড়িতে সে যাবে।

জল তখন ছলছল শব্দ তুলে বলল, 'বন্ধু, তুমি কিচ্ছু চিন্তা ক'র না। আমি তোমার বাড়িতে যাব। কিন্তু তার আগে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?' বলেই ফেল।' সূর্য খুব খুশি হল। বন্ধুর তাহলে মত হয়েছে। বন্ধুকে সে যা ভেবেছিল তা ঠিক নয়।

জল বলল, 'আমি তোমার বাড়ি যাব। তার আগে তুমি একটা বিশাল উঠোন তৈরি কর, আর তার চারপাশে অনেক উঁচু করে বাঁধ দাও। মনে রাখবে উঠোনটা যেন বিশাল বিশাল আকারের হয়। আমার লোকজন কিন্তু অগুণতি। আর চারপাশের বাঁধও করবে খুব শক্ত করে। আমাদের অনেক অনেক জায়গা লাগে আর দেহের শক্তিও বড় কম নয়। কি, এখন খুশি তো?'

সূর্য মহাখুশি। সে রাজি হল জলের কথায়। হ্যাঁ, সূর্য তৈরি করবে বিশাল উঠোন, শক্তিশালী বাঁধ। সে গড়াতে গড়াতে আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে পৌঁছেই চাঁদকে সুসংবাদ দিল। চাঁদও খুশি। চাঁদ তো সূর্যের বৌ। সেও মনে মনে খুশি হল। তারপর দরজা বন্ধ করে দুজনে পরামর্শ করতে বসল। ঠিক হল, কাল থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। বন্ধুকে সে কথা দিয়ে এসেছে। তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই যাতে মুখ থাকে তা তো দুজনকেই দেখতে হবে। দুজনে একমত হল।

বেশ কিছুদিন সূর্য আর চাঁদ একেবারে সময় পাচ্ছে না। রাতদিন উঠোন আর বাঁধ তৈরির কাজ করছে। নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধ। বন্ধুর খাতিরে এসব তারা ভুলেই গিয়েছে। বন্ধু আসবে তাদের বাড়িতে এই আনন্দেই তারা আত্মহারা।

শেষকালে একদিন উঠোন তৈরি শেষ হল, বাঁধ তৈরি শেষ হল। দুজনে উঠোনের মাঝখানে বসল, চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, বন্ধুর উপযুক্ত জায়গাই হয়েছে বটে। অপূর্ব! নিজেরা বেশ খুশি হল। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হল সেদিন।

পরের দিন সূর্য চলল জলের বাড়ি। বেশ জোরে জোরে গড়াচ্ছে। মনে ফূর্তি। জলের বাড়ি পৌঁছতেই জলের মহা আনন্দ। বন্ধু অনেকদিন তার বাড়িতে আসেনি। সূর্যের মুখে শুনল,—কি করেই বা আসবে? তারা দুজনে মিলে যে উঠোন আর বাঁধ তৈরি করছিল। বন্ধুর যে নেমন্তন্ন! সব ঠিকঠাক তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার জল চলুক সূর্যের বাড়ি। জলও রাজি।

জল তবুও শেষবারের মতো জানতে চাইল, 'বন্ধু সূর্য, তুমি কিন্তু কিছু মনে ক'র না। তুমি খুব বড় উঠোন বানিয়েছ তো, আর খুব শক্তিশালী বাঁধ। বুঝতেই পারছ আমার লোকজন অনেক।'

সূর্য তো নিশ্চিন্ত হয়েই আছে। তাই এবারে জলের কথায় সে মোটেই রাগ করল না। বরং খুশি হয়ে বলল, 'সব ঠিকঠাক আছে। তোমার কোনো ভাবনা নেই। এবার চল।'

সামনে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল সূর্য। পেছনে চলেছে জল,—আর তার পেছনে আশেপাশে চলেছে নানা জাতের মাছ, কুমির, তিমি, হাঙর, আরও কত জলচর প্রাণী। এগোতে এগোতে তারা এসে পৌঁছল উঠোনের কাছে। নাঃ উঠোন বেশ বড়ই, বাঁধ বেশ মজবুত।

জল ঢুকে পড়ল উঠোনের মধ্যে। জলে কিলবিল করছে অগুণতি মাছ। দেখতে দেখতে জল হাঁটু পর্যন্ত উঠল। এখন জলে অল্প অল্প ঢেউ।

জল বলল, 'বন্ধু, তোমার বাঁধ বেশ নিরাপদ তো! আসব, না এবার ফিরে যাব?'

সূর্য মাথা নেড়ে জানাল, 'কোনো ভাবনার কারণ নেই। বড়, খুব মজবুত।'

আরও জল ঢুকল। জলের আরও প্রাণী ঢুকল। জল ঢুকছে। দেখতে দেখতে জল এক মানুষ সমান হল। এবার জলে আরও ঢেউ, মাছের হুটোপুটি আরও বেশি।

জল চিন্তিত হল। জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু, তুমি কি চাও আমার আরও লোকজন তোমার বাড়িতে ঢুকুক? অনেক বাকি।'

সূর্য আর তার বৌ একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। কেন ঢুকবে না? তোমরা যে বন্ধু, তোমরা যে অতিথি!'

এবার প্রবল গতিতে জল ঢুকতে শুরু করল, তিরতিরিয়ে ঢুকে পড়ল অসংখ্য নাম-না-জানা মাছ, আগে না-দেখা অসংখ্য জলের প্রাণী। এবার ঢেউ উত্তাল হল, শব্দ প্রবল হল।

এই অবস্থা দেখে সূর্য ও চাঁদ বাঁধের ওপরে উঠে বসল। নিচে দাঁড়ানো অসম্ভব, জল থৈ থৈ করছে। জল সব বুঝতে পারল। সে ভাবল,—আর নয়। এবার বন্ধু বিপদে পড়বে। কিন্তু সে তো বন্ধুকে বিপদে ফেলতে চায় না।

তাই জল বলল, 'বন্ধু, তোমার বাড়িতে তো এলাম। এবার যাই। কি বল? আমার আরও লোকজন আছে, তা থাক। কিন্তু এবার বোধহয় ফেরা উচিত।'

সূর্য ব্যথা পেল। বলল, 'সে কি? বন্ধু তোমার আর লোকজন বাইরে থাকবে! সে কি হয়? না, না। তোমায় আসতেই হবে।'

কি আর করে জল। ঢুকছে, সঙ্গে তার লোকজন। দেখতে দেখতে জল বাঁধের মাথায় পৌঁছল। মাথা ছাড়িয়ে উপ্‌চে পড়ল চারিদিকে। এখন আর বাঁধকে দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকেই জল, আর জল। আসছে, জল বাড়ছে, জলের প্রাণীরা আসছেই আসছেই, জল আরও বাড়ছে,—ছড়িয়ে পড়ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক।

সূর্য আর কি করে! চাঁদ আর কি করে! কোথাও যে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। এ কি হল? সব জায়গায় জল থৈ থৈ করছে। শেষকালে, সূর্য চাঁদ আকাশে উঠে গেল। সেখানেই তারা রইল। আর কোনোদিন পৃথিবীতে নেমে এল না। তবু পৃথিবীকে ভুলতে পারে না। কতদিন ছিল এই পৃথিবীতে! তাই আজও বারবার প্রতিদিন প্রতিরাত তারা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। দিনে ঘোরে সূর্য, রাতে ঘোরে চন্দ্র।

যাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে

সবুজ ঘন বনভূমি আর গান-গাওয়া নদীর পাশে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের রাজার ছিল একটি মাত্র মেয়ে। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার আলো-করা রূপে মানুষ পশুপাখি সবাই অবাক হয়ে যেত। এমন রূপ তারা আগে কোনোদিন দেখেনি।

মেয়ে কিশোরী হল। একদিন তার বিয়ে হল। বিয়ে হল ভিন্ গাঁয়ে। তার ছিল একটা যাদু আয়না। এই আয়না কথা বলতে পারত। ঠিক মানুষের মতো। যখনই সে সাজগোজ করত, শুধু এই আয়নাতেই মুখ দেখত। আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় কিংবা নাচের আসরে যাওয়ার আগে এ আয়না না হলে তো তার সাজগোজই হত না। বড় প্রিয় আয়না।

একটা ঘরে সে এই আয়নাকে রেখে দিত। কাউকে ঢুকতে দিত না সেই ঘরে। এমন কি আপনজনদেরও না। সেই ঘরে একা একা সে আয়নাকে জিজ্ঞেস করত, "ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বলতো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কিনা!" আয়না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত, "কেউ না কেউ না। কেউ নেই, কেউ নেই।"

যখনই সে সাজগোজ করত, তখনই একই প্রশ্ন করত। একই উত্তর পেত। রোজ রোজ একই প্রশ্ন, একই উত্তর। শুনে শুনে তার বিশ্বাস হল, —তার মতো সুন্দরী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। নিজের রূপের গর্বে সে হয়ে উঠল ভীষণ হিংসুটে। দেমাকে যেন মাটিতে তার পা পড়ে না। আর হবেই বা না কেন? আয়না যে সে কথাই বলে। আর এ আয়না যে যাদু আয়না!

দিন কাটে। অনেক দিন কেটে গেল। এমন সময় সেই সুন্দরী মেয়ে একদিন মা হল। তার একটা ফুট্‌ফুটে মেয়ে হল। কচি শিশুর রূপ দেখে মা চমকে উঠল। মেয়ের এ কি রূপ? এ যে তার থেকেও রূপসী! আরও সুন্দরী! মায়ের মাথাটা কেমন টল্‌মল করছে।

শিশু মেয়ে বড় হচ্ছে। পুকুরের ফুল যত ফোটে, দেখতে হয় তত সুন্দর! এ মেয়ে যত বড় হচ্ছে রূপও যেন ফেটে পড়ল। এ কি রূপের বাহার! মা বুঝল, রূপে এ মেয়ে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার ওপরে মেয়ের মিষ্টি কথা। দুয়ে মিলে অপরূপ। কিন্তু মেয়ে তার রূপ জানে না, তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, গর্বও নেই। তাকে তাই আরও মিষ্টি লাগে।

মেয়ের বয়স হল বারো বছর। মা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি তার মেয়ে জেনে ফেলে সে কত সুন্দরী! মেয়ে যদি জেনে ফেলে?

একদিন মেয়েকে ডেকে মা বলল, "ঐ ঘরে তুমি কখনও ঢুকবে না। কেউ ঢোকে না। তুমিও ঢুকবে না। মনে রাখবে আমার কথাটা।" মেয়ে মাথা নাড়ল।

এমনি করে আবার দিন বয়ে যায়। মা রোজ রোজ একই প্রশ্ন করে, যাদু আয়না একই উত্তর দেয়। উত্তর শুনে শান্তি পায় মা।

একদিন মেয়ের খুব কৌতূহল হল। তাকে সবাই ভালোবাসে, সে সব ঘরে যায়, ঘোরে। শুধু ঐ ঘর বাদে। কেন? ও ঘরে কি আছে? সে গেলে কি হবে? সে কেন যেতে পারবে না? সে তো কোনো খারাপ কাজ করে না কখনও। তবে? এ নিষেধ তার ভালো লাগে না। কৌতূহল বাড়ে।

মা গিয়েছে নাচের আসরে। বাড়িতে সে একা। সে চাবির গোছা নিয়ে সেই ঘরের কাছে গেল। খুলে ফেলল দরজা। ঘরে ঢুকেই তার খুব আনন্দ হল। কেন এতদিন বাধা দিয়েছে তাকে? কিন্তু ঘরে বিশেষ কিছুই সে দেখতে পেল না। এমন কিছু নেই যাতে নিষেধ মানতে হবে। সে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল।

পরের দিন। মা বেড়াতে গিয়েছে। মেয়ে মনে মনে ভাবল, "আচ্ছা, ঐ ঘরে যদি কিছু না-ই থাকবে তাহলে মা কেন নিষেধ করল? কেন আমায় ঘরে ঢুকতে বারণ করল? নিশ্চয়ই কিছু আছে।" এই ভেবে সে আবার ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল, একপাশে সুন্দর একটা কাঠের ঝুড়ি রয়েছে। ঝুড়িতে কি সুন্দর লতাপাতা নকশা করা। ঢাকনা খুলেই সে একটা আয়না দেখতে পেল। হাতে তুলে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে সে আয়না দেখছে। হঠাৎ আয়না মানুষের মতো কথা বলে উঠল। বলল, "ও মেয়ে! তোমার মতো সুন্দরী তো এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই।" মেয়ে তাড়াতাড়ি আয়নাকে ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিল। দরজা ঠিক-মতো বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন মা আয়না হাতে সাজগোজ করতে বসেছে। অন্য দিনের মতো মা জিজ্ঞেস করল, "ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বলতো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কিনা।" যাদু আয়না উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তোমার চেয়েও একজন সুন্দরী আছে। সে অনেক বেশি রূপসী।"

ঝড়ের বেগে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যথা মনে, মুখ শুকনো। সন্দেহ হল, এ ঠিক মেয়ের কাজ। ঐ সুন্দরী নিশ্চয়ই তার মেয়ে। রাগে কপাল দপ্‌দপ্‌ করছে। মেয়ের কাছে গিয়েই ফেটে পড়ল মা, "তুই ঐ ঘরে ঢুকেছিলি ?

মেয়ের তো বুক কাঁপছে। বলল, "কই না তো! আমি কখন ঢুকলাম ?"

মা বলল, "মিথ্যে কথা। তুই ঢুকেছিলি। হ্যাঁ তুই। যাদু আয়না নইলে বলল কি করে আমার চেয়েও সুন্দরী আর একজন আছে! আর তুই-ই শুধু আমার চেয়ে সুন্দরী। আর কেউ নেই। তুই ঢুকিস্‌নি ঘরে ?"

মা শুধু যে মেয়েকে ঐ ঘরেই ঢুকতে দেয়নি তা নয়, এত বয়স পর্যন্ত কোনোদিন তাকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দেয়নি। বাইরের কোনো লোক মেয়েকে চেনে না, জানে না, দেখেওনি। কেউ যদি মেয়েকে দেখে বলে, মায়ের চেয়েও সুন্দরী! তাহলে! মা রাগে-দুঃখে দিশেহারা হয়ে গেল।

রাতে স্বামীর কয়েকজন বিশ্বাসী সৈন্যকে ডেকে পাঠাল মা। তাদের কাছে মেয়ে দিয়ে মা বলল, "এই হতভাগীকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। কেউ যেন না জানে।"

সৈন্যরা আর কি করবে। তারা মেয়েকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এল। সঙ্গে দুটো কুকুর। আঁধার রাত। কষ্টে তারা পথ চলতে লাগল। শেষ-কালে পৌঁছল গভীর জঙ্গলে। মেয়ে একটি কথাও বলছে না। সৈন্যরা বলল, "কেউ না জানলেও আমরা প্রাসাদ প্রহরীরা জানি তুমি কার মেয়ে। তোমার মা বড় নির্দয়, সে তোমাকে মেরে ফেলতে বলেছে। সে কাজ আমরা কেমন করে করি? তুমি এত ভালো মেয়ে, তুমি এত রূপসী, তোমার কথা এত সুন্দর। আমরা তোমাকে মারতে পারি না। তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াও। বনের দেবতা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ভালো থেকো।"

সৈন্যদের চোখের পাতা ভিজে এল। মেয়ে বনের পথে হাঁটতে লাগল। বন থেকে বেরুবার আগে সৈন্যরা সঙ্গের কুকুর দুটোকে মেরে ফেলল। তাদের তরবারিতে টাটকা রক্ত লেগে রইল। তারা ফিরে এল প্রাসাদে। মাকে বলল, "আমরা হতভাগী মেয়েটাকে মেরে ফেলেছি। তার দেহের রক্ত লেগে রয়েছে আমাদের অস্ত্রে"। মা বেজায় খুশি। লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলতে লাগল।

মেয়ে গভীর বনের কিছুই চেনে না। আপন মনে এদিক-ওদিক ঘুরতে

লাগল। বড় একা লাগছে, ভয়ও করছে। গা ছমছম্ করছে। এমন সময় সে একটা সুন্দর ছোট বাড়ি দেখতে পেল। একটাই বাড়ি, আশেপাশে আর নেই। সে দরজার সামনে গেল, দরজায় তালা নেই, ভেজানো রয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল, কাউকে দেখতে পেল না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ঘরটা বড় অগোছালো রয়েছে। কি আর করে। সে ঘর গোছাতে লাগল, সব জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। তার পরে সে একটা খাটের নিচে চুপটি করে লুকিয়ে থাকল।

মেয়ে তো জানত না এই বাড়ি আসলে একদল ডাকাতের। ডাকাতরা দিনের বেলায় নানা দূর দূর জায়গায় ডাকাতি করতে যেত, আর সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসত এই ডেরায়। সেদিনও লুটের মালপত্র নিয়ে ডাকাতরা ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই সবাই অবাক হয়ে গেল। একি ? সবকিছু এমন সাজানো-গোছানো কেমন করে হল ? এরকম তো থাকে না ? তারা অবাক হয়ে বলল, "কে ঢুকেছিল আমাদের ঘরে ? কে-ই বা এমন করে সব গুছিয়ে রাখল ?"

বড় ক্লান্ত তারা। রান্নাবান্না করে খেয়ে-দেয়ে তারা শুতে গেল। আর ঘুমিয়ে পড়ল। যেখানে তারা খেয়েছিল সে জায়গা তেমনই রইল, পরিষ্কার করল না। সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়ল ডাকাতি করতে। এইতো তাদের নিত্য দিনের কাজ !

ডাকাতের দল চলে যেতেই মেয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ে তার বুক দুরদুর করছে, খিদেতে মাথা ঘুরছে। নিচের ঘরে এসে সে রান্না-বান্না করল আর মনের সুখে খাওয়া-দাওয়া করল। আগের দিনের মতোই ঘর গুছিয়ে রাখল। এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে রাখল, খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করল। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। সে রাতের জন্য অনেক কিছু রান্না করে সাজিয়ে রাখল। ডাকাতরা এসে খাবে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা ভালোভাবে দেখে নিয়ে আঁধার হতেই সে আবার লুকিয়ে পড়ল।

ডাকাতরা ফিরে এল। তাদের আজ খুব আনন্দ। অনেক জিনিস আজ তারা পেয়েছে। ঘরে ঢুকেই তারা অবাক হয়ে গেল। আগের দিনের মতোই সব গোছানো! শুধু কি তাই ? তাদের জন্য রান্না-করা খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর কি পরিপাটি করে। তারা বলল, "কে এমন করে সবকিছু গুছিয়ে রাখছে ?"

বেশি কথা বলার সময় নেই। ক্লান্তি আর খিদে। তারা খেতে বসে

গেল। এই ডেরায় আসার পরে কেউ কোনোদিন তাদের জন্য এমন করে খাবার তৈরি করে রাখেনি।

খাওয়া শেষ হলে তাঁরা খোজাখুঁজি করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই সবকিছু আরও বেশি করে অগোছালো করে রাখল। দেখাই যাক না কি হয়।

তারা চলে যেতেই মেয়ে আবার বেরিয়ে এল লুকোনো জায়গা থেকে। হায় কপাল! ডাকাতগুলো যে কি অগোছালো মানুষ! আহা! ওদের কেউ নেই যে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে। মেয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখল। ভালো ভালো রান্না করল। নিজে খেল। ওদের জন্য গুছিয়ে রাখল। সকালবেলার সে ঘরবাড়ি এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। ঘন উঁচু গাছের ওপারে সূর্য ডুবে যেতেই মেয়ে আবার লুকিয়ে পড়ল। বড় ভয় করে যে।

আঁধার হতেই ফিরে এল ডাকাতরা। নাঃ, সেই একই রকম সাজানো-গোছানো, তাদের জন্য রান্না করা। অবাক কাণ্ড। তারা বলল, "রোজরোজ কে এমন করছে? এত গুছিয়ে রাখছে কে? যদি সে মেয়ে হয়, তাহলে সে হবে আমাদের বোনের মতো। বোন ভাইদের সবকিছু দেখাশোনা করবে, বাড়ি আগলাবে। আমরা প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসব। তার গায়ে আঁচড় পড়তে দেব না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইবে না,—সে যে আমাদের আদরের বোন। আর যদি সে ছেলে হয় তবে তাকেও আমাদের ডাকাতদলে ঢুকে পড়তে হবে, ছাড়াছাড়ি নেই। সেও হবে ডাকাত।"

পরের দিন খুব ভোরবেলা ডাকাতরা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আজ তারা ভুল করল না। তাদের মধ্যে একজনকে রেখে গেল। সে বাড়ির পাশে এক ঝোপে লুকিয়ে রইল। আজ ধরতেই হবে, রোজ রোজ কে তাদের ঘরদোর এমন গুছিয়ে রাখে। যে তাদের এমন উপকার করছে তাকে দেখা দরকার, তাকে জানা দরকার।

মেয়ে তো আর জানে না তাকে ধরবার জন্য কেউ লুকিয়ে রয়েছে। তাই সে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে কাজকর্ম করতে শুরু করল। সবকিছু গুছিয়ে রেখে রান্না চাপিয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়াল। কেউ তো নেই! তাকে তো কেউ দেখছে না। বাড়ি তো ফাঁকা। মেয়েকে দেখতে পেয়েই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সেই লুকিয়ে-থাকা ডাকাত। ডাকাতকে দেখতে পেয়েই ভয়ে দৌড় দিল সেই মেয়ে। তাকে ছুটতে দেখে ডাকাত চিৎকার করে বলল, "ভয় পাচ্ছ কেন? কোথায় যাচ্ছ তুমি? ভয় পাওয়ার কি আছে? তুমি তো কোনো

খারাপ কাজ করনি। বরং আমাদের কতই না উপকার করেছ। তুমি যে কি ভালো মেয়ে। পালিয়ে যেও না, কাছে এসো।” দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ে বলল, “ভীষণ ভয় করছে। তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে ?”

ডাকাত বলল, “সে কি ? ও কথা মুখেও এনো না। তুমি যে আমাদের বোন। কি সুন্দর তোমাকে দেখতে। তেমনি তুমি ভালো। কিন্তু, তুমি এই গভীর বনে এলে কেমন করে ? তুমি কে কাদের মেয়ে ?”

মেয়ে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে ডাকাতের কাছে এল। বলল, “ঘরের অনেক কাজ বাকি। তোমাদের জন্য রান্নাবান্নাও হয়নি। আগে সব শেষ করি, পরে সব বলব।”

ডাকাত অবাক হল। এমন বোন হয় ? তাদের ভাগ্য। মেয়ে সব কাজ শেষ করল। রান্না করে দুজনে খেল। অন্যদের জন্য গুছিয়ে রাখল। তারপরে বসল গল্প করতে। সব কথা তাকে খুলে বলল। মায়ের কথা, সৈন্যদের কথা, এখানে আসার কথা, লুকিয়ে থাকার কথা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। বাইরের উঠোনে দুজন গল্প করছে। এমন সময় ডাকাতরা ফিরে এল। আজ তারা বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়িতে কি হল জানার জন্য সবাই ব্যস্ত। দেখে, দুজনে বসে আপনমনে গল্প করছে।

কাছে এসে তারা বলল, “তাহলে খুঁজে পেয়েছ ?”

ডাকাতটি মাথা নেড়ে শুধু বলল, “হ্যাঁ।”

ডাকাতরা বলল, “আঃ কি সুন্দর মেয়ে। আমাদের আদরের বোন। কোনো ভয় নেই তোমার। আমরা প্রাণ দিয়ে তোমাকে আগলে রাখব। আজ থেকে তুমি আমাদের বোন হলে। আদরের বোন।”

ঘরে এসে তারা বোনকে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। সব জিনিসের ভার দিল তার ওপরে। সব কিছু সেই দেখাশোনা করবে। এমন বিশ্বাসী আর কে আছে ? তাদের বোন যে এই মেয়ে। তারা ডাকাতি করে সব এনে দেয় বোনকে। বোন তাদের দেখাশোনা করে। এমনি করে সুখে দিন কেটে যেতে লাগল।

প্রাসাদে মা দিন কাটায়। বেশ আনন্দে-ফূর্তিতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার কেন যেন সন্দেহ হল, মনটা কেমন করে উঠল। যদি মেয়ে বেঁচে থাকে ? সৈন্যরা কি সত্যিই তাকে মেরে ফেলেছে ? যদি না মেরে থাকে ? তবে ? তার কথা হয়তো সৈন্যরা রাখেনি। তাহলে ? মেয়ে তবে বেঁচে আছে ?

সন্দেহ হল কেন ? মন এমন করছে কেন ? তাহলে নিশ্চয়ই মেয়ে মরেনি, ঠিক বেঁচে আছে। কি করবে মা তা ভেবে নিল।

মায়ের এক দাসী ছিল। সে খুব বিশ্বাসী। সেই ছেলেবেলা থেকে তার কাছে আছে। এখন সে বুড়ি। কিন্তু তাকে না হলে মায়ের চলে না। নিজের ঘরে ডেকে এনে মা সেদিন তাকে সব খুলে বলল। সন্দেহের কথা জানাল। এখন কি করতে হবে তাও মা বলে দিল।

মা চুপচুপ করে বলল, "বুড়িমা, তুমি এক কাজ কর। তুমিই পারবে। নানা গাঁয়ে তুমি খোঁজ কর। যেখানে সবচেয়ে সুন্দরী কোনো মেয়েকে তুমি দেখবে, বুঝবে সেই আমার মেয়ে। তারপরে যেমন করে হোক তাকে তুমি মেরে ফেলবে। আমার জন্য এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।"

বুড়ি বলল, "ওমা, তুমি বলছ আর এ কাজ আমি করব না ? দেখনা, আমি ফিরে এলাম বলে।" এই কথা বলে বুড়ি রওনা দিল।

ঘুরতে ঘুরতে বুড়ি এল ডাকাতদের বাড়িতে। কাউকে সে দেখতে পেল না। ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ঘরের কাজ করছে। দেখেই বুঝতে পারল,—এ মেয়ে কে। এই মেয়েকেই তো সে খুঁজছে। যাক, তাহলে সব কাজই ঠিকঠাক করা যাবে। বুড়িকে দেখেই মেয়ের খুব আনন্দ হল। তাকে আদর করে বসতে দিল। খেতে দিল।

বুড়ি তখন বলল, "মেয়ে, কি সুন্দরী তুমি। এমন রূপ আগে দেখিনি। তা তুমি কে ? তোমার বাড়ি কোথায় ? তোমার মায়ের নাম কি ?" মেয়ে কিছুই সন্দেহ করল না। সব খুলে বলল। বুড়ি ঠোঁটের ফাঁকে হাসতে লাগল।

বুড়ি বলল, "আহা, তোমাকে দেখাশোনার কেউ নেই। এমন রূপ, অথচ চুলগুলো কি এলোমেলো ! দাও, ভালোভাবে চুল বেঁধে দি। কাছে এসো।" মেয়ে রাজি হল। কেউ তো কোনোদিন এমন করে আদর করেনি। পেছন ফিরে সে বুড়ির সামনে বসে পড়ল। বুড়ি আদর করে তার চুল আঁচড়িয়ে বেঁধে দিতে লাগল। বুড়ি তার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল একটা লম্বা ধারাল কাঁটা। চুল বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, বুড়ি হঠাৎ মেয়ের ঘন চুলের মধ্যে কাঁটাটি ঢুকিয়ে দিল। ধারাল কাঁটা মাথায় ঢুকে গেল। ঢলে পড়ল মেয়ে। নিথর হয়ে গেল তার দেহ। মনে হল সে সত্যি মরে গিয়েছে। নিস্তেজ দেহটির দিকে তাকিয়ে বুড়ি হাসতে হাসতে বলল, "যাক, ঠিকঠাক কাজ হয়েছে। কথা রেখেছি।" দেহ সেখানেই পড়ে রইল, বুড়ি রওনা দিল বনের পথে। বুড়ির কাছে সব কথা শুনে মা নিশ্চিন্ত হল। বুড়িমা তো আর তাকে ঠকাবে না ! যাক্, আপদ বিদায় হল।

ডাকাতরা ফিরে এসে দেখে তাদের আদরের বোন কাটা গাছের মতো মরে পড়ে রয়েছে। তাদের চোখ ছলছল্ করে উঠল। এ কি হল? কেন এমন হল? তারা খুব যত্নে দেহটি পরীক্ষা করল, কোনো আঘাতের চিহ্নই দেখতে পেল না। বোন মরে গিয়েছে, কিন্তু দেহ তো এখনও শক্ত কাঠ হয়ে যায়নি! কেমন যেন নিস্তেজ ভাব। বোনের কপালে আর গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখটা ফুলের মতো তাজা আর সুন্দর। তারা বলল, "আমরা এমন সুন্দর মুখের বোনকে মাটিতে পুঁততে পারব না। কিছুতেই না।" তাই তারা সকলে মিলে একটা সুন্দর শবাধার তৈরি করল। শবাধারের ওপরে সোনা-হীরে-মুক্তো দিয়ে সাজাল আর তাদের যত সোনার গয়না ছিল সব পরিয়ে দিল আদরের বোনের দেহে। শবাধারের ঢাকনা কাঁটা দিয়ে আটকাল না, আল-গোছে ঢাকনা বন্ধ করল। আর হাওয়া-বাতাস ঢোকবার জন্য কয়েকটা ফুটো রাখল। বোনের দেহ যাতে পচে না যায় তাই শবাধার বাইরে আলো-হাওয়ায় রেখে দিল। বুনো জন্তুরা যাতে বোনকে স্পর্শ করতে না পারে তাই বুনো লতার সঙ্গে বেঁধে তাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। লতাটা ডালের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আর একটা মোটা শক্ত খুঁটিতে বেঁধে রাখল। লতাটা ঢিল করলেই শবাধার নেমে আসবে। সব কাজ শেষ করে তারা চুপ করে গাছের নিচে বসে রইল। গাল-বুক ভিজে যাচ্ছে, আজ তাদের বোন আর বেঁচে নেই। দিন দশেক তারা বাড়িতেই রইল, কাজে গেল না।

তারপরে কাজে যেতে হল। প্রতিদিন যাওয়ার সময় ও বাড়ি ফিরবার পরে তারা শবাধারটাকে নামাত আর বোনকে দেখত। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো সতেজ রয়েছে তাদের বোনের মুখ। জীবন্ত মুখ! ঘুমিয়ে রয়েছে আদরের বোন। এমনি করে দিন কাটে।

এখন হয়েছে কি, একদিন ডাকাতরা সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। এমন সময় সেখানে এল একজন লোক। সে গ্রামীণ কথক। নানা জায়গায় সে গল্প শুনিয়ে বেড়ায়। তার ঝুলিতে অনেক অনেক গল্প। তার নাম এসেরেন্‌গিলা। আর তার মনিবের নাম ওগুলা। ডাকাতদের ডেরায় এসে কথক কাউকে দেখতে পেল না। এধার-ওধার তাকাতেই তার চোখে পড়ল সোনালি শবাধারটি। এমন সুন্দর আধার সে আগে দেখেনি! কত জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায়! এসেরেন্‌গিলা ছুটে গেল মনিবের কাছে। বলল, "এক্ষুণি চলো আমার সঙ্গে। এমন জিনিস আগে দেখিনি। কেউ নেই সেখানে। ওটাকে নিয়ে আসতেই হবে।" কথক উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। ওগুলাও অবাক হল।

দুজনে সেখানে গেল। লতা ঢিল করে কথক শবাধারাটি নামাল। কেউ নেই, তবু এসে পড়ে যদি। তাড়াতাড়ি করে দুজনে মাথায় তুলে শবাধার নিয়ে চলল। তারা জানেও না, ভেতরে কি রয়েছে। শেষকালে ওগুলার বাড়ি পৌঁছে গেল। একটা ছোট ঘরে শবাধারাটিকে রেখে দিল।

কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন ওগুলা ভাবল, আজ দেখব ওর মধ্যে কি আছে। ঢাকনা তো কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল না, আলগা করে বন্ধ ছিল। ঢাকনা খুলতেই ওগুলা অবাক হয়ে গেল। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে সে বেঁচে নেই। কিন্তু মৃতদেহের গা থেকে যেরকম গন্ধ বের হয় তা তো হচ্ছে না? মানুষ মারা গেলে যেরকম দেখতে হয়, সেরকমও তো মনে হচ্ছে না। কোনো রোগে মারা গিয়েছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। তবে? সে ভালোভাবে মেয়ের দেহ পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু আপনমনে বলল, "এমন ফুটফুটে মেয়ে। কিসে তার মৃত্যু হল? আশ্চর্য!"

ওগুলা ঢাকনা বন্ধ করল। ভালোভাবে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু থাকতে পারল না। আবার ঘরে ঢুকল। আবার ঢাকনা খুলে দেখল। মনে মনে বলল, "বোধহয় এ মরেনি। আহা! যদি বেঁচে থাকে। আমার মেয়েরও তো এইরকমই বয়েস। আহা! বেঁচে থাকলে দুজনে কেমন ভাব হত, একসঙ্গে খেলত।" দরজা বন্ধ করে আবার সে বাইরে এল। নিজের মেয়েকে বলল, "ও ঘরে যেও না কিন্তু। কক্ষনো যেও না।" মেয়ে বলল, "আচ্ছা।" প্রতিদিন বহুবার করে ওগুলা ঘরে যায়, ঢাকনা খোলে, মৃত মেয়েকে দেখে।

অনেক দিন কেটে গেল। ওগুলার মেয়ের কেমন কৌতূহল হয়। তাকে ঢুকতে দেয় না, অথচ, বাবা বারবার ঘরে ঢোকে। তারও ইচ্ছে হয়, দেখি না কি আছে ও ঘরে। একদিন ওগুলা বাইরে গিয়েছে। মেয়ে বলল, "খালি খালি বারণ করা। কেন ও ঘরে ঢুকব না? ঢুকলে কি হয়? আজ দেখব ও ঘরে কি আছে।" ঘরে ঢুকেই ওগুলার মেয়ে অবাক হয়ে গেল, কি সুন্দর একটা কাঠের আধার। দেখি না ভেতরে কি আছে? কি হয় দেখলে?

ওগুলার মেয়ে আস্তে আস্তে ঢাকনা তুলে ধরল। একটি মেয়ের মাথা দেখা যাচ্ছে, মাথায় ভর্তি কালো চুল আর সোনার গয়না। পুরো ঢাকনাটি খুলে ফেলল। একটি সুন্দর মেয়ে শুয়ে রয়েছে। তারই বয়সী। কি সুন্দর মেয়ে। এত গয়না গায়ে। কি সুন্দর মুখ আর মাথার চুল। সে বুঝতে পারল না,

মেয়েটি কেন এর মধ্যে এভাবে ঘুমিয়ে আছে। আপন মনে বলল, "আহা! ও যদি কথা বলত। কেমন বন্ধু হতাম আমরা। কত গল্প করতাম। ও যদি কথা বলত।" মুখের কাছে মুখ এনে সে ডাকল, "এম্‌বোলো! এম্‌বোলো!" যেমন করে অপরিচিত কাউকে তারা ডাকে। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ডাকল। জলভরা চোখে বলল, "এমন করে ডাকছি, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? এম্‌বোলো। এম্‌বোলো।" ঢাকনা বন্ধ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওগুলা ফিরে এল। এমন করে দরজা বন্ধ কেন? মেয়েকে বলল, "তুমি কি ঐ ঘরে ঢুকেছিলে?" মেয়ে বলল, "না তো। তুমি তো আমায় ঢুকতে দাও না? আমি তো যাই নি।"

পরের দিন ওগুলা কাজে বেরিয়ে গেল। মেয়েও ঢুকল ঐ ঘরে। না ঢুকে থাকতে পারছে না। ঘরে ঢুকে ঢাকনা খুলে ফেলল। ডাকল, "এম্‌বোলো! এম্‌বোলো!" কোনো সাড়া নেই। মেয়ে ঘুমিয়েই আছে। "আমি তোমাকে বার বার ডাকছি। তুমি কোনো সাড়া দিচ্ছ না। তোমার সাথে খেলতে ইচ্ছে করছে। তোমার চুলগুলো ঠিক করে দেব? মাথায় আদর করব? তোমার চুলের উকুন বেছে দেব?" তবু সাড়া নেই। ওগুলার মেয়ে ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ের মাথায় হাত দিল। আঙুল ঢুকিয়ে দিল ঘন চুলের মধ্যে। কি যেন শক্ত মতো হাতে ঠেকল? কোনো গয়না বুঝি? চুল ফাঁক করে মেয়ে দেখল একটা লম্বা ধারাল কাঁটা মাথায় ফোটানো রয়েছে। "ইস ওর মাথায় কাঁটা বেঁধা? আমি ওটাকে তুলতে চেষ্টা করি। আহা! ওর যেন না লাগে!" কাঁটাটা টেনে বের করতেই ঘুমন্ত মেয়ে হেঁচে উঠল একবার, চোখ খুলল, বড় বড় চোখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, চারিদিকে দেখল। আস্তে আস্তে আঁধারের মধ্যে উঠে বসল। মিষ্টি গলায় বলল, "ওঃ। কতদিন যে ঘুমিয়ে ছিলাম!"

ওগুলার মেয়ের গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। সে সামলে নিয়ে বলল, "শুধুই ঘুমিয়েছিলে?"

মেয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ওগুলার মেয়ে বলল, "এম্‌বোলো!"

মেয়ে বলল, "আই, এম্‌বোলো!"

ওগুলার মেয়ে বলল, "আই!"

এবার মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কোথায়? এটা কোন্‌ জায়গা?"

অন্য মেয়ে উত্তর দিল, "তুমি আমার বাবার বাড়িতে আছ। কেন? এটা তো আমার বাবার বাড়ি।"

মেয়ে বলল, "কিন্তু আমাকে এখানে কে আনল? কেমন করে এখানে এলাম?"

তখন ওগুলার মেয়ে সব খুলে বলল। এসেরেন্‌গিলা কেমন করে শবাধার দেখতে পেল, কিভাবে ওগুলাকে খবর দিল, কিভাবে তারা সোনালি আধার নিয়ে এল। সব বলল তাকে। তক্ষুণি দুজনে দুজনকে খুব ভালোবেসে ফেলল। যেন আপন দুই বোন। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল, আদর করল, খেলল, গল্পগুজব করল। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

মেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বলল, "বোন, তুমি আমার মাথায় আবার কাঁটাটা ঢুকিয়ে দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে থাকি।" ওগুলার মেয়ে তাই করল। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢাকনা বন্ধ করে মেয়ে ফিরে এল। ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ে আবার মৃতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। এখন তার মাথায় যে ধারাল কাঁটা বেঁধা রয়েছে!

ওগুলাব মেয়ে এখন আর বাইরে অন্য সাথীদের সঙ্গে খেলতে যায় না। বাড়ির বাইরে যেতে আর এতটুকু ভালো লাগে না। বন্ধুরা অভিযোগ করে, সে নানা অজুহাত দেখায়। কোনোভাবেই তাকে আর তারা পায় না। কেমন করে পাবে? একটি ঘর আর একটি নতুন সাথী তাকে আটকে দিয়েছে। অন্য আর কিছুই তার ভালো লাগে না। যখনই তার বাবা বাইরে যায়, তক্ষুণি সে ঘরে ঢুকে আধারের ঢাকনা খোলে, ঘন চুলের মাঝ থেকে ধারাল কাঁটা টেনে বের করে। মেয়ে জেগে ওঠে, চোখ মেলে। তারা গল্প করে, খেলা করে। কতই আনন্দ। এমনি করে সুখে দিন কাটে। অনেক দিন একটানা ঘুমিয়ে মেয়ে কাহিল হয়ে গিয়েছিল, রোগা হয়ে গিয়েছিল। এখন বন্ধু প্রতিদিন খাবার আনে। মেয়ে আর রোগাটে রইল না। আরও সুন্দরী হয়ে উঠল।

এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল। ওগুলা কিছুই জানতে পারল না।

কিন্তু একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। অনেকক্ষণ গল্প করছে, খেলায় মেতে রয়েছে। সময়ের খেয়াল নেই। বাবার আসার সময়ের কথা ভুলে গিয়েছে। খেলছে তো খেলছেই! গল্প করছে তো করছেই। হঠাৎ বাবা ফিরে এল। দরজা ভেজানো রয়েছে। হাত দিতেই খুলে গেল। ওগুলা অবাক হয়ে দেখল দুটি মেয়ে গল্প করছে, মাথা-হাত নেড়ে শুধুই বক্‌বক্ করে চলেছে।

ওগুলাকে দেখে তো মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বাবা কিন্তু তাকে বকুনি দিল না। নরম গলায় বলল, "ভয় পাওয়ার কি আছে? তা, তুমি কেমন করে এ মেয়ের জীবন ফিরিয়ে আনলে? এর ঘুম ভাঙালে কেমন করে? তুমি কি করলে বল তো?"

মেয়ে বাবাকে সব খুলে বলল। লম্বা ধারাল কাঁটাটার কথা খুব ভালোভাবে বলল। ওগুলা তখন অপরূপ সুন্দরী মিষ্টি মেয়ের পাশে বসে পড়ল। তার সব কথা জানতে চাইল। মেয়েও মন খুলে সব কিছু বলল। তার জীবনের করুণ কাহিনী।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ করে বসে রইল। তারপর ওগুলা বলল, "আমি এক বিরাট এলাকার সর্দার, আমি গোষ্ঠীপতি। তোমার মা যেখানে থাকে সেটাও আমার এলাকা। মা হয়ে এমন কাজ? রূপের গরব এত? আমার এলাকাতে বাস করে মেয়েকে মেরে ফেলার চক্রান্ত? ঠিক আছে, কালকে এসব নিয়ে খোঁজখবর করব। কালকে হবে এলাকার 'ওজাজা'—সবাইকে ডেকে এনে এক সভা হবে। সবাইকে সেখানে থাকতে হবে। তুমিও থাকবে। কেননা, তুমি হবে আমার বৌ। বড় আদরের বৌ।" একথা শুনে সুন্দরী মেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল।

সেদিনই চারিদিকে খবর চলে গেল। কাল সকালে হবে এলাকার 'ওজাজা'। সেই বিরাট জমায়েতে সবাই এল। নিষ্ঠুর মা, সৈন্যরা, বুড়িমা সবাই এল। এল না শুধু সেই কয়জন ডাকাত। তারা এই সভার কোনো খবর পায়নি। তারা যে গভীর বনে লুকিয়ে থাকে, তাদের বাড়ির খবর কেই বা রাখে? সবাই যার যার কথা বলল। এখানে তো মন খুলে কথা বলতেই আসা!

শেষকালে সভায় এল সেই সুন্দরী মিষ্টি মেয়ে। ওগুলার মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে সে সভার মাঝে এল। চারিদিক আলো করে।

যেই না মা সেই মেয়েকে দেখেছে, অমনি লাফিয়ে উঠল সে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। পাশে-বসা বুড়িমার চুল ধরে টেনে জিজ্ঞেস করল, "ঐ তো আমার মেয়ে। ও-তো বেঁচে আছে। মরেনি। তুমি যে বললে তাকে মেরে ফেলেছ?"

বুড়িমা খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। মরা মেয়ে বেঁচে ফিরল কি করে? সত্যি কি সেই মেয়ে? বলল, "হ্যাঁ, আমি তো তাকে মেরেই ফেলেছিলাম। কিন্তু——।"

মেয়েটা একটা উঁচু পাথরে বসল। ওগুলা বলল, "সবাই এখানে রয়েছে। তোমার জীবনের কথা তুমি বল।"

মেয়ে আরম্ভ করল। তার ছেলেবেলা থেকে শুরু করল। নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, মায়ের নিষেধ, তার কৌতূহল, যাদু আয়না, সৈন্যদের কথা, মরে যাওয়ার কথা, বেঁচে ওঠার কথা,—আর শেষকালে ওগুলার বাড়ির কথা। সব বলল সে। মাঝে মাঝে সব ঝাপসা হয়ে উঠছে, চোখের জল বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে মেয়ে যখন ডাকাতদের কথা বলছে তখন তার কি কান্না! কোথায় হারিয়ে গেল তারা! আর কি কোনোদিন দেখা হবে? মেয়ে থামল। মাথাটা সে নুইয়ে রয়েছে।

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। এমন নিষ্ঠুর মা! মেয়েকে মেরে ফেলতে চায়? আর এমন মিষ্টি মেয়েকে? শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। প্রতিশোধ চাই। ডাইনী কোথাকার। ওকে পুড়িয়ে মারা উচিত। আর সেই বুড়িটাকেও।

এইরকম যখন চিৎকার হট্টগোল হচ্ছে তখন মা আর বুড়িমা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মেয়ে যদি এখুনি তাদের চিনিয়ে দেয়? তাহলে? ডাইনীর শাস্তি? ভিড়ের মধ্যে তারা পেছন দিকে চলে গেল। সভা ছেড়ে পালাল। বনের পথ ধরল। আরও গভীর বন। তারপরে দূর এক দেশে চলে গেল। আর কখনও ফিরল না, কোথায় হারিয়ে গেল দুজনে।

সবার সামনে ওগুলার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হল। সবাই খুশি। গাঁয়ের লোক, ওগুলা, মেয়ে—সবাই। সবার চেয়ে খুশি হল ওগুলার মেয়ে। এমন খেলার সাথী! তখন থেকে তারই কাছে থাকবে।

আর ডাকাতরা? তারা সেই গভীর বনে নির্জন বাড়িতে থাকে। তারা 'ওজাজা'র কথা শোনেনি। সেখানে যায়ও নি। সবই তাদের রয়েছে, শুধু নেই আদরের বোন। শবাধারে মেয়ে ছিল, হোক সে ঘুমন্ত, তবুতো বোনকে প্রতিদিন দেখতে পেত! তাও নেই। তারা ডাকাত। আরও কোনো বড় ডাকাত তাদের বোনকে বোধহয় ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। তারা প্রতিদিন চোখের জল ফেলে। কাজ করে, সব করে তবু বোনকে ভুলতে পারে না। কি হল তাদের বোনের? কোথায় রয়েছে সে? কোন্ দূর দেশে কোথায় গেল তাদের আদরের বোন?

নিয়ামবি ও কামোনু

তখন কিছুই ছিল না। আদিকালে কোনো কিছুই ছিল না। ছিলেন শুধু নিয়ামবি। নিয়ামবি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি গভীর বন সৃষ্টি করলেন। সাগর আর নদী। তারপরে বনের জন্তু-জানোয়ার, গাছ আর আকাশের পাখি, জলের মাছ। আরও কত কি।

নিয়ামবি কিন্তু তখন এই পৃথিবীতেই বাস করতেন। বড় সুখে বাস করতেন। তার বৌ ছিল নাসিলেলে। সে বড় ভালো বৌ। দুজনের সুখের সংসার। আর চারিদিকে নিয়ামবির সৃষ্টি করা কত প্রাণী। কি সুন্দর তাদের দেখতে। খাওয়া-দাওয়ারও কোনো অভাব নেই। বড় সুখ, বড় শান্তি।

কিন্তু নিয়ামবির মনে অশান্তি দেখা দিল। আরও একটা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সে অন্যদের মতো নয়, একেবারে আলাদা। অন্যেরা নিজের নিজের স্বভাব নিয়ে থাকে, বেড়ায়, খায়, সংসার করে। এই প্রাণীটি অন্যরকম। এর নাম কামোনু। এই প্রাণী ওড়ে না, চার পায়ে হাঁটে না। দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে চলে-ফিরে বেড়ায়। শুধু কি তাই ? নিয়ামবি যা করে, এই প্রাণী সঙ্গে সঙ্গে তা নকল করে ফেলে। কামোনু সব কাজ ঠিক নিয়ামবির মতোই করে ফেলে। নিয়ামবি বনে কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটছেন, কামোনু শিখে নিয়ে কাঠতে শুরু করে দিল। নিয়ামবি কামারশালায় হাপর চালিয়ে লোহা গলিয়ে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র বানাচ্ছেন, কামোনু তক্ষুণি সব শিখে নিল। তৈরি করল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র। নিয়ামবি খাল কেটে জমিতে জল আনলেন, লাঙল দিয়ে জমি চষলেন, বীজ লাগালেন। কামোনুও তাই করল। কিছু শিখতেই তার দেরি লাগে না। যা করেন নিয়ামবি, তাই নকল করে কামোনু।

নিয়ামবি চিন্তিত হলেন। মনের অশান্তি বেড়ে গেল। শেষকালে তিনি কামোনুকে ভয় পেতে শুরু করলেন। ভাবলেন, কেন সৃষ্টি করলাম কামোনুকে ? কিন্তু এখন আর কি করবেন ? অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

কামোনু কামারশালার হাপরে একদিন একটা বর্শা তৈরি করল। নদীর পারে পড়ে-থাকা পাথরে ঘষে ঘষে বর্শাকে খুব চকচকে আর ধারাল করে তুলল। মুখে অদ্ভুত হাসি। বর্শা বাগিয়ে বনের পথে সে ফিরে আসছে। হঠাৎ

দেখে একটা পুরুষ হরিণ নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। ওরা তো ভয় পেতে শেখেনি। নিয়ামবির পৃথিবীতে কেউ কাউকে মারে না। তাই কামোম্নুকে একবার দেখেই হরিণ আবার ঘাস খেতে শুরু করল। হঠাৎ কামোম্নু হরিণের পেটে তার ধারাল বর্শা ঢুকিয়ে দিল। রক্ত ঝরল, ছটফট করল, হরিণ মরে গেল। কামোম্নুর মুখে অদ্ভুত হাসি। পরপর আরও কয়েকটা নিরীহ জন্তু মারা পড়ল কামোম্নুর বর্শার আঘাতে। বেশ মজা, বেশ লাগছে এই নতুন খেলা।

নিয়ামবি সব জানতে পারলেন। তিনি খুব ব্যথা পেলেন। তারপরে গেলেন রেগে। এসব কি হচ্ছে? তিনি ডেকে পাঠালেন কামোম্নুকে। কামোম্নু এল।

নিয়ামবি বললেন, 'কামোম্নু, তোমাকে আমি মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু তুমি তো মোটেই ভালো কাজ করছ না! খুব খারাপ কাজকর্ম করে চলেছ। তুমি ওদের মেরে ফেললে। অথচ ওরা তোমার ভাই। তুমি কি জানতে না যে, ওরা সবাই তোমার ভাই? ভাইকে কখনো মারতে হয়? আর যেন না দেখি, তুমি ওদের গায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিও না। মনে রেখো।'

কে শোনে কার কথা? কামোম্নু আবার ভাইদের মারল। বড় ভালো লাগছে এই খেলা।

এবার নিয়মবি এমন রেগে গেলেন যে, কামোম্নুকে দূরের এক দ্বীপে রেখে এলেন। সে আর আসতে পারবে না। চারিদিকে অথৈ জল। জলে নামলেই ডুববে। নিয়ামবি নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই কামোম্নু ফিরে এল। একটা মস্ত বড় শুকনো কাঠে চেপে জলের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে সে ফিরে এল। কি আর করেন নিয়ামবি! তারই সন্তান তো! কামোম্নুকে সেখানেই থাকতে বললেন। তাকে দিলেন মস্ত বড় একটা বাগান। তাকে সেই বাগানে ভালোভাবে চাষবাস করতে বললেন। সে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুক, দুষ্টুমি যেন না করে। ওসব ভালো নয়।

চাষে মন দিল কামোম্নু। বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ শুরু করল। খাল কেটে জল আনল, লাঙল দিল, বীজ বুনল। সব কাজই সে খুব ভালোভাবে করতে পারে। সবুজ লকলকে গাছ বাগান ছেয়ে ফেলল। কামোম্নু দেখে আর গুনগুন করে গান গায়।

একদিন হয়েছে কি, রাত্তিরবেলা অনেক বুনো মোষ বন থেকে বেরিয়েছে।

সেই বাগানে সবুজ গাছ দেখে সব মোষ ঢুকে পড়ল। তারা ভয় পেতে শেখেনি। শব্দ হতেই কামোন্থু বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে ঢুকল। মোষ গাছ উজার করে দিচ্ছে। ছুটে গেল বাড়িতে, হাতে তুলে নিল বর্শা। ফিরে এল বাগানে। একের পর এক মোষকে মারতে লাগল। পাগল হয়ে গিয়েছে কামোন্থু। মোষদের দেখাদেখি বাগানে ঢুকতে যাবে একপাল কৃষ্ণসার হরিণ। কামোন্থু তাদেরও মেরে ফেলল। তার বাগানের গাছ নষ্ট করা! বুঝুক মজা।

এর কিছুদিন পরে কামোন্থুর পোষা তেজী কুকুরটা মরে গেল। তারপরে তার খাবার পাত্রটি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে গেল। তার কয়েক দিন পরে ছেলেটিও মরে গেল। এ কি হল? কামোন্থু চলল নিয়ামবির বাড়িতে। তাকে সব খুলে বলতে হবে। এসব কি ঘটছে? কেন হচ্ছে এসব?

নিয়ামবির বাড়িতে গিয়ে কামোন্থু অবাক হয়ে গেল। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নিয়ামবির বাড়িতে তার ছেলে আর কুকুর খেলা করছে, তার পাত্রটি উঠোনের পাশে রয়েছে, তার আস্ত পাত্রটি। সে অবাক হল।

নিয়ামবির সামনে বসে পড়ে কামোন্থু বলল, 'আমাকে আপনার ওষুধ দিতেই হবে। যে গাছ-গাছরার ওষুধে ওদের বাঁচিয়ে তুললেন, আমার তা চাই। ঐ ওষুধ পেলে আমার সংসারে আর কেউ মরে যাবে না। মরলেই বাঁচিয়ে তুলব। ওষুধ দিন।'

অনেক ঠকেছেন নিয়ামবি। অনেক চিনেছেন কামোন্থুকে। আর নয়। এতেই নিয়ামবি নাজেহাল হয়ে পড়ছেন, তার ওপরে বাঁচাবার ওষুধ? আর নয়, অনেক হয়েছে। তিনি কামোন্থুকে তাড়িয়ে দিলেন, ওষুধ দিলেন না। কামোন্থু ফিরে গেল।

নিয়ামবি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক দিন থেকেই তিনি কামোন্থুকে ভয় পেতে শুরু করেছেন। সেই ভয় আরও বেড়ে গেল। কামোন্থু তার বাড়ির পথ চিনে গিয়েছে। তার বাড়িতেও এল, সব দেখে গেল। ওষুধ না দেওয়াতে আবার কি করে বসে। নিজের সৃষ্টি এমন বিপদে ফেলবে কে জানত? বড় ভয় নিয়ামবির। চিন্তা করতে বসল।

তারপর থেকে নিয়ামবি কামোন্থুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক কৌশল করলেন। তিনি একবার নদী পেরিয়ে দূরের দ্বীপে চলে গেলেন। সঙ্গে নিলেন তার সংসার ও লোকজন। ঐ বাড়ি তো কামোন্থু চিনে ফেলেছে। এবার অনেক দূরে। কামোন্থুর নাগালের বাইরে।

কিছুদিন পরেই কামোনু সেই দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল। নলখাগড়া দিয়ে কামোনু এক ভেলা তৈরি করেছে। তাতে চেপে দিব্যি পৌঁছে গেল নিয়ামবির নতুন দ্বীপে। নিয়ামবি তো অবাক। তিনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন নিয়ামবি এক বিশাল উঁচু পাহাড় তৈরি করলেন। পাহাড়ের মাথা মেঘ ছাড়িয়ে আকাশে ঠেকেছে। মাটি থেকে দেখাই যায় না পাহাড়ের চূড়ো। সেই চূড়োতে বাস করতে লাগলেন নিয়ামবি, তার সংসার আর লোকজন। নিয়ামবিকে এবার বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল। আর ভাবনা নেই।

এমনি করে দিন কাটে, রাত কাটে। হঠাৎ নিয়ামবির নতুন বাড়িতে উপস্থিত হল কামোনু। সে ঠিক আসবার পথ চিনে নিয়েছে, পাহাড়ী পথে উঠবার কৌশল জেনে ফেলেছে। মানুষের হাত থেকে নিস্তার নেই নিয়ামবির। নিয়ামবি যেখানেই যান, সেখানেই তার পিছে পিছে মানুষ চলছে। এ এক অদ্ভুত প্রাণী!

এদিকে হয়েছে কি, অনেক কাল এমনি করে কেটে গেল। তাই মানুষ অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগের মতো আর অল্প নেই। সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষের ছড়াছড়ি। নিয়ামবি ভাবলেন, এক মানুষেই আমার যদি এমন দশা হয়, তবে কামোনু অন্যদের আমার পেছনে লাগালে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর কামোনুকে আমার পেছনে লাগাতে হবে না, ওরা যখন মানুষ তখন নিজেরাই আমার শান্তি কেড়ে নেবে, আমাকে তাড়িয়ে মারবে। ওরা যে মানুষ ওরা! আমারই সৃষ্টি, তবু ওরা মানুষ। এ এক ভয়ংকর জীব!

শেষকালে কোনো উপায় না দেখে নিয়ামবি কয়েকটি পাখিকে ডাকলেন। তারা তো দূর দূর দেশে, মেঘের রাজ্যে অনেক ওপরে উড়ে যেতে পারে। তারা দেখে আসুক এমন এক দূরের রাজ্য যেখানে নিয়ামবি নতুন বাড়ি তৈরি করবেন। তিনি তৈরি করবেন নতুন রাজ্য, তার নাম হবে লিটোমা। সে রাজ্য শুধুই দেবতাদের জন্য।

পাখিরা চারিদিকে উড়ে চলল। দূর আকাশে, গভীর বন পেরিয়ে, উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে, নীল সমুদ্র পেরিয়ে। ফিরে এল কয়েকদিন পরে। না, লিটোমার জন্য তারা কোনো ভালো জায়গা পেল না। অনেক ঘুরেছে, ডানা ক্লান্ত হয়েছে, তবু পায়নি তেমন জায়গা। নিয়ামবি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষকালে তিনি একজন বৃদ্ধ ওঝা-গণককে ডেকে পাঠালেন। বড় বুদ্ধিমান এই ওঝা, ভালো গুণতে পারে। ওঝা অনেক আঁক-জোক করে নিয়ামবিকে বলল, 'তোমার বড় বিপদ। কিন্তু একজন ছাড়া আর কেউ তোমাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। সে মাকড়সা। মাকড়সার ওপরেই তোমার জীবন নির্ভর করছে।' ওঝা চুপ করে গেল। আর কিছু না বলে পাহাড়ী ঢালুতে নেমে চলল।

দেরি না করে নিয়ামবি মাকড়সাকে ডাকলেন। আঁকাবাঁকা পথে মাকড়সা এল নিয়ামবির বাড়ির উঠোনে। সব খুলে বললেন নিয়ামবি। তার বিপদের কথা, মানুষের দুষ্টুমির কথা, ওঝা-গণকের কথা। মাকড়সা এমন একটা জায়গা ঠিক করুক যেখানে নিয়ামবি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। সে জায়গার নাম হবে লিটোমা। যেখানে শুধু দেবতারাই থাকবে। কামোনু কিংবা অন্য কোনো মানুষ সেখানে পৌঁছতেই পারবে না। আঃ কি শান্তি।

দাঁড়াগুলো নেড়ে মাকড়সা আবার আঁকাবাঁকা পথে ফিরে চলল। সে কথা দিল,—একটা ব্যবস্থা করবেই। লিটোমার জন্য ঠিক জায়গা বেছে আসবেই। নিয়ামবি খুশি হল।

ফিরে এসেই মাকড়সা কাজে লেগে গেল। বসে থাকার পাত্র নয় সে, উপায় বের করে ফেলেছে। পৃথিবীর মাটি থেকে সে ওপরে জাল বুনতে লাগল। জাল ওপরে উঠছে, সেও ওপরে উঠে আবার জাল বুনছে। আরও ওপরে, আরও ওপরে। মেঘ ছাড়িয়ে আরও ওপরে। শেষকালে জাল শেষ করে তরতর করে জাল বেয়ে নেমে এল মাটিতে। চলল নিয়ামবির কাছে। হ্যাঁ, লিটোমার জন্য সে জায়গা বেছেছে অনেক ওপরে, দূর আকাশে। পথও তৈরি করে ফেলেছে। জালের পথ। সোজা ওপরে যাওয়ার সুন্দর পথ। এবার নিয়ামবি যেতে পারে, কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। না, মানুষও পারবে না, কামোনুও পারবে না।

সেই জালের পথ বেয়ে নিয়ামবি, তার সংসার ও লোকজন আকাশে উঠে গেল। কত দূরে রইল পৃথিবী, গাছ-গাছালি, সমুদ্র-নদী, পাখি-জন্তু-জানোয়ার আর মানুষ। বেশ নিশ্চিন্ত। তবু আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ওঝা-গণকের পরামর্শে নিয়ামবি মাকড়সার চোখ দুটো উপড়ে ফেলল, আর কোনোদিন সে ঠিকপথে জাল তৈরি করতে পারবে না। কোনদিকে যে লিটোমা তা আর দেখতে পাবে না। লিটোমাকে না দেখলে আর এই পথে জাল বুনবে কেমন করে? ওপরে উঠে নিয়ামবি জালটা গুটিয়ে নিলেন, তারপর ছিঁড়ে ফেললেন। মানুষকে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই কামোনুকে।

মাকড়সার চোখ উপড়ে দিলেন নিয়ামবি। এই একবারই তিনি নিষ্ঠুর কাজ করলেন। তার সৃষ্টিকে ব্যথা দিলেন। এই একবারই। কিন্তু তার যে আর কোনো উপায় ছিল না। মানুষ বড় ভয়ংকর! তাকে তো বাঁচতে হবে! তিনিও ব্যথা পেলেন।

নিয়ামবিকে আর কেউ কোনোদিন এই পৃথিবীতে দেখে নি। যেখানে তিনি গেলেন, এখান থেকে সেখানে নজর যায় না। তিনি অদৃশ্য হলেন।

কামোনু একদিন নিয়ামবির বাড়ি গিয়ে দেখে,—কেউ নেই সেখানে। নিয়ামবি তো নেই-ই, তার সংসারেরও কেউ নেই, নেই তার লোকজন। সব বুঝল কামোনু।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল তার এলাকায়। নিজের লোকজনকে ডাকল। যেমন করেই হোক নিয়ামবিকে ধরতেই হবে। ছাড়া চলবে না। সে তার লোকজনকে বলল, 'খুব উঁচু একটা জায়গা বানাতে হবে, তাতে চেপে নিয়ামবির কাছে পৌছতে হবেই। ওকে ছাড়া চলবে না। খুব পরিশ্রম কবতে হবে। যেভাবে বলব সেভাবে কাজে লেগে যাও।'

কাজ শুরু হয়ে গেল। কুড়োলের আঘাতে বড় বড় গাছ মাটিতে পড়তে লাগল। তাদের ডালপালা কেটে আসল গাছটাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। তার ওপরে গাছ, তার ওপরে গাছ। ওপরে, আরও ওপরে। মেঘ ফুটো করে নিয়ামবির কাছে পৌছতেই হবে। কাজ চলছে দিনরাত।

এমনি করে কয়েকদিন কাজ করার পরে অনেক উঁচু হল গাছের মাথা। আরও উঁচু করতে হবে। কাজ চলছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গাছের মাথা। ওপরে বড্ড ভারি হয়ে গিয়েছিল। সোজা রইল না তাদের গাছ। আবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু এর ওপরে আর তাদের রাখা যাচ্ছে না। কামোনু হাল ছেড়ে দিল। সে বুদ্ধিমান! বুঝতে পারল, আর কোনোদিন নিয়ামবির কাছে পৌছনো যাবে না। নিয়ামবি নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

এতদিন পরে মানুষ কামোনুর মনে দুঃখ এল, কষ্ট হল। সে ব্যথা পেল মনেমনে। কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। না করলেই হত। নিয়ামবি তো তার কোনো ক্ষতি করে নি! কি জানি, কেন সে করল এমন কাজ!

তাই প্রতিদিন যখন সূর্য ওঠে পুব আকাশে, আঁধার মিলিয়ে যায়, তখন কামোনু সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'ঐ আমাদের রাজা এসেছেন। হ্যাঁ, তিনি এসেছেন আমাদের মাথার ওপরে। আমাদের রাজা, আমাদের সূর্য, আমাদের নিয়ামবি।' অন্য সব মানুষও সূর্যকে প্রণাম করে, অভিনন্দন জানায়, চিৎকার করে হাততালি দিয়ে আনন্দ করে ওঠে। তাদের সূর্য, তাদের রাজা, তাদের নিয়ামবি। পূর্ণিমার রাতেও তারা চাঁদকে দেখে প্রণাম করে, অভিনন্দন জানায়। আনন্দে নৃত্য করে, গান গায়। পূর্ণিমার চাঁদ যে নাসিলেলে, নিয়ামবির বৌ, সূর্যের প্রিয়তমা,—তাদের রানী।

মাকড়সা কেমন করে আকাশ-দেবতার গল্প পেল

অনেক অনেক কাল আগে এক মাকড়সা ছিল। তার নাম কোয়াকু আনান্সে। সবাই জানে, আকাশ-দেবতা হলেন নিয়ান-কোন্পোন। কোয়াকু একদিন আকাশ-দেবতার কাছে গেল। সে আকাশ-দেবতার সব গল্প কিনে নিতে চায়। তাই সে এসেছে।

নিয়ান-কোন্পোন বললেন, 'তুমি কেমন করে ভাবলে, তুমি আমার সব গল্প কিনে নিতে পারবে?'

মাকড়সা বলল, 'আমি জানি আমি কিনতে পারব। তাই এসেছি।'

আকাশ-দেবতা হাসলেন আর বললেন, 'কোকোফু, বেক্ওয়াই, আসুমেনগিয়া এসেছিল গল্প কিনতে। তারা যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী। তারাও পারে নি। আর তুমি এইটুকু প্রাণী। কিই-বা তোমার আছে? তুমি পারবে কেমন করে?'

মাকড়সা বলল, 'আপনার গল্পগুলোর দাম কত? একবার শুনি-ই না।'

আকাশ-দেবতা বললেন, 'যদি তুমি অজগর সাপ ওনিনি, চিতা ওসেবো, পরী মোয়াতিয়া আর ভীমরুল মোবোরোকে দিতে পার, তবেই আমার গল্পগুলো কিনতে পারবে।'

মাকড়সা বলল, 'এ সবই আমি দেব। তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস ফাউ দেব। সে হল আমার বুড়ি মা, ন্সিয়াকে।'

আকাশ-দেবতা মাথা নেড়ে বললেন, 'বেশ, তবে তাই নিয়ে এসো। গল্প তুমি পাবে।'

মাকড়সা নেমে এল পৃথিবীতে। সব কথা জানিয়ে বুড়ি মাকে বলল, 'আমার ইচ্ছে আমি আকাশ-দেবতার সব গল্প কিনে নেব। আকাশ-দেবতাকে এর বদলে দিতে হবে অজগর সাপ, চিতা, পরী আর ভীমরুল। আমি বলেছি এসবের সঙ্গে আমি তোমাকেও দিয়ে আসব। তিনি রাজি।'

মাকড়সার বৌয়ের নাম আসো। আসোকে সে বলল, 'এখন বুদ্ধি বের করতে হবে, কিভাবে অজগর ওনিনিকে ধরা যায়।'

বৌ বলল, 'বনে গিয়ে তালগাছের একটা বড় পাতাসমেত ডাল কেটে আনো, আর নিয়ে এসো শক্ত বুনো লতা। তাই নিয়ে গাঁয়ের শেষে ঐ হ্রদে যাও।'

আনান্‌সে তাই নিয়ে এল। চলে গেল হ্রদের তীরে। সেখানে গিয়ে আপন মনে বলল, 'মনে হয় এটা ওর চেয়ে লম্বায় বড়। না, না, তা কি করে হয়! বোধহয় ছোটই হবে। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এটা লম্বায় বড়ই হবে। ওটা তো হ্রদেই থাকে, ঐ তো ওখানে।'

অজগর জলের ভেতর থেকে এই অদ্ভুত কথাবার্তা শুনল। অবাক হল। জলের ওপরে মাথা তুলে বলল, 'কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?'

মাকড়সা বলল, 'আমার বৌ আসো আমার সঙ্গে খালি তর্ক করছে। বলছে, এই তালপাতার ডালটা লম্বায় তোমার চেয়ে বড়। এত মিথ্যে কথাও সে বলতে পারে। মিথ্যাবাদী, একেবারে মিথ্যাবাদী।'

অজগর বলল, 'এত তর্কের কি আছে? আমি জল থেকে উঠছি। মেপে নিলেই হল।'

অজগর টানটান করে লম্বা হয়ে পড়ল। মাকড়সা তার দেহ ঢেকে দিল তালপাতায়। তারপর বুনো লতা দিয়ে পাতা-সমেত অজগরকে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। মুখে মাপবার শব্দ করতে লাগল—নোয়েনেনে, নোয়েনেনে, নোয়েনেনে। কাজ শেষ করে মাকড়সা বলল, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। বলল, 'নিয়ে এসেছি অজগর ওনিনিকে।'

আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

মাকড়সা ফিরে এসে সব কথা বৌকে জানাল। বলল, 'এবার ভীমরুলকে ধরতে হবে।'

বৌ বলল, 'লাউয়ের একটা খোল যোগাড় কর, তাতে জল ভর্তি করে বনের পথে যাও।'

মাকড়সা সব ঠিক করে নিয়ে বনের পথে রওনা দিল। কিছু দূরেই ভীমরুলের একটা চাক দেখতে পেল। একটা গাছে সেটা ঝুলছে। লাউয়ের খোল থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাকড়সা চাকে ছুড়ে দিল, কিছুটা জল নিজের মাথায় ঢেলে নিল। তারপরে ভীমরুলদের বলল, 'খুব বৃষ্টি পড়ছে, ওপর থেকে পাতা বেয়ে জল পড়ছে। এক কাজ কর। আমার এই লাউয়ের খোলের মধ্যে ঢুকে যাও, তাহলে আর বৃষ্টি মোটেই গায়ে লাগবে না।'

ভীমরুলরা বলল, 'কি ভালো তুমি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আকু, ধন্যবাদ জানাই আকু।'

এই না বলে বৃষ্টির ভয়ে ভীমরুলরা সব চাক থেকে উড়ে এসে লাউয়ের খোলে ঢুকতে লাগল। মুখটা ঢেকে মাকড়সা বলল, 'বোকা কোথাকার। এবার তোমাদের আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

আবার ফিরে এল মাকড়সা। বৌকে বলল, 'এবার চিতা ওসেবোকে ধরতে হবে।'

বৌ বলল, 'ঘন বনের মধ্যে চলে যাও আর একটা গর্ত কর।'

মাকড়সা বলল, 'আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।'

মাকড়সা চলল ঘন বনের পথে। চিতার খোঁজে। চিতার থাবার চিহ্ন খুঁজতে লাগল। থাবার চিহ্ন দেখতে পেল। নজর রেখে এগোতে লাগল। একটু এগিয়েই এক বিরাট গর্ত খুঁড়ল। গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিল। ফিরে এল বাড়িতে।

পরের দিন খুব ভোরে রওনা দিল মাকড়সা। তখনও সব কিছু চোখে ভালো দেখা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে যেতে যেতে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কি আনন্দ! গর্তের কাছে যেতেই গর্জন শুনতে পেল। ভেতরে পড়ে রয়েছে চিতা ওসেবো।

মাকড়সা বলল, 'বাপের ছোট্ট ছেলে, মায়ের ছোট্ট ছেলে, তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। হল তো! বার বার বলেছি, মজানো তালের রস অত খেও না, মাতাল হয়ে পড়বে। হল তো! এমন মাতাল হয়ে পড়লে কাল রাতে যে গর্তেই পড়ে গেলে? আমি আগেই জানতাম। আমি তোমায় গর্ত থেকে তুলতে পারি। আহা! যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু কালকেই তো তুমি সব কিছু ভুলে যাবে। আমাকে কিংবা আমার ছেলেমেয়েদের দেখলেই তেড়ে আসবে। ঠিক বলিনি?'

চিতার মাথা কেমন গুলিয়ে গিয়েছে, চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মাকড়সার কথার অর্থও সে বুঝতে পারছে না। কি বিপদেই সে পড়েছে! তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'ওঃ, আমি কখনই এ কাজ করতে পারি না।'

মাকড়সা তখন একটু দূরে গেল আর গাছের দুটো ডাল কেটে আনল। একটা এখানে রাখল, আরেকটা ওখানে রাখল। বলল, 'চিতা, তোমার একটা থাবা এখানে দাও, অন্য থাবাটা ওখানে বসাও।'

চিতা তার কথামতো তাই করল। চিতা ওপরে উঠে আসছে, অনেকটা ওপরে,—হঠাৎ মাকড়সা তার চোখের নিমেষে তার ধারাল ছুরিটা বের করেই চিতার মাথায় বসিয়ে দিল। থপ্ করে শব্দ হল। চিতা পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। এখন আর আগের চিতা নেই। মই নিয়ে এসে তর্তর্ করে গর্তের মধ্যে নেমে গেল। চিতাকে গর্তের বাইরে তুলে আনল। যাচ্ছে আর বলছে, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

আবার ফিরে এল মাকড়সা। এবার ধরতে হবে পরী মোয়াতিয়াকে। মাকড়সা একটা কাঠের পুতুল তৈরি করল, পুতুলের মুখটা চ্যাপ্টা। তারপরে গাছের গোড়া থেকে আঠা এনে পুতুলটার সারা গায়ে লেপ্টে দিল। অনেকটা মেটে আলু সেদ্ধ করে মেখে কিছুটা রেখে দিল পুতুলটার হাতে, আর কিছুটা একটা পেতলের বাটিতে রেখে দিল। পুতুলের কোমরে একটা লম্বা দড়ি বাঁধল। পুতুলকে নিয়ে চলল বাগানের ওপাশে, শিমুল গাছের নিচে। প্রতিদিন রাতে ওখানে পরীরা নাচতে আসে। একটু দূরে দড়ি ধরে মাকড়সা লুকিয়ে থাকল।

চাঁদনী রাত। উড়ে আসছে একটা ছোট্ট পরী। সোজা নেমে এল পুতুলের কাছে। বলে উঠল, 'আকুয়া, তোমার হাতের আলু সেদ্ধ একটু খাব?' মাকড়সা দড়ি ধরে টান দিল, পুতুল মাথা নাড়ল, সম্মতি দিল। আলুসেদ্ধ নিয়ে সে খেল। খুব ভালো আলু। বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ।' পুতুল কোনো সাড়া দিল না, মাথাও নাড়ল না। রেগে গেল পরী। বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ জানালাম, তবু তুমি উত্তর দিলে না?' পুতুল তবু কিছু বলল না। আরও রেগে গেল পরী। পুতুলের গালে এক চড় মারল। এ কি? হাত পুতুলের দেহে আটকে গেল। অন্য হাত পুতুলের বুকে রেখে দিয়ে চাপ দিয়ে ছাড়াতে গেল। এ কি! ও হাতও আটকে গেল! বুক-পেট দিয়ে পুতুলকে ধাক্কা মারতে গেল। এ কি! বুক-পেট আটকে গেল। নড়াচড়া করাই কঠিন।

মাকড়সা লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল। দড়ি দিয়ে পরীকে বেঁধে ফেলল। বলল, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

পরীকে নিয়ে মাকড়সা বাড়ি ফিরে এল। মাকড়সার মায়ের কাছে এসে বলল, 'ওঠ, আকাশ-দেবতার কাছে যেতে হবে। তাকে বলেছিলাম তোমাকে ফাউ হিসেবে দেব। পরীর সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে। ব্যস, কাজ শেষ। এবার পাব গল্পগুলো।'

পরী ও মাকে নিয়ে মাকড়সা আকাশ-দেবতার কাছে চলল। সেখানে পৌঁছে বলল, 'আকাশ-দেবতা, এই পরী মোয়াতিয়াকে নিয়ে এসেছি। আর কথামতো আমার বুড়ি মাকে ফাউ এনেছি।'

আকাশ-দেবতা অবাক হলেন। তিনি তার রাজ্যের প্রধানদের ডাকলেন। দুই সর্দার কোন্‌টিরে ও আক্‌ওয়ান এলেন, আরও এলেন গণ্যমান্য আদোনতেন, গিয়াসে, ওয়োকো, আন্‌কো-বিয়া ও কাইদোম। আকাশ-দেবতা তাদের বললেন, 'অনেক অনেক সর্দার এসেছে, অনেক গোষ্ঠীপতি এসেছে। তারা খুব শক্তিশালীও বটে। কিন্তু কেউ আমার গল্পগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারে নি। সবাই হেরে গিয়েছে। কিন্তু কোয়াকু আনান্‌সে গল্পগুলোর সব দাম মিটিয়ে দিয়েছে। আমি তার কাছ থেকে অজগর ওনিনি, চিতা ওসেবো, ভীমরুল মোবোরো ও পরী মোয়াতিয়াকে পেয়েছি। তার ওপরে ফাউ পেয়েছি তার মাকে। ঐ দেখ, সবগুলো জিনিস ওখানে একসঙ্গে রয়েছে। তোমরা সকলে তার জয়গান কর।'

সবাই 'হু' 'হু' বলে চিৎকার করে উঠল। গর্বে মাকড়সার বুক ফুলে উঠল।

আকাশ-দেবতা বললেন, 'কোয়াকু আনান্‌সে, আজকে আমি আকাশ-দেবতা আমার সব গল্প তোমাকে দিলাম। আজ থেকে চিরকালের জন্য আমার এইসব গল্প তোমার হল। এ আমার উপহার। যোগ্য পাওনা। কোসে। কোসে। কোসে। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি। আজ থেকে আর কেউ এগুলোকে আকাশ-দেবতার গল্প বলবে না। আজ থেকে সবাই বলবে,—কোয়াকু আনান্‌সের গল্প, মাকড়সার গল্প। আমিও তাই বলব।'

আমার গল্প শেষ হল। আমি যা বললাম, তা যদি মিষ্টি লাগে, তা যদি মিষ্টি না-ও হয়, তবু অন্যদের এ গল্প বলবে। চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। আবার আমার কাছে ফিরে এসে এ গল্প বলবে। তবে তাই হোক।

নিষিদ্ধ ফল

আগে অনেক কিছু ছিল, মানুষ ছিল না। দেবতা প্রথম-মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি চন্দ্র থেকেই অংশ নিয়ে আদি মানব সৃষ্টি করলেন। তার নাম বা-আত্‌সি। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে টিপেটুপে তিনি মানুষটার দেহ গড়ে তুললেন। তারপরে মসৃণ কালো চামড়া দিয়ে দেহটি দিলেন ঢেকে। সুন্দর দেহ তৈরি হবার পরে তিনি দেহের মধ্যে রক্ত ঢেলে দিলেন। মানুষ তখন প্রাণ পেল। আদি মানব,—প্রথম পিতা বা-আত্‌সি চলে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

দেবতা বা-আত্‌সিকে ডেকে কানে কানে বললেন, 'তুমি প্রাণ পেলে। তুমি আমার নতুন সৃষ্টি। এবার থেকে তোমার ছেলেমেয়ে হবে। সেই ছেলেমেয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কিন্তু তুমি তাদের একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেবে।— এই নিষেধ তারা যেন মেনে চলে। নইলে সর্বনাশ হবে। সবাই যেন মেনে চলে। বনে যত গাছ আছে তার ফল তারা খাবে। সব গাছের ফল খেতে পারবে। কিন্তু তাহু গাছের ফল কখনও স্পর্শ করবে না। হ্যাঁ, তাহু গাছের ফল। ছেলেমেয়েদের বলে দেবে।'

অল্পদিনের মধ্যে বা-আত্‌সির অনেক ছেলেমেয়ে হল। ছেলেমেয়ে একটু বড় হলেই সে দেবতার এই নিষেধের কথা তাদের জানিয়ে দেয়। নিষেধ মেনে চলতে বলে। তারপর একদিন বয়স হলে বা-আত্‌সি আকাশে দেবতার কাছে চলে গেল। অনেক ছেলেমেয়ে পৃথিবীতে রইল।

প্রথম প্রথম সবাই সে নিষেধের কথা মেনে চলত। আর তাই সবাই খুব সুখে থাকত। বড় আনন্দ, বড় সুখ, বড় শান্তি।

এখন হয়েছে কি, একদিন একটি মেয়ের খুব ইচ্ছে হল সে ঐ নিষিদ্ধ ফল খাবে। সে তখন মা হতে চলেছে, সে গর্ভবতী। কিছুতেই ইচ্ছে আর লোভকে দমন করতে পারছে না। সে তার স্বামীকে বলল, ঐ ফল তাকে দিতেই হবে। সে খাবেই। স্বামী অবাক হল, আদি পিতার নিষেধের কথা বলল। ফল দিতে রাজি হল না। কিন্তু বৌ বারবার বলাতে স্বামী ভাবল, লুকিয়ে দিলে কেউ তো আর জানতে পারবে না। বনের গভীরে নিয়ে গিয়ে সে বৌকে ফল দিল। বৌ ফল খেল। ফলের বীজগুলো পাতায় জড়িয়ে লুকিয়ে রাখল।

চন্দ্র আকাশ থেকে সব দেখলেন। দেবতাকে বলে দিলেন। দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন। মানুষ তার নিষেধ অমান্য করেছে? আর এই নিষেধ না মানার জন্য দেবতা শাস্তি দিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে মৃত্যুকে পাঠিয়ে দিলেন।

শেয়াল কেন চাষ করেনা

সবুজ পাহাড়ের কোলে ছিল এক গ্রাম। আর সেই গাঁয়ের পাশে ছিল মস্ত এক সবুজ বন। গভীর বনের মধ্যেও ছোট ছোট পাহাড়। সেই বনের এক ছোট্ট পাহাড়ী গুহায় থাকত এক শেয়াল আর তার বৌ। শেয়ালের অল্পদিন হল বিয়ে হয়েছে। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। বেশ সুখে দিন কাটে।

একদিন বুনো মুরগীর হাড় চিবোতে চিবোতে শেয়াল-বৌ বলল, "দেখ, আমরা তো বেশ সুখেই আছি। কষ্ট করে শিকার ধরতে হয়। কিন্তু অভাব তো আর নেই। বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে তো চিরকাল কাটবে না! আজ বাদে দুদিন পরে আমাদের ছেলেপুলে হবে। সংসার বাড়বে। তখন তো আর শুধু আমরা দুজনে থাকব না! আর তাই তো আমি চাই। ছেলেমেয়ে না থাকলে কি সংসার ভালো লাগে? সবাই তাই চায়। কিন্তু যতদিন ওরা বড় না হয়, ততদিন সংসার চলবে কি করে? ভেবেছ কিছু?"

হাড় চিবোনো থামিয়ে দিয়ে শেয়াল বৌয়ের দিকে চোখ ফেরাল। বলল, "একেবারে যে ভাবিনি তা নয়। জানি সংসার বাড়বে। কিন্তু ভেবে তো কুল-কিনারা কিছু পাই না। তুমি কিছু ভেবেছ? কি করতে বল? একটা কিছু বুদ্ধি দাও।"

শেয়াল-বৌ একটু ভেবে বলল, "আমি ঘরের বৌ, আমার কিই-বা বুদ্ধি। আমি কি বলব?"

"সে কি? তা কি হয়? তুমি ঠিক কিছু ভেবেছ। নইলে একথা মনে এল কেন?" শেয়াল হাসিমুখে বলল।

শেয়াল-বৌ লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, "হ্যাঁ, তা কিছু ভেবেছি বৈকি। নইলে আর কথাটা তুললাম কেন। তুমি এক কাজ কর। পাশেই তো মস্ত গাঁ। সেখানে তো মাহাতো থাকে। তার কত জমি, সে কত বড়লোক। আর তোমায় তো সে খুব ভালোবাসে। তুমি তার কাছে যাও। তার সঙ্গে দেখা কর।"

শেয়ালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "এ কথা তো আগে ভাবিনি! খুব ভালো বুদ্ধি। গিয়ে কি বলব?"

শেয়াল-বৌ বলল, "মাহাতোর কাছে তুমি এক খণ্ড জমি চাইবে। জমিটা যেন ঢালু হয়। ঢালু জমিতে চাষ ভালো হয়। ফসল ফলবে। ফসল আসবে ঘরে। খাবার থাকবে মজুত। ছেলেমেয়েদের জন্য আর ভাবতে হবে না। তুমি কি বল ?"

যুক্তি শেয়ালের বেশ মনে ধরেছে। বৌ যে এত বুদ্ধিমতী তা সে আগে জানত না। মনে মনে বৌকে সে আরও ভালোবাসল। এমন বৌ যার ঘরে তার দুঃখ থাকবে না। শেয়াল খুশি হল।

পরের দিন ভোরবেলা শেয়াল চলল গাঁয়ের পথে। মাহাতোর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সকাল সকাল না গেলে দেখা পাওয়া যাবে না। কাজের লোক। কোথায় হয়তো কাজে বেরুবে। শেয়াল চলেছে খুশি মনে, হালকা পায়ে। বুকে আশা, মনে আনন্দ।

গাঁয়ের মাঝখানে মাহাতোর মস্ত বাড়ি। বাইরে একটা ঘরে মাহাতো সকালে বসে। লোকজনের সঙ্গে দেখা করে, কাজের কথা হয়। শেয়াল ঘরে ঢুকেই মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। বলল, "দাদা আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাই।"

মাহাতো খুশি হল। বলল, "বেশ বেশ। ভাই, সুখে থাক। শরীর ভালো থাকুক। তা বল কিসের জন্য এসেছ ?"

শেয়াল বলল, "শরীর ভালো। সব ভালো। তা এলাম একটা কাজে। একটা আর্জি আছে।"

মাহাতো আনমনা হয়ে মাথা নাড়ল। সে এখন অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শেয়াল নরম গলায় বলল, "আপনার ভাই-বৌ তো এবার মা হতে চলেছে। তা ছেলেপুলে হলে খাব কি ? তখন তো আর দুজন থাকব না ? তাই সে আপনার কাছে পাঠাল। এক খণ্ড জমি চাষ করতে চাই। জমি ধার নিয়ে চাষ করব। আপনার ভাগের ফসল; আপনার পাওনা ঠিকঠাক দিয়ে যাব। জমিতে খুব খাটব, দুজনেই। তাই এলাম।"

মাহাতো এবার হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে বলল, "আচ্ছা ভাই, বলতো বছরের এই সময়ে তোমায় এখন কোন্ জমি বিলি বন্দোবস্ত করি। এখন তো চারা বোনার সময় হয়ে এল। তা নেহাৎই যখন এসেছ, দেখি ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে। তারা কি বলে। এখন তো সবকিছু আর আমি দেখি না। ওরা বড় হয়েছে। যাক, তুমি পরশু এসো।"

আশায় বুক বেঁধে শেয়াল গুহায় ফিরে এল। সব কথা বৌকে জানাল। এই

নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ চলল। আশা যখন দিয়েছে মাহাতো, সুরাহা একটা হবেই। দুজনেই খুশি।

মাহাতোর কথামতো শেয়াল আবার সেদিন গেল। বেশ খুশি খুশি ভাব। প্রণাম জানিয়ে শেয়াল বলল, "দাদা, ছেলেদের সঙ্গে জমির কথা বলেছিলেন? তারা মত দিয়েছে তো?"

মাহাতো মুখে চুক্‌চুক আওয়াজ করে বলল, "এঃ, একেবারে ভুলে গেছি। ভাই তুমি কিছু মনে ক'র না। আচ্ছা, তুমি বরং কালকে এসো।"

শেয়ালের মনটা খারাপ হল। কিন্তু কি আর করবে? ফিরে গেল গুহায়। তবু একেবারে নিরাশ হল না। মাহাতো খুব ব্যস্ত মানুষ, ভুলে যেতেই পারে। সব সময় কি সব কথা মনে থাকে। শেয়াল মনকে বোঝাল।

পরের দিন সকাল হতেই মাহাতো তার চারটে তেজী কুকুরকে ঘরে এনে রাখল। সে যেখানে বসে ঠিক তার ডানদিকে হাতের নাগালের মধ্যে কুকুর-গুলোকে বসিয়ে রাখল। তারপরে বড় বস্তা দিয়ে তাদের সামনে আড়াল দিল। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না, ওখানে কি জিনিস লুকোনো আছে। কুকুরগুলো কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করল। মাহাতো গায়ে হাত বুলোতেই তারা চুপ করে গেল। বড় বাধ্য তারা।

সূর্যের আলো ফুটতেই শেয়াল রওনা দিল। পাহাড়ের কোলে তখনও সূর্যের আগুন। কিন্তু দেরি সইছে না শেয়ালের। বুক বড় কাঁপছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই শেয়াল কাঁপা গলায় বলল, "দাদা, প্রণাম করি। তা ছেলেদের সঙ্গে কথা হয়েছে? ওরা মত দিয়েছে? বৌদি মত দিয়েছে তো?" শেয়ালের দেহে উত্তেজনা, বুকে আশা, চোখে-মুখে কেমন ভয়-ভয় ভাব। হবে তো?

মাহাতো গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, "হ্যাঁ, সলা-পরামর্শ হয়েছে। তা ভাই অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এসো।"

শেয়ালের বুক আরও বেশি কাঁপতে লাগল। চোখ চক্‌চক করে উঠল আশায়। এগিয়ে গেল মাহাতোর কাছে। মাথাটা নুইয়ে এগিয়ে গেল। শান্ত হয়ে বসল। আনন্দে শরীর নাচছে, চোখে জল এসে পড়ছে।

মাহাতো হঠাৎ ডানদিকে সরে বসল। খুব ঝটিতি ডান হাত দিয়ে এক টানে বস্তা সরিয়ে ফেলল। চিৎকার করে উঠল, "চৌরা, ভৌরা, তিল্‌কা, লোধা,—ওকে ধর্।"

চারটে কুকুর জিব্‌-দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেয়াল কেমন ভড়কে

গিয়েছিল। এমন তাড়াতাড়ি আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, শেয়াল বনের পশু। বনে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। স্বভাবই তাই। এক মুহূর্তেই সে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তার তেজী ভাব ফিরে এল। ব্যাপার বুঝেই সে লাফিয়ে উঠল। শরীরটা লম্বা করে প্রস্তুত হল। মাহাতোর বাড়ির দরজা দিয়ে এক ঝলকে একটা তীর যেন বেরিয়ে গেল। সামনেই উঠোন, উঠোনের ওপারেই রাস্তা পেরিয়ে চষা জমি, জমির শেষেই বন। শেয়াল বনের পথে দৌড় দিল। বনের পশু বনের দিকে বর্ষার হাওয়ার বেগে ছুটছে। পেছনে চারটে কুকুরও মরিয়া হয়ে ছুটছে।

বনের আঁকাবাঁকা পথে, তার চেনা পথে, তার চেনা বনে শেয়াল ছুটে চলেছে। পেছনে আর শুকনো পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, মাটি কাঁপছে না। শেয়াল দাঁড়াল। কুকুররা আর আসছে না। ঘরের পোষা কুকুর আদরে মানুষ, তৈরি মাংস খায়। ওরা পারবে কেন বনের শেয়ালের সঙ্গে!

আস্তে আস্তে শেয়াল গুহায় এল। তার পা কাঁপছে, বুক ওঠানামা করছে, জিভ্ বেরিয়ে গিয়েছে, চোখে অন্ধকার। সে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সামনের পায়ে মুখ রেখে হাঁপাতে লাগল। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বৌ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মুখেও কোনো কথা নেই।

একটু শান্ত হয়ে শেয়াল মাথাটা তুলল। ভেজা চোখে বলল, "ও বৌ, কি যুক্তিই দিয়েছিলে। আর একটু হলেই প্রাণ যেত। তা তুমিই বা কি করে এসব শয়তানি বুঝবে! তোমার আর কি দোষ। উঃ, বড় বাঁচাই বেঁচে গেছি। জমি চাইতে গিয়ে আর একটু হলেই মরেছিলাম আর কি! জমির বদলে মাহাতো চারটে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কি শয়তান। আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওদের তো চিনি। যাক্, প্রাণে বেঁচেছি।" শেয়াল আরও কত কি বিড়বিড় করতে লাগল।

শেয়াল-বৌ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কে জানত এমন হবে! ভাবলে বুক কাঁপে। দরকার নেই জমির। এখানে অভাব, তবু ওরা তো নেই। প্রাণের ভয় কম। অনেক নিরাপদ। আর মাহাতোর বাড়ি যেও না। আমাদের চলে যাবে। যেমন করে পারি ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলব। দরকার নেই। এভাবেই চলবে।"

তারপর থেকে শেয়াল আর কোনোদিন চাষ করার কথা ভাবেনি। জমি চায়নি। বনের পশু বনেই থেকেছে।

পিহ্‌মুয়াকি আর তার গান

কি সুন্দর আমাদের লুসাই পাহাড়! কি সুন্দর! আর সুন্দর পাহাড়ের কোলে কোলে আমাদের ছোট ছোট গ্রাম। কি সুন্দর!

তখন তো অন্যরকম ছিল। সেই সময় এইসব গাঁয়ে লুসাই কবি আর চারণেরা কত গান গাইতেন। মন ভরে যেত। সেসব মনমাতানো গান পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হত। সবাই মুগ্ধ হত। অবাক হত। বাইরের কোনো মানুষ তখনও এখানে আসে নি। কোনো সাদা মানুষও সেদিন এখানে আসেনি। এরাও নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও যেত না। নাড়ির টানে আটকে থাকত। সে কি কম কথা! বাঁধন-হারা লুসাই গান আর পাহাড়ের প্রকৃতি, ঝরনার গান আর সবুজ বনভূমি—কোথায় হারিয়ে গেল সেসব।

অনেক অনেক চারণ-কবির কথা আমরা জানি। তাদের ভুলিনি। তবু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম ছিল পিহ্‌মুয়াকির। পিহ্‌মুয়াকিকে কেউ কোনোদিন ভুলবে না। তার গলা ছিল বুলবুলির মত মিষ্টি, ঝরনার মতো মধুঢালা।

ছোট্ট মেয়ে পিহ্‌মুয়াকি। ছোট্ট হলে কি হবে, সবসময় সে গল্প শুনতে ভালোবাসত। বনের পশুর গল্প, মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প, নানান দেশের গল্প, পুরাকালের গল্প, কিংবদন্তি,—দাদু-ঠাকুমারা যে গল্প বলে তাই সে শোনে। এসব গল্প সেই কোন্ ভুলে-যাওয়া কাল থেকে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমারা শুনিয়েছে তাদের নাতি-নাতনীদের, বাবারা শুনিয়েছে ছেলেদের, মায়েরা শুনিয়েছে মেয়েদের। এমনি করে ডালে ডালে পাতায় পাতায় গল্প বয়ে এসেছে। সেসব কি ভোলা যায়? আর আছে গান। কত উৎসবে, কত পুজোতে এসব গান গাওয়া হত, আজও হয়। ভোজের আসরেও গান গাওয়া হত। এই গান এখন আর তেমন শোনা যায় না।

এই গল্পের আসরে, গানের উৎসবে পিহ্‌মুয়াকি থাকবেই। গান শোনার বড় লোভ তার। এসব জায়গায় ছোট্ট মেয়েটি যাবেই যাবে। বছরের অনেক সময় বড় কষ্টে কাটে। কত অভাব, কত দুঃখ। বহু পরিশ্রমেও পেটের দানা জোটে না। কিন্তু সেই সময়? যখন খেতের ফসল ঘরে ওঠে, যখন খামার-গোলা ভরে যায়,—তখন তো কিছুদিনের জন্য আর কোনো ভাবনা

নেই। তখন আর পরের দিনগুলোর কথা কেই-বা ভাবে। ভেবেই বা কি হবে? এ ভাবেই তো চলছে চিরকাল। প্রাণ খুলে তখন শুধুই গান গাওয়া, মন খুলে গল্প বলা। কি আনন্দের সেসব দিন।

অন্য মেয়েরা গাঁয়ের পথে খেলে বেড়ায়, ছেলেরা বনে যায় কাঠ কুড়োতে। সেই কাঠে সর্দারের বাড়িতে ভোজের আসর বসবে। পিহ্‌মুয়াকির কিন্তু এসব ভালো লাগে না। সে খেলে না, দূরে কোথাও যায় না। সে অন্যরকম। বুড়োবুড়িরা গান গাইতে শুরু করলেই সে ছুটে আসে, শান্ত হয়ে পাশে বসে পড়ে, ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে,—গান শোনে। অনেক সময় ধরে তারা গান গায়, ছোট্ট মেয়ে চুপ করে সেসব শোনে। ক্লান্তি নেই।

পিহ্‌মুয়াকি যে গান শোনে, যে গল্প শোনে তাই তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। কিছুই সে ভোলে না, ভুলতে চায়ও না। ওযে তার প্রাণের জিনিস। কত ছোট সে, কিন্তু সে যত গান শিখেছে, সে যত গল্প জেনেছে,—এলাকার কেউ তা জানে না। ছোটরাও জানে না, বড়রাও জানে না। শুধু জানত গাঁয়ের কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি। তাদের অনেক বয়স হয়েছে। তারা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে,—তারা তো অনেক কিছুই জানে।

পিহ্‌মুয়াকি তো আর চিরকাল ছোটটি থাকবে না। দেখতে দেখতে সেও বড় হল, কৈশোর পেরিয়ে সে যুবতী হল। অপূর্ব তার রূপ, অপরূপ তার লাবণ্য। বড় হল কিন্তু ছেলেবেলার স্বভাব তার বদলে গেল না। স্বভাবে সে একই রকম রইল। ছেলেবেলা থেকে সে অনেক গান শিখেছিল, অনেক অনেক কাল আগেকার চারণ কবিদের বিষয়ে সে সব কিছু জানত। তার রক্তে ছিল গান, মনে-প্রাণে সেও চারণ কবি, সে আপনভোলা গায়িকা। তাই বড় হয়েও সে আপনমনে গান গেয়ে বেড়াত,—পাহাড়ে, নদীর তীরে, ঝরনার পাশে, গাঁয়ের পাহাড়ী পথে পথে। আপন খেয়ালে মনের আনন্দে সে গান গাইত, যেমন গায় বনের পাখি।

অনেক গান সে শিখেছে। এবার নিজেই গান বাঁধতে শুরু করল। মনমাতানো সুরের সেসব গান যেন তার কণ্ঠ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসছে। সহজ সুরের সহজ গান। বাঁধন-হারা সেসব গান শুনলে মন যেন কেমন কেমন করত।

মাঠের পথে যেতে যেতে সে গান গাইত। বীজ বুনতে বুনতে নত হয়েও সে গান গাইত। ঝমঝম বৃষ্টির দিনে ধানগাছের গোড়া থেকে আগাছা তুলতে

তুলতে সে গান গাইত, ফসলের গোছা মুঠোয় ধরে কাটতে কাটতে সে গান গাইত। সে বাড়িতেই থাকুক আর আকাশের নিচে খোলা মাঠেই থাকুক,—সে থাকত মনের আনন্দে, সে গাইত গান। এমন গান কবে কে শুনেছে? অনেকেই তার কাছে গান শিখত। মনপ্রাণ ঢেলে সে গান শেখাত। তার শেখানো গান তারা গাইত। তার মিষ্টি সুরের গান এক কণ্ঠ থেকে অন্য কণ্ঠে বইতে বইতে সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। দেশের সবাই গান গাইতে ভালোবাসত। সেই গান তারা গাইত যে গান তারা শিখেছে বুলবুলি পিহ্‌মুয়াকির কণ্ঠ থেকে।

এমনি করে সময় বয়ে যায়। সবার মুখে পিহ্‌মুয়াকির নাম, সবার কণ্ঠে পিহ্‌মুয়াকির গান, সবার হৃদয়ে বুলবুলি পিহ্‌মুয়াকি।

কিন্তু এবার বিপদ ঘনিয়ে এল। মানুষের হিংসুটে স্বভাব এই বিপদ ডেকে আনল। সেই গাঁয়ের যে সর্দার, তার দেহে অসীম শক্তি, সে আগলে রাখে গোটা গোষ্ঠীকে। নির্ভীক সর্দারের দেহে যত শক্তি ছিল, বুদ্ধি তেমন ছিল না। তার ওপরে সে ছিল কিছুটা কান-পাতলা। বিচারবুদ্ধি না থাকলে লোক তো অন্যের কথাতেই বেশি বিশ্বাস করে। হলও তাই।

সর্দারকে ঘিরে ছিল কয়েকজন গাঁওবুড়ো। তারাই সব কিছু পরামর্শ দিত সর্দারকে। চারিদিকে পিহ্‌মুয়াকির নাম। যেখানেই উৎসব হয়, নৃত্য-গীত হয় সেখানেই পিহ্‌মুয়াকির নাম। এতদিন সবাই সব কথায় সর্দার আর গাঁওবুড়োদের কথা বলত। এখন বলে অন্যের কথা। তার ধন-সম্পদ নেই, তার অনেক গোরু-মোষ-মিথুন নেই, তার বাড়িও বড় নয়,—কি আছে তার যে সবাই তার নাম করবে। ঈর্ষা দেখা দিল সর্দারের মনে, ঈর্ষা দেখা দিল গাঁওবুড়োদের মনে। গাঁওবুড়োরা সর্দারের মনে আরও হিংসা জাগিয়ে তুলল। সর্দার হল গ্রামের মাথা, আপদে-বিপদে সেই তো রক্ষা করে গাঁয়ের মানুষকে, সেই তো অসময়ে ধান দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কি করেছে পিহ্‌মুয়াকি গাঁয়ের জন্য? বোকা সর্দার উত্তেজিত হয়, গাঁওবুড়োরা মস্ত উনুনে আরও শুকনো কাঠ জুগিয়ে চলে। আগুন বেড়েই চলে।

কিছুদিনের মধ্যেই সর্দারের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পাহাড়ী বনভূমিতে দাবানল লাগল। গাঁওবুড়োদের সর্দার ডাকল, সর্দারের বাড়িতে গোপনে সলা-পরামর্শ করল। সবাই একমত হল,—এমন পাকা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আর কোনোদিন পিহ্‌মুয়াকি তাদের বিরক্ত করতে না পারে। তার কণ্ঠই সব অনিষ্টের মূল, সেই গানকে চিরকালের জন্য

থামিয়ে দিতে হবে। তারা বড় নিষ্ঠুর। হিংসা তাদের পশুর অধম করে তুলেছে। তারা সব কিছু ঠিক করে ফেলল।

পরের দিন সকাল বেলায় তারা গাঁয়ের মধ্যে মস্ত বড় এক গর্ত তৈরি করল। পিহ্‌মুয়াকি তখন এলোচুলে তার ছোট্ট বাছুরকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিল আর আদরের গান গাইছিল। বাছুর গলা লম্বা করে বিশাল চোখ মেলে পিহ্‌মুয়াকির গান শুনছিল। আশেপাশে পাখিরাও গান গাইছিল। হঠাৎ কয়েকজন গাঁওবুড়ো সেখানে এসে পিহ্‌মুয়াকিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। বাছুরটি হাম্বা করে উঠল, পাখিরা জোরে জোরে কিচির-মিচির শুরু করে দিল। পিহ্‌মুয়াকি তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

তারা তাকে গর্তের কাছে এনে ঠেলে ফেলে দিল গর্তের মধ্যে। গর্ত অনেক গভীর। তারা যখন তাকে টেনে আনছিল তখনও সে গান গাইছে, গর্তের মুখে যখন মাটি চাপা দিচ্ছে তখনও সে গান গাইছে। মাটি পড়ছে, পাথর পড়ছে, গাছের ডাল পড়ছে,—বুলবুলি পিহ্‌মুয়াকি গাইছে। গাইছে আদরের গান, প্রাণের গান। গর্ত ভর্তি হয়ে আসছে, গানও ভেসে আসছে।

শেষকালে গর্ত ভরে গেল। সর্দার আর গাঁওবুড়োরা ভাবল,—যাক্ সব চুকেবুকে গেল। আর ভাবনা নেই। গান থেমে গেল চিরকালের মতো। তারা বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

কিন্তু, না, গান থামল না। তখনও মাটির তলা থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে,ছড়িয়ে পড়ছে উদার আকাশে, সবুজ বনভূমিতে। এ গান আগের চেয়ে মিষ্টি আরও মিষ্টি।

নিষ্ঠুর মানুষেরা তার দেহকে চিরদিনের জন্য মাটি চাপা দিয়ে দিল, কিন্তু গান বন্ধ করতে পারল না। সে গান ভেসে বেড়াতে লাগল দূর থেকে দূরান্তে।

সেই কবেকার কথা। আজও লুসাইরা সবাই পিহ্‌মুয়াকির কথা বলে, বলে তার গানের কথা। গান হল ফুলের মতো,—ফুলকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও তার বীজ নতুনভাবে সুন্দর হয়ে আগামী দিনে আবার ফুল ফোটাবে। পিহ্‌মুয়াকির গানও বেঁচে রইল,—সে যে মানুষের জন্যই গান গাইত। আহ্, পিহ্‌মুয়াকি।

আগুন

মানুষ যখন প্রথম এই পৃথিবীতে এল, মানুষ যখন প্রথম জন্মাল,—তখন মানুষ কেমন করে রান্না করতে হয় জানত না, স্নান করতে জানত না, কাপড় পরতে জানত না। দেহে তাদের কোনোকিছুই থাকত না। তাদের হাত-পায়ের নখগুলো বিরাট বিরাট হয়ে থাকত, কেননা তারা এগুলো কেমন করে কাটতে হবে তা জানত না। তাদের কোনো গ্রাম ছিল না, ঘরদোর ছিল না। পাঁচ-দশজন একসঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। আর ঘন পাতার গাছের নিচে কিংবা কোনো পাহাড়ী গুহায় থাকত।

সেই সময়ে এক বছর খুব খরা হল। সব বাঁশগাছ শুকিয়ে গেল। বাঁশের সবুজ রঙ পালটে গেল, ছালগুলো আপনিই খসে খসে পড়তে লাগল। সে কি অসহ্য গরম কাল! বৃষ্টি নেই, তার নামগন্ধও নেই। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গরমে বাঁশগুলো ফেটে ফেটে যেতে লাগল। প্রচণ্ড বেগে শুকনো হাওয়া বইছে, হাওয়ার তোড়ে বাঁশগুলো এধার-ওধার করছে। একটার সঙ্গে আরেকটার ঘর্ষণ হচ্ছে। চারিদিকে বাঁশের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

হঠাৎ বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। বাঁশগাছ জ্বলছে, অন্য বাঁশগাছে আগুন ছড়াল। বনের সব গাছই শুকনো খরায় শুকনো কাঠের মতো হয়ে রয়েছে। কোনো গাছে রস নেই, শুকনো বাকল চড়্‌চড়্‌ করছে। তাই বাঁশের আগুন অন্য গাছে লাগল। সে গাছ তখুনি জ্বলে উঠল। গোটা জঙ্গল জ্বলছে। লাল আগুন চারিদিকে। দাউ দাউ দাবানল।

বন পুড়ল। শেষকালে একদিন আগুন নিভল। তখন বড় বড় নখওয়ালা সেই মানুষেরা বনের মধ্যে ঢুকল। চারিদিকে পোড়া কাঠ, পোড়া পাতার ছাই। আর চারিদিকে অনেক পশু-পাখি ঝলসে-পুড়ে মরে পড়ে রয়েছে। ছাইগাদার মধ্যে তাদের ঝলসানো দেহ।

একজন মানুষ বলল, 'এগুলো কি? আগে তো কখনও দেখিনি?'

সে সাহস করে একটা পশুর দেহে আঙুল ছোঁয়াল, গরম নরম দেহের মধ্যে নখসমেত তার আঙুল অনায়াসে ঢুকে গেল। আঙুল পুড়ে যাবার মতো অবস্থা। তাড়াতাড়ি আঙুল টেনে বের করে সে ব্যথায় লাফাতে লাগল। আঙুল যেন নিজে নিজেই তার মুখের ভেতর চলে গেল। আঃ। কি সুন্দর

ঠাণ্ডা। মুখে কেমন সুন্দর স্বাদ লাগছে। এ স্বাদ সে তো কখনও আগে পায়নি! আঙুলটা নিয়ে নাকের কাছে ধরল। কি মিষ্টি গন্ধ! এ গন্ধ তো আগে কখনও পায়নি!

আপন মনে মানুষটি বলল, 'এ তো সুন্দর খেতে। গন্ধও বড় ভালো। আগের মতো নয়।'

সে অন্য বন্ধুদের ডাকল। সে যা জেনেছে তা সবাইকে বলল। সবাই অবাক হল। তারপরে সবাই মিলে ঝলসানো পশুর মাংস খেতে শুরু করল। অগুণতি পশু, অল্প মানুষ। সে এক মহাভোজ। সে এক নতুন আনন্দ।

পরের দিন তারা শিকার করতে গেল। অনেক কষ্টের পরে একটা খরগোশ মারতে পারল। আগে হলে তখনই ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে খেতে শুরু করত। কিন্তু গতদিনের মাংস খাওয়ার পরে আর কাঁচা মাংস খেতে চাইল না। তারা খরগোশটাকে ঝলসানোর চেষ্টা করল। দেখাই যাক্ না কি হয়!

তারা খরগোশকে একটা গাছের বাকলের সঙ্গে বাঁধল। সেটা ঝুলিয়ে দিল গাছের একটা নিচু ডালের সঙ্গে। বনে তখনও গাছের অনেক ডাল ধিকিধিকি জ্বলছিল। তারই একটা নিয়ে এসে ঝুলন্ত পশুটার নিচে রাখল। শুকনো পাতা নিয়ে এসে জ্বলন্ত কাঠের ওপরে দিল। দাউ দাউ করে পাতাগুলো জ্বলে উঠল। বাকল পুড়ে গেল, খরগোশটা ধপ্ করে আগুনের ওপর পড়ে গেল। আগুন গেল নিভে। তাকিয়ে দেখে, খরগোশের চামড়ার ওপরের লোমগুলো পুড়ে গিয়েছে, কিন্তু দেহের মাংস একই রকম রয়েছে। খুব খিদে,—কি আর করে? সেই মাংসই তারা খেয়ে নিল।

পরের দিন সেই মানুষগুলো আবার শিকার করতে গেল। অনেক কষ্টে একটা হরিণ মারল। বেশ বড় হরিণ। প্রথমেই তারা পশুটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল। তারপরে মাংসকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটল। তারপরে হরিণের চামড়ায় মাংসের টুক্‌রোগুলোকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। তলায় জ্বালাল আগুন। অনেকক্ষণ পুড়ল। শেষকালে চামড়া খুলে মাংসের টুক্‌রো মুখে দিল। বাঃ, চমৎকার লাগছে। বেশ হয়েছে। দলের সবাই খুব খুশি হল। এবার বুঝেছে ব্যাপারটা।

বুড়ো-মতন একজন বুঝল, তারা তো আগুন জ্বালাতে জানে না। আগুন নিভে গেলে কি হবে? তাই বন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ এনে একটা গর্তের

মধ্যে রেখে দিল। আর তাতে সব সময় শুকনো কাঠ দিতে লাগল। বনের আগুন এখন তাদের নিজের হল। আগুন আছে সবসময়, তাই আর কাঁচা মাংস খেতে হচ্ছে না।

কিন্তু সেই লোকগুলোর কোনো পাত্র ছিল না। তাই তারা পাত্রের মধ্যে মাংস চড়িয়ে রান্না করতে পারত না কিংবা পাত্রের মধ্যে জল ঢেলে ফুটন্ত জলে কোনো কিছু সেদ্ধ করতে পারত না। রান্নার ব্যাপারে চামড়াই একমাত্র সম্বল।

তারা যাযাবর। এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কিছু দেখে। অনেক নতুন কিছু শেখে। জানার আগ্রহও বেড়েছে।

বর্ষাকাল। ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ে। নিচে কাদামাটি। তারা পথ চলে। পায়ের গোড়ালি ডুবে যায় কাদায়। আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকে কাদা। একদিন তারা দেখল, পায়ের আঙুলের কাদা শুকিয়ে গিয়েছে। আঙুলের ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভিজে নরম কাদা শুকিয়ে সাদাটে হয়ে গিয়েছে, আঙুলে ভালোভাবে আটকে গিয়েছে। গুহায় ফিরে এল। বেশ শীত শীত করছে। আগুনের পাশে বসে হাত-পা গরম করে নিচ্ছে। আরে! এ কি! আগুনের তাপ লেগে পায়ের আঙুলের মধ্যে জমে-থাকা কাদাগুলো যে আরও শক্ত হয়ে গেল! আশ্চর্য! হাত দিয়ে কাদা ভাঙতে লাগল।

এক বুড়ো একদিন আগুন পোয়াচ্ছে আর বনের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে ভাবল, 'আচ্ছা, আগুনের তাপ লেগে আঙুলের কাদা যদি এমন শক্ত হয়ে যায়, তবে কাদা দিয়ে তো বেশ পাত্র তৈরি করা যায়। দেখাই যাক্ না।'

সে ভিজে ভিজে কাদা তুলে আনল গর্ত থেকে। তাই দিয়ে তৈরি করল একটা পাত্র। বেশ কয়েকদিন সেই পাত্রকে খোলা আকাশের নিচে রেখে দিল। সূর্যের তাপ পেয়ে পাত্রটি শুকিয়ে উঠল। বেশ শক্ত-পোক্ত হয়েছে।

একদিন পশুশিকার করে এনে সে মাংসকে টুক্‌রো টুক্‌রো করল। পাত্রের মধ্যে অনেকটা জল ঢেলে চাপিয়ে দিল উনুনে। মাংসের টুক্‌রোগুলো ফেলে দিল পাত্রের জলে। তিনটে পাথর দিয়ে সে উনুন তৈরি করেছিল। হঠাৎ পাত্র ফেটে গেল, সে চম্‌কে উঠল। পাত্রের জল ও মাংস উনুনে পড়ল। আগুন নিভে গেল। বুড়ো ভাবনায় পড়ল। পাত্র তো বেশ শক্তই হয়েছিল। তবে? তবে এমন হল কেন? এত কষ্ট করলাম, শেষে ফেটে গেল? আগুন নিভে গেল?

বুড়ো আবার ভাবতে বসল। ভাবল 'সূর্যের তাপ তেমন নয়, ওতে পাত্র শক্ত হবে না। যদি আগুন দিয়েই, আগুন জ্বালিয়েই রান্না করতে হয়,— তবে আগুন দিয়েই পাত্র তৈরি করতে হবে। আগুনের জিনিস আগুনেই তৈরি করতে হবে।' বুড়ো অনেক ভাবল।

এবার বুড়ো আবার ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে মস্ত এক পাত্র তৈরি করল। সেই পাত্র একটু শুকিয়ে এলে তাকে আগুনে দিল। ভালোভাবে পোড়াল। পাত্র কালো হয়ে এল। বেশ শক্ত। আঙুল দিলে কেমন টঙ্ টঙ্ আওয়াজ হচ্ছে। বুড়ো খুশি।

বুড়ো গেল শিকার করতে। অনেক কষ্টে পেল একটা পশু। তার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাত্রের জলে ছেড়ে দিল। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে, টগ্‌বগ্ করে জল ফুটছে। পাত্র ঠিক রয়েছে, ফাটছে না, ভাঙছে না। সুন্দর সেদ্ধ হল মাংস। আঃ, কি আনন্দ! আগুন আছে, বনের পশু আছে,— আর এবার তৈরি হল শক্ত পাত্র। আগুনে দিলে এ পাত্র ফাটে না, ভাঙে না। আঃ, কি সুন্দর স্বাদ এই মাংসের!

সেই তখন থেকে মানুষ শক্ত পাত্র তৈরি করতে শিখল। সেই তখন থেকে আগুন দিয়ে রান্না করে খেতে শিখল।

বনের কুকুর গাঁয়ে এল

আজকে পশুতে পশুতে শুধুই ঝগড়া। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন সব পশুর মধ্যে খুব ভাব-ভালোবাসা ছিল। সে অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন তারা সবাই ভাই ও বন্ধুর মতো বাস করত। সে সব দিন ছিল কত সুন্দর!

সেই কালে এক পাহাড়ী ঢালু জমিতে বসত একটা হাট। সে হাটের নাম লুরি-লুরা। কাছের-দূরের নানা ছোট বড় বন থেকে বুনো পশুরা পাখিরা আসত সেই হাটে। সেই সাত সকালে বসত হাট। সারা দিন ধরে চলত বিক্রি-বাটা। সন্ধ্যের আঁধার নেমে এলে হাট যেত ভেঙে। সবাই গাছের কোটরে, গুহায়, গর্তে ফিরত। সারা দিনে কত খাটুনি, বাড়ি ফিরত ক্লান্ত হয়ে। তবু সেসব দিন ছিল কতই-না আনন্দের!

একদিন নিয়মমতো হাট বসেছে। কুকুরও এসেছে হাটে। সে শুধুই মটরশুঁটি বিক্রি করে। সেদিনও এনেছে তাই। কিন্তু সেগুলো বড় পেকে গিয়েছে। তার ওপরে পথে আসতে আসতে বৃষ্টির জল লেগেছে। সেগুলো কেমন যেন গেঁজিয়ে উঠেছে। কুকুর চিৎকার করে খদ্দের ডাকছে, 'আসুন, আসুন মটরশুঁটি। ভালো মটরশুঁটি। খুব সস্তায়।'

কুকুরের সামান্য একটু মটরশুঁটিও বিক্রি হল না। হবেই বা কেমন করে? ওগুলো যে প্রায় পচে এসেছে। কে কিনবে খারাপ জিনিস? প্রায় পচে-ওঠা শুঁটি থেকে কেমন গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে। কুকুর বড গরিব। বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। সারাদিন হয়তো খাওয়া হয়নি। কেউ আসছে না তার দোকানের সামনে। কুকুরের চোখে জল এল।

পাহাড়ের কোলে সূর্য নেমে যাচ্ছে। রোদ পড়ে বিকেল গড়িয়ে আসছে। মটরশুঁটির পচা গন্ধও তত বেড়ে যাচ্ছে। সারা হাট বিচ্ছিরি গন্ধে ভরে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠছে। আর তো সহ্য করা যায় না। পশুরা ক্ষেপে উঠল। ধেয়ে এল কুকুরের কাছে। এমন পচা জিনিস কেউ হাটে আনে? সবাই কুকুরকে গালাগাল দিতে লাগল। হট্টগোল বেধে গেল। এরই মধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী হিংস্র পশু কুকুরের ঝুড়ি ফেলল উল্টে। রাগে তারা কাঁপছে। কুকুর বাধা দিতে গেল। ছিটকে পড়ল দূরে। তারা পা দিয়ে পচা সব মটরশুঁটি দলে-পিষে নষ্ট করে দিল। তারপরে কুকুরকে হাট থেকে তাড়িয়ে

দিল। আর যেন কুকুর কখনও না আসে হাটে। কুকুর বড় গরিব! তার পক্ষে কেউই কথা বলল না।

কুকুরের খুব মন খারাপ। এমনভাবে অপমান করল! এমন করে সব জিনিস নষ্ট করে ফেলল! বাড়িতে যে তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে! সে ফিরে এল হাটে। নালিশ জানাল বাঘের কাছে। বাঘই হাটের কর্তা। সে পশুদের সর্দার। বাঘের কাছেও তাকে বকুনি খেতে হল। বাঘ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার লজ্জা করে না? আবার এসেছ নালিশ করতে? পশুরা ঠিক কাজই করেছে। পচা গন্ধে তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও? বেরোও এখান থেকে। আবার নালিশ!' বাঘ গর্জন করে উঠল। কুকুরের বুক গেল কেঁপে। পেছনের পায়ের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে কুকুর চলে এল। হাট পেরিয়ে গাঁয়ের পথ ধরল। মনটা যেন কেমন করছে। চোখদুটো ভিজে গেল।

সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে। আধো আঁধারে মুখ নিচু করে কুকুর পথ হাঁটছে। চলেছে বাড়ির পথে। কিন্তু পা যেন তার চলছে না। কেউ একটা ভালো কথা বলল না। হায় কপাল!

এমন সময় সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল! চমকে উঠল। আজ শুধুই সে ভয় পাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে অন্য এক পথ দিয়ে একজন মানুষ আসছে। মানুষটি তাকে দেখে থামল। খুব মিষ্টি গলায় কুকুরকে বলল, 'কি কুকুর! খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে। দুঃখ পেয়েছ নাকি? মনমরা মনে হচ্ছে।'

এমন মিষ্টি সহানুভূতির কথা শুনে কুকুর কেঁদে ফেলল। সে পথিককে সব কথা খুলে বলল,—পশুদের ব্যবহার, অপমানের কথা, বাঘের বকুনি, হাট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া,—সব বলল। পথিক অচেনা, তবু মনের দুঃখ খুলে বলল। এমন আপন করে তার সঙ্গে আজ আর কেউ কথা বলেনি।

পথিক বলল, 'ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। যা হবার হয়ে গিয়েছে। আর দুঃখ করে লাভ নেই। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। চলো আমার সঙ্গে। আমার কাছেই তুমি থাকবে।'

কুকুর রাজি। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চলল মানুষের পিছে পিছে লেজ নাড়তে নাড়তে। তবু মাঝে মধ্যে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হাটের কথা সে

ভুলতে পারছে না। বারবার সে কথা পথিককে বলে ফেলছে।

পথিক এবার আস্তে আস্তে বলল, 'সত্যি, এসব কথা ভোলা যায় না। ঠিক আছে। তোমার তো বেজায় সাহস। তোমাকে আমি এমনভাবে গড়ে তুলব যাতে তুমি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার। ঠিক আছে, তাই হবে। এবার বুঝবে হিংস্র পশুরা।'

কুকুরের দুঃখ মিলিয়ে গেল। মন উঠল আনন্দে নেচে। সে পথ পাবে। অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কুকুর মানুষের পাশে পাশে চলল। শেষকালে এল মানুষের গাঁয়ে, পথিকের বাড়িতে। সুখে দিন কাটতে লাগল।

সেই মানুষটি ছিল সে এলাকার এক মস্ত শিকারী। বনের হেন জায়গা নেই যা সে চেনে না। দূর দূর পাহাড়ী জঙ্গলেও সে শিকার করতে যায়। অসাধারণ সাহসী সে। তার ভয়ে গাঁয়ে কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ঢুকতে সাহস পায় না। তীর, কুঠার আর বর্শা তার সবসময়ের সঙ্গী। আজ থেকে আর এক নতুন সঙ্গী হল। সে সেই কুকুর।

সেদিন থেকে শিকারে যাওয়ার সময় মানুষটি কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে শুরু করল। কুকুরও বেজায় খুশি। সেও বনে বনে ঘুরতে ভালোবাসে। সে তো বনের পশুই ছিল। আরও একটা কারণ আছে,—কুকুর চায় প্রতিশোধ, অপমানের প্রতিশোধ। মানুষটি ধীরে ধীরে কুকুরকে শিক্ষা দিতে লাগল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে কুকুরের সারা দেহে,—সেও সবকিছু চটপট্ শিখে নিতে লাগল। খুব মন দিয়ে সে সবকিছু শিখছে। কিছুদিনের মধ্যেই কুকুর হয়ে উঠল শিকারীর সবচেয়ে যোগ্য বন্ধু, তার একমাত্র সহায়। শিকারী আর কুকুর এক হয়ে গেল।

হাটে হিংস্র পশুরা কুকুরের পচে-ওঠা মটরশুঁটির ঝুড়ি উল্টে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে দলে-পিষে দিয়েছিল। আর মটরশুঁটিগুলি সত্যিই তো পচে গিয়েছিল। সেই পচা গন্ধ লেগে রইল হিংস্র পশুদের পায়ে। চার থাবায় সে গন্ধ চিরকালের জন্য আটকে গেল। আর সেই পচা মটরশুঁটি ছিল কুকুরের নিজের, তাই সে গন্ধ সে খুব ভালোভাবেই চেনে। যেখানেই পশুরা যায়, দেহের সঙ্গে থাকে সেই গন্ধ। কুকুরের অতি-চেনা গন্ধ। তার সঙ্গে রয়েছে

কুকুরের তীব্র ঘ্রাণশক্তি, এটা তার জন্ম থেকেই রয়েছে। দুয়ে মিলে কুকুর হয়ে উঠল হিংস্র পশুদের আতঙ্ক। পশুরা যেখানেই যত ঘন ঝোপ কিংবা পাহাড়ী গুহায় লুকোক না কেন, পথের ওপর মাড়িয়ে-যাওয়া খাবার পচা গন্ধ শুঁকে শুঁকে মুখ নিচু করে তবৃতব্ করে এগিয়ে যায় কুকুর। ঠিক হদিস পেয়ে যায় সেই পশুর। কুকুর এসে থেমে পড়ে ঠিক জায়গায়, একটু দূরে। চোখ তুলে শিকারীকে নিশানা জানিয়ে দেয়। মানুষ তাক্ করে আগের চেয়ে অনেক সহজে সেই পশুকে শিকার করে। একদিন সবাই মিলে গরিব কুকুরকে যে অপমান করেছিল, আজ সে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এই তো হয়! আজ তার আনন্দের দিন।

এমনি করে একদিন বনের পশু দূর বনভূমি ছেড়ে মানুষের কাছে এল, তার সাথী হল। সে হল মানুষের সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। কেনই বা বিশ্বাসী হবে না? মানুষ তো তাকে ভালোবেসেছে, ওদের মত অপমান করেনি।

কিন্তু কুকুর আর কোনোদিন অরণ্যে ফিরে যেতে পারল না। বনের পশুরা তাকে তো আর রেহাই দেবে না? সেদিন থেকে কুকুরও বন ছাড়ল। বনের পশুরাও কুকুরকে দেখলেই আরও ক্ষেপে যায়। কুকুরের জন্যই তাদের এমন দশা। শিকারী কুকুরকে পেয়েই তো এত সহজে মানুষ তাদের শিকার করতে পারে। বনের পশু কুকুর গাঁয়ের হল, মানুষের সঙ্গী হল। আজও তেমনই রয়েছে।

ধনেশ পাখির পালক

অনেক অনেক কাল আগে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। খুব ছেলেবেলায় তার মা মারা যায়। আদরের ছোট্ট ছেলেকে ছেড়ে মা চিরকালের জন্য চলে গেল। বাবা তাকে খুব ভালোবাসত। মায়ের অভাব বুঝতে দিত না বাবা। সেই ছিল ছেলেটির বাবা, ছেলেটির মা। এমনি করে সুখে দিন কাটতে লাগল।

বেশ কিছুকাল পরে বাবা আবার বিয়ে করল। এই সৎ মা কিন্তু মোটেই ভালো ছিল না। ছেলেটাকে দুচোখে দেখতে পারত না। অকারণে ছোট ছেলেকে সৎ মা বেদম মারত, একটুও দয়ামায়া দেখাত না। ছেলেটি কোনো দোষ করেনি, তাই বুঝতে পারত না কেন তাকে মা মারছে! বুঝবেই বা কেমন করে? ও যে বড় ছোট। আর খাওয়া? মা ছেলেকে খেতে দিত আধ-সেদ্ধ যত খাবার। মাংসের ঝোল আর শুধুই হাড় দিত। হাড়গুলোতে একটুও মাংস লেগে থাকত না। তার ওপরে পুরো সেদ্ধ না হওয়ায় ঝোলে-হাড়ে কেমন গন্ধ বেরুত। কি করবে ছোট্ট ছেলে! খিদের জ্বালায় আর মার খাওয়ার ভয়ে তাই খেত। কোনো অভিযোগ করত না, প্রতিবাদ করত না, ছোট ছেলেদের মতো গুঁই গুঁই করত না। সব সহ্য করত। হাসিমুখে যা পেত তাই খেয়ে নিত। বড় ভালো মিষ্টি ছেলে।

বাবার চাখে পড়ে গেলে মা বকুনি খেত। অকারণে কেন বাচ্চা ছেলেকে মারছে? ও-তো কোনো দোষ করেনি? তবে? বাবা মাঝে-মধ্যে বাধা দিত তাই রক্ষে। না হলে বোধহয় ছেলে মরেই যেত। কিন্তু নানা কাজে বাবাকে বাইরে যেতে হয়। তখন? আর ছেলে কখনই বাবার কাছে নালিশ করত না।

তাই একইভাবে চলতে লাগল ছেলেটির কষ্টের জীবন।

এই অল্প বয়স। তবু বাড়িতে সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যেবেলা ছেলেকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। কাজে ভুল হলে কিংবা ঢিলেমি দিলে মায়ের কাছে বকুনি আর মার জুটত। অন্য ছেলেরা কেমন পাহাড়ী ঢালুতে খেলে বেড়ায়,—আর তাকে আটকা থাকতে হয় বাড়িতে। তবু সব কিছু সে সহ্য করে। বড় ভালো ছেলে সে।

আর কিছুদিন পরে মা তাকে পাঠাত অন্যের জমিতে জুমচাষ করতে। পাহাড়ী জমিতে জুমচাষ কত কষ্টের। কি ভীষণ খাটুনি। সারা দুপুর কাজ। তবু মা তাকে খাবার দিত সামান্যই। কাজের ফাঁকে কলাপাতার মোড়ক খুলে সে তাই খেত। এত অল্পে কি পেট ভরে? তার ওপরে ভাত তরকারিতে কেমন ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ। আধ-সেদ্ধ খাবার-গন্ধ খারাপ খেয়েই তাকে থাকতে হত। কি-ই বা করার ছিল তার! শুধু কি তাই? অন্য অনেক ছেলে-মেয়েও জুমচাষে সাহায্য করত। তাদের কত ভালো খাবার। ওদের সামনে কলাপাতা খুলতে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগত। তাই খাওয়ার সময় সে একটু দূরে উঁচু জুম-বাড়ির নিচে বসে খেত। একা একা বসে খেত। মনে কত কষ্ট সে একটু একটু করে খেত। চোখ ভিজে যেত।

প্রথম প্রথম সঙ্গী-সাথীরা কিছুই বুঝত না। পরে তারা সব জেনে ফেলল। তাই মাঝে-মধ্যেই তাকে নিজেদের কাছে ডেকে আনত। নিজেদের খাবার ভাগ করে তাকেও দিত। ওরা তো বন্ধু! বন্ধুর মনের কষ্ট বুঝত। কিন্তু ভালো খাবার খেয়েও তার মনে কোনো আনন্দ হত না। বন্ধুরা দিত, সে খেত কিন্তু মনমরা হয়েই সেগুলো সে খেত। বরং তার খারাপ খাবার একা একা খেতেই সে ভালোবাসত। এতে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। মনে ফুর্তি নেই, ভালো খাবার মুখে রুচবে কেমন করে? খারাপ খাবারেই সে সান্ত্বনা খুঁজে পেত।

একদিন খুব সুন্দর বিকেল। চারিদিকে অপরূপ দৃশ্য, সুন্দর সবুজ পাহাড়ী বন। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। কাজও শেষ। তারা জুম-বাড়িতে বিশ্রাম করছে! একটু পরে সবাই বাড়ি ফিরবে। মনেও আনন্দ। হঠাৎ ছেলেটি বন্ধুদের কাছে তাদের সুন্দর ঝলমলে পোশাক চাইল। সে একবার পরে দেখবে তাকে কেমন লাগে। সে তো কোনোদিন এমন সুন্দর পোশাক পরে নি। খুব ইচ্ছে হয়েছে। তার পোশাক নোংরা, ছেঁড়া, কেমন যেন। আর সেগুলো অনেক পুরনো, রঙ ওঠা, কেমন যেন।

বন্ধুরা তক্ষুণি রাজি। তারা হাসতে হাসতে আনন্দ করে বলল, 'বন্ধু, আমাদের আপন বন্ধু, কি সুন্দর তোমাকে দেখতে। কিন্তু তুমি এমন পোশাক পরে থাক বলে মোটেই ভালো লাগে না। তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে। এমন কি রাজকুমারীও তার ছেলেমেয়ের বাবা হবার জন্য তোমাকে পছন্দ করবে।'

ছেলেটি লজ্জা পেল। বন্ধুরা তাকে পোশাক দিল। নিজেরাই ঠিকঠাক পরিয়ে দিল। আঃ, কি সুন্দর। পোশাক পরে ছেলেটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারপরে আস্তে আস্তে বলল, 'ওঃ, যদি আমার এরকম একটাও পোশাক থাকত, তবে আমি পরবের সময় তোমাদের সঙ্গে নাচতাম। আঃ কি ভালোই লাগত। কি আনন্দ হত।'

বন্ধুদেরও খুব আনন্দ হয়েছে। সবাই তার রূপের প্রশংসা করছে। তারপরে তারা তাকে একটা উঁচু ঢিপির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিল। বন্ধুকে তারা আরও ভালোভাবে দেখতে চায়। বন্ধু ওপরে, তারা একটু নিচে। আঃ, কি সুন্দর লাগছে বন্ধুকে।

ছেলেটি ঢিপির ওপরে দাঁড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধনেশ পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। বনের ওপর দিয়ে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে। ঐ উঁচুতে, ঐ ওখানে। বন্ধু, তোমরা যদি আমাকে এই সুন্দর পোশাকটি দাও, তবে আমি অনেক অনেক দূরে, অনেক অনেক উঁচুতে, সাদা মেঘের দেশে, সবুজ বনের গভীরে ধনেশ পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি। আর পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার পরে যদি আর কখনও তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা না হয়, যদি আর কখনও এই পৃথিবীর মানুষের খুব কাছে না থাকি তবু আমি তোমাদের মনে রাখব। আকাশ-পথে উড়ে যাওয়ার সময় আমার দেহের সবচেয়ে সুন্দর করে রাঙানো পালক আমি উড়িয়ে দেব, তোমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নাচের আসরে যাবে। চুলে পরবে, মাথায় গুঁজবে, পোশাকে লাগাবে। আমার দেহের সবচেয়ে সুন্দর পালক। তোমরা জানবে, আমি আর কোনোদিন তোমাদের একজন হয়ে তোমাদের পাশেপাশে নাচের আসরে যেতে পারব না, তোমাদের কাছের সঙ্গী হব না! কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আবার কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাব। তখন তোমরা আমার ডানাদুটোর আওয়াজ শুনতে পাবে, সে আওয়াজ মিষ্টি গানের মতো। ডানার শব্দে মিষ্টি গান ভেসে আসবে।'

এই কথা শুনে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা বন্ধুরা অবাক হল। বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? এ বেদনা তারা ভুলবে কেমন করে? কয়েকজন হাহাকার করে উঠল। এ বিচ্ছেদ, এ বেদনা মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু তাদের মধ্যেই কয়েকজন বলল,—বন্ধু পাখি হয়ে উড়ে যাক! ধনেশ পাখি হয়ে দূর পাহাড়ে মিলিয়ে যাক। সেই ভালো, সেই ভালো। সে হোক সবুজ বনের সুখী ধনেশ পাখি। নিত্যদিনের যাতনা থেকে এ অনেক ভালো। এক নিষ্ঠুর মা রয়েছে তার বাড়িতে, সৎ মা, বন্ধুর সুন্দর জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। তিল তিল করে নিষ্ঠুরতা তো আর কেউ সহ্য করেনি! ওর মনের ব্যথা কেউ বুঝবে কেমন করে? সেই ভালো। বন্ধু ধনেশ পাখি হয়ে উড়ে

যাক। আমাদের কষ্ট হোক। ওর আর কষ্ট থাকবে না। বনের সবচেয়ে সুস্বাদু মিষ্টি ফল ও খাবে, পচে-ওঠা ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ-মাখা খাবার ওকে আর খেতে হবে না। ও হবে সুন্দর ধনেশ পাখি। বনের পাখিদের রাজ্যে ধনেশ হবে পাখির রাজা। সর্বশ্রেষ্ঠ পাখি। দূর আকাশের, সবুজ বনের, পাহাড়ী বনের পাখি। তাই হোক। ছেলেটি জল-ভরা চোখে ওদের বিদায় জানাল। হাত তুলে বিদায় জানাল। তারপরে সুন্দর পোশাকে-ঢাকা হাতদুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল, ডানার মতো মেলে ধরল। ডানার মতো করে হাতজুটো নাড়তে লাগল, টিপি ছেড়ে ওপরে উঠল। ডানা মেলে ধনেশ পাখি হয়ে সাদা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। দিন যায়, রাত আসে। সময় বয়ে যায়। হঠাৎ একদিন হিমেল হাওয়ার বিকেলে একটি ধনেশ পাখি উড়ে এল সেই পাহাড়ী গাঁয়ে। বন্ধুরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখেই দৌড়ে এল খোলা আকাশের নিচে, মাঠের ওপরে, সেই টিপিটার কাছে। হাত তুলে তারা চিৎকার করে বলল, 'ধনেশ পাখি, তুমি কি আমাদের সেই অতি-চেনা বন্ধু? তোমাকে আজও আমরা ভুলতে পারি নি। কোনোদিন ভুলবও না। সব সময় মনে পড়ে তোমার কথা। যদি সত্যিই তুমি আমাদের সেই বন্ধু হও, তবে তোমার দেহের সুন্দর একটা রাঙানো পালক আমাদের দাও। তোমার উপহার।'

হঠাৎ ধনেশ পাখির দেহ থেকে সবচেয়ে সুন্দর একটি পালক খসে গেল, ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল পালক। পালক এসে পড়ল বন্ধুদের মাঝখানে। রাঙানো পালক। অপরূপ পালক। ওপরে ডানার শব্দে মিষ্টি গান ভেসে আসছে।

অনেক মানুষের মধ্যে সেই মাঠে ছেলেটির সৎ মাও এসেছিল। সেও তাকিয়ে রয়েছে ওপর দিকে। উপহার দেখে সৎ মা বলল, 'ও আমার সোনার ছেলে, আমি তোমার মা, আমাকেও একটা রাঙানো পালক দাও। তোমার উপহার।'

ধনেশ পাখি মায়ের মাথার ওপরে ডানা মেলে স্থির হয়ে রইল। দেহ থেকে কিছুটা নোংরা ফেলে দিল নিচে। তা সোজা এসে পড়ল মায়ের চোখে মা চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। এই সুন্দর সবুজ পৃথিবী সাদা আকাশ, পাহাড়ী বন তার চোখ থেকে মুছে গেল।

পালক-হাতে বন্ধুরা নিচে হাত নাড়ছে, সাদা মেঘের ভেলায় ধনেশ পাখি ডানা মেলেছে, মিষ্টি গান ভেসে আসছে,—ডানার গান, বন্ধুর গান।

বিচিত্র-রঙা ময়ূর-ময়ূরী

সেই পুরনো কালে আচিক্ আসোঙ-এ আসোঙ-দের মধ্যে এক মস্ত ধনী সর্দার বাস করতেন। তার ছিল অগাধ সম্পত্তি আর একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে। এই মেয়েই তার একমাত্র সন্তান। এই আমাদের জনগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক। এই সমাজের নিয়ম অনুসারে সেই মেয়েই হল সবকিছুর উত্তরাধিকারী। সেই পাবে সব। বাবার পরে মেয়েই পাবে সব।

মেয়ে বড় হল। আরও হল রূপসী। অমন রূপ কেউ দেখেনি। তার বিয়ে ঠিক হল তারই এক ভাইয়ের সঙ্গে। বাবার দিকের এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে। ছেলেটিও খুব সুন্দর দেখতে। একদিন দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

অনেক কিছুই পেল মেয়ে। ধনী সর্দার তার মেয়েকে সব দিল। আর সেইসঙ্গে মেয়েকে দিল আর একটি মহা মূল্যবান বস্তু। এক টুকরো রেশমী কাপড। খুব অদ্ভুতভাবে বোনা এই রেশমী কাপড়, চিত্র-বিচিত্র নকশায় বোনা এই রেশমী কাপড। শুধু যে অদ্ভুত ও সুন্দরই এই কাপড়, তা নয়। এ এক যাদু রেশমী কাপড়। এ কাপড দিয়েছিলেন একজন দেবী। এ কাপড় দেবী প্রথম দিয়েছিলেন সর্দারের বৌয়ের ঠাকুমার মায়ের মাকে। তখন থেকেই এই কাপড় পরিবারের এক মহারত্ন। এটা এতদিন ছিল সর্দারের কাছে। সর্দার আদরের মেয়েকে এই মহারত্ন বিয়ের সময় উপহার দিলেন। মেয়ে-জামাই পেল যাদু রেশমী কাপড়।

কেন মহারত্ন এই রেশমী কাপড়? দেবী বলেছিলেন, এই যাদু রেশমী কাপড হাত দিয়ে ছোঁয়ার আগে একটা বিশেষ মন্ত্র পড়তে হবে। যখনই স্পর্শ করবে, তখনই আগে মন্ত্র পড়ে নিতে হবে। যদি কেউ ছোঁয়ার আগে মন্ত্র পড়তে ভুলে যায়, তবে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পাখি হয়ে যাবে, রেশমী কাপড়টি হবে তার পুচ্ছ, তার পালক, তার ডানা। এ নিষেধ অমান্য করলে তাকে পাখি হতেই হবে।

মেয়ে ছেলেবেলা থেকে দেখছে এই কাপড়। রেশমী কাপড়। যাদু রেশমী কাপড়। বাবা-মা তাকে ছেলেবেলা থেকেই মন্ত্র শিখিয়েছে,—বহুবার সে মন্ত্র পড়েছে, কাপড় স্পর্শ করেছে। বারবার করতে করতে মেয়ের কখনও ভুল হয় না, কাপড় স্পর্শ করার আগে মন্ত্র পড়তে ভুল হয় না। তাই মন্ত্র পড়ে ইচ্ছেমতো যখন-তখন সে রেশমী কাপড়ে হাত দিতে পারে। কখনও ভুল হয়নি।

নতুন জামাই কিন্তু এসব কিছুই জানে না। সে অনেকবার দেখেছে এই কাপড়। কিন্তু এ যে যাদু কাপড়, মহামূল্যবান কাপড়, তা সে জানে না। সে ভাবে, অতি সাধারণ একটি কাপড়, শুধু দেখতেই সুন্দর। পুরনো জিনিস, বাবা মেয়েকে আদর করে দিয়েছে।

বাবা বুড়ো হলেন, মা বুড়ি হলেন। একদিন বাবা-মা মারা গেলেন। মেয়ে বড় কাঁদল। কত সুখের স্মৃতি। কত আদর। এখন মেয়েই হল বাড়ির কর্ত্রী, গৃহিণী। একমাত্র উত্তরাধিকারী। সবই এখন মেয়ের হল। তাই যে নিয়ম।

একদিন বেশ রোদ উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। মস্ত উঠোনে মেয়ে সেই রেশমী কাপড় মেলে দিয়েছে। রোদ লাগা দরকার। অনেকদিন রোদে দেওয়া হয়নি। তারপরে স্বামীকে ডেকে বলল, 'এই কাপড়টা রোদে মেলে দিলাম। তুমি এটা ছোঁবে না। যদি ঝমঝম বৃষ্টি নামে, যদি ঝড়ে গাছ থেকে আঙুর পড়ার মতো শিলাবৃষ্টিও হয়, বৃষ্টিতে চারদিক যদি সাদাও হয়ে যায়, —তবু তুমি কিন্তু এই কাপড়ে হাত দেবে না। ভুলেও হাত দিও না। মনে থাকবে তো? এই রেশমী কাপড় ছোঁবে না।' স্বামী মাথা নাড়ল।

মেয়ে গেল পাশের এক ছোট নদীতে। মেয়ে গেল চিংড়ি ধরতে পেছন ফিরে স্বামীকে আর একবার নিষেধ করে সে পাহাড়ী ঢালুতে নেমে গেল।

পাহাড়ী মেঘ বড় অদ্ভুত। এই ছিল টন্‌টনে রোদ। হঠাৎ দূর থেকে কালো মেঘ বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে এল, ঘনিয়ে তুলল আকাশকে। কালো হয়ে উঠল চারিদিক। দেখতে দেখতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, —মুহূর্তেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। সে কি বৃষ্টি!

দাওয়ায় বসে ছিল স্বামী। সে দেখছে বৌ আসছে কিনা। সে তো ছোঁবে না রেশমী কাপড়, তুলবে না সেই কাপড়। কিন্তু এদিকে যে বৃষ্টিতে সব দিক ভেসে যাচ্ছে, উঠোনে জলের ধারা। কাপড় ভিজে চুপসে গিয়েছে। তবু তো বৌয়ের দেখা নেই! সে উতলা হয়ে উঠল। চিৎকার করে বৌকে ডাকতে লাগল। মাটিতে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে, গাছের ডালে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে, —চারিদিকে বৃষ্টির একটানা শব্দ। বৌ শুনবে কেমন করে? স্বামী আরও উতলা হল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল সে। এবার বৌ শুনতে পেয়েছে। স্বামীর এমন উতলা গলা শুনেই বৌ রওনা দিল বাড়ির পথে। কিন্তু পাহাড়ী পথ বড় পেছল, সাদা বৃষ্টি, চোখে ভালো ঠাহর হয় না। তাড়াতাড়ি আসবে কেমন করে বৌ?

বৌ তবু চলে এসেছে উঠোনের খুব কাছে। বৃষ্টিতে স্বামী তাকে দেখতে পেল না। সুন্দর কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেল। স্বামী ভুলে গেল নিষেধের কথা, বৌয়ের নিষেধের কথা। সে এমন উতলা হয়ে উঠল যে কোনো কিছুই তার মনে পড়ল না। দাওয়া থেকে ঝড়ের বেগে নেমে এল উঠোনে। বৃষ্টির মধ্যে। নামবেই বা না কেন? এধারে যে শিলাবৃষ্টিও শুরু হয়েছে উঠোনে নেমেই স্বামী এক টানে তুলে আনল সেই যাদু রেশমী কাপড়। সে তো মন্ত্রের কথা কিছুই জানে না। কাপড়ে হাত লাগা মাত্র স্বামী পাখি হয়ে গেল। বিরাট পাখি, সুন্দর পাখি, বিচিত্র-রঙা পাখি। পুরুষ পাখি। দেহে রঙের কি বাহার!

উঠোনে পৌছল বৌ। চমকে উঠল। তার সামনে স্বামী নেই, —একটি অতি সুন্দর, বিচিত্র-রঙা বিরাট পাখি। তার দিকে অবাক চোখে পাখি চেয়ে রয়েছে। এ কি হল? মেয়ে ভুলে গেল সবকিছু। ভুলে গেল মন্ত্রের কথা। মন্ত্র না পড়েই সে ছুঁয়ে ফেলল যাদু রেশমী কাপড়। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে মেয়ে। হায়! হায়! হায়! মেয়ে বলে উঠল, 'এ কি করলাম? তুমি একি করলে? আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। হায়!'

মেয়েও আর মেয়ে রইল না। সেও হয়ে গেল পাখি। বিরাট পাখি, সুন্দর পাখি, বিচিত্র-রঙা পাখি। দেহের পালকের কি বাহার! সেও পাখি হল, মেয়ে পাখি।

এই স্বামী-পাখি আর বৌ-পাখিই হল ময়ূর-ময়ূরী। তারা আর মানুষ রইল না। কিন্তু একদিন তারা স্বামী ছিল, বৌ ছিল। বড় সুখের সংসার।

ময়ূরের দেহের পালক, পুচ্ছ, ডানা বেশি রাঙানো, বেশি চিত্রবিচিত্র, বেশি সুন্দর। কেন না, যাদু রেশমী কাপড়ের বেশি অংশ থেকেই ময়ূরের জন্ম। বৌ এসেছিল পরে, তাই ময়ূরীর পুচ্ছ ময়ূরের মতো বড় নয়। দেহের রঙের অমন বাহার নেই। হায় ময়ূর! হায় ময়ূরী!

আজও যখন আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকায়, কাল্‌চে মেঘের আনাগোনায় চার-দিক থম্‌থম্ করে ওঠে, —ময়ূর ময়ূরীরা তখন উতলা হয়ে ওঠে, ভয়ে কেমন চিৎকার করে ওঠে, গলা তুলে ডেকে ওঠে। ঐ বুঝি বৃষ্টি আসছে, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি! আর সেই বৃষ্টিতে তাদের দেহের বিচিত্র-রঙা পোশাক যদি নষ্ট হয়ে যায়? তাহলে?

হাঃ হাঃ দুই কান কাটা

কোনো এক সময় এক গাঁয়ে দুই ভাই বাস করত। তারা দুজনেই অন্ধ। অন্ধ হলে কি হবে, তারা ছিল খুব সুখী। কেননা তারা ছিল বেজায় পরিশ্রমী। কোনো কিছু তারা দেখতে পেত না, কিন্তু তারা সুখী ছিল। কেননা, তাদের জীবন ছিল সহজ-সরল। সব সময় তারা কিছু না কিছু কাজ করত। তারা সুখী।

একদিন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সারা দিন ধরে তারা নিজেদের জমিতে জুম চাষ করেছে। বেশ ক্লান্ত তারা। ক্লান্ত দেহে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে রওনা দিল। আহা! তারা তো খুব জোরে জোরে হাঁটতে পারে না! মহা আনন্দে তবু তারা পথ চলছে। তাদের দেখেই মনে হয়, তাদের বড় আনন্দ।

সেই সময় তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক পথিক। পথিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা এত খুশি খুশি কেন? ব্যাপারটা কি"?'

তারা বড় সহজ-সরল। তারা জানাল, মাঠে একটা মৌচাক পেয়েছে। মধু টস্‌টস্‌ করছে। মধু-ভরা মৌচাক। আনন্দ হবে না? কতদিন তারা মধু খায় না। অতি উৎসাহে তারা কাঁধের ঝুলি থেকে কলাপাতায় জড়ানো মৌচাক বের করল। কলাপাতা খুলে ফেলল। পথিককে মৌচাক দেখাল। কি যে আনন্দ মনে! মধু-ভরা মৌচাক।

পথিক বলল, 'হ্যা, খুশি হওয়ার মতোই মৌচাক বটে।মধুভর্তি মৌচাক। আনন্দ তো হবেই।'

ভাই দুজন বলল, 'ঠিক বলেছ। তা হাতে নিয়ে পরখ করেই দেখ না কেমন মৌচাক পেয়েছি।'

ভাই দুজন বড় সরল। মনে কোনো সন্দেহ নেই। আর তারা যে অন্ধ! সন্দেহ করবেই বা কেন?

পথিকের লোভ হল। হাতে নিয়ে দেখে সুন্দর মৌচাক। অন্ধ ভাই দুজনের সরলতার সুযোগ নিয়ে, অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি মৌচাকটা তার ঝুলিতে ঢুকিয়ে নিল। পাশে পড়ে ছিল প্রায় শুকিয়ে-ওঠা এক তাল গোবর। তাই তুলে নিয়ে এক ভাইয়ের হাতে দিল। ভাই কলা-পাতায় জড়িয়ে ঝুলিতে রেখে দিল সেই শুকনো গোবরের তাল। আহা!

তারা জানেও না কি হয়ে গেল এক মুহূর্তে! পথিক অন্য পথে চলে গেল। তারা ধরল বাড়ির পথ। আনন্দে বুক নাচছে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে তাদের দুজনেরই বড় খিদে পেল। সেখানে এক গাছতলায় তারা বসল। অত বড় মৌচাকের কিছুটা করে মধু তারা এখন খাবে। কলাপাতার মোড়ক খুলতেই কেমন বিশ্রি গোবরের গন্ধ তাদের নাকে ঢুকল। এক ভাই বলল, 'এঃ, পাশেই কোথাও গোবর রয়েছে। খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে।'

অন্য ভাই সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। আর একটু দূরে গিয়ে বসি।'

তারা এর পর বেশ কয়েকবার এখানে-ওখানে বসল, কিন্তু সব জায়গাতেই গোবরের বিশ্রি গন্ধ। কি আর করে দুজনে। ভাবল, আজকে এই রাস্তার সবখানেই গোবর রয়েছে। কি আর করা! এর মধ্যেই মধু খেতে হবে। যাকৃগে, মধু খেলে আর ওসব বাজে গন্ধ পাওয়া যাবে না। শেষকালে এক জায়গায় দুজনে বসল। এবার মৌচাক ভেঙে মধু খাবে।

কলাপাতা-জড়ানো' মৌচাক খুলল। দু-টুকরো দুজনে ভেঙে নিল। মুখে পুরে দিল। ওয়াক থুঃ। তাদের বমি উঠে এল। মধুতে এ কি বিশ্রি গন্ধ? গোবরের গন্ধ। বারবার থুথু ফেলতে লাগল। মুখের চেহারা অন্য-রকম হয়ে গেল। একটু পরে দুজনের চোখে জল এল। তারা সরল, তারা দেখতে পায় না। তারা অন্ধ। তাদের এভাবে কেউ ঠকায়? হায়! কপাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে তারা ঘাসের ওপরে বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। এবার ধীরে ধীরে তাদের দুঃখ ঘুচে গেল, রাগে ফেটে পড়ল তারা। অপমানের প্রতিশোধ চাই। তাদের সারল্য ও অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে যে পথিক এভাবে ঠকাল, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তাকে শাস্তি দিতেই হবে। তাদের অপমান করল, মধু খাওয়াও হল না। পথিক এতবড় ঠগ, এতবড় নিষ্ঠুর!

দুজন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল। একমত হল। পথিককে এ পথেই তার বাড়ি ফিরতে হবে। তারা অপেক্ষা করবে। দুজনে রাস্তার দুপাশে ঝোপে লুকিয়ে থাকবে। বেশ আঁধারও হয়ে এসেছে। দুদিকে লুকিয়ে থাকার সুবিধাও অনেক। দুদিক থেকে তারা পথিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাতে ছুরি বাগিয়ে দুজন দুদিকের ঝোপে লুকিয়ে পড়ল।

অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসছে না। তবু অপেক্ষা করতেই হবে। হঠাৎ রাস্তার পাশের এক ঝোপে খস্‌খস আওয়াজ হল। দুজনে সতর্ক হল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ দুজনে চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান! এবার তোমাকে পেয়েছি। এবার পালাবে কোথায় ?'

লাফিয়ে পড়ল সামনে। দুজনেই। একজন রাগে বলে উঠল, 'তোমার কল্‌জে ছিঁড়ে নেব। এই ছুরিতে তোমার বুক দুফাঁক করে দেব। শয়তান কোথাকার!'

দুজনেই পথিকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল মারামারি।

আসলে শব্দটা ঠীকই হয়েছিল। কিন্তু সে শব্দ পথিকের পায়ের নয়। একটা গোরু ঘাস্‌ খাচ্ছিল। ঝোপের পাতা মুখ দিয়ে টানতেই অমন খস্‌খস আওয়াজ হয়েছিল। আহা! ওরা যে অন্ধ! অতশত বুঝবে কেমন করে? ওরা যে চোখে দেখে না।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন আর একজনের ওপর। এ ভাই ভাবল, —এই তো পথিক। ও ভাই ভাবল, —এই তো পথিক। তারা কিছুই জানল না, এক ভাই আর এক ভাইকে পথিক ভেবে আক্রমণ করে বসেছে। দুজনেই একে অপরকে শয়তান পথিক ভাবছে। হায়! কপাল! লাথি মারছে, কিল মারছে, চুল ধরে টানছে আর ছুরি চালাচ্ছে। তারা অন্ধ, তাই অধিকাংশ ছুরির আঘাতই তাদের গায়ে লাগছে না, ফস্‌কে যাচ্ছে। ছুরি হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করছে। নইলে কি যে হত! আহা, বেচারী অন্ধ দুভাই কি করছে তা তারা জানে না, কেননা তারা দেখতে পায় না।

শেষকালে পথিক মরে পড়ে গেল না। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশি রাগ হলে শরীর ক্লান্ত লাগে। তার ওপরে এতক্ষণ মারামারি। ভাবল, খুব উচিত শিক্ষা দিয়েছে পথিককে।

বুক ওঠানামা করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। সারা দেহ ঘামে ভিজে গিয়েছে। দুজনে পাশাপাশি ঘাসে বসে পড়ল। নাঃ, পথিক দুজনের হাত ছাড়িয়ে শেষকালে পালিয়েছে। মরে নি, কিন্তু খুব বুঝেছে মজা। টের পেয়েছে কাকে বলে মার! নিষ্ঠুরতার জবাব পেয়েছে। তাদের হাতে যে মার খেয়েছে, তাতে পথিক কোনোদিন দুভাইকে ভুলতে পারবে না।

এক ভাই হাঁপাতে হাঁপতে বলল, 'ভাই, আমার কিন্তু তেমন কিছু আঘাত লাগে নি। শুধু শুয়োরটা আমার একটা কান কেটে নিয়ে গিয়েছে। অবশ্য

আমিও ছাড়ি নি, আমিও তার একটা কান কেটে রেখেছি। আমার হাতেই রয়েছে সেই কান। তোর খুব লাগেনি তো?'

অন্য ভাই অবাক হয়ে বলল, 'আরে! অবাক কাণ্ড। শুয়োরটা আমারও একটা কান কেটে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমিও ছাড়ি নি। তারও একটা কান কেটে রেখেছি। এই তো সেটা আমার হাতে। মজাটা বুঝেছে শয়তান।'

দুজনের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটায় তারা অবাক হয়েছে। অল্পক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপরে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল বড় ভাই। সে কথা বলল।

ক্লান্তি অনেক কেটেছে। শান্ত হয়ে খুশি মনে বড় ভাই বলল, 'খুব ভালো কথা। আমাদের অবস্থা খারাপ, কিন্তু শয়তানটার আরও খারাপ। আমাদের গিয়েছে একটা করে কান। আর ওর খোয়া গিয়েছে দুটোই। ওটা এখন দুকান কাটা। এখন থেকে আমরা চুল বড় রাখব। তারপরে একপাশে সিঁথি করে চুলটা অন্যধারে নামিয়ে দেব। ব্যাস, কাটা কান ঢাকা পড়ে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না, আমাদের একটা কান নেই। কিন্তু ঐ শুয়োরের বাচ্চা শয়তানটা তো আর দুদিকে চুল নামিয়ে দিতে পারবে না? ওর দুকান কাটাই দেখা যাবে। সবাই ওকে কানকাটা বলে ডাকবে। গাঁয়ে যখন ফিরবে, সবাই ওকে ঐ নামে ডাকবে। ওর পরিচয় হবে কানকাটা। সবাই ঠাট্টা করবে, হাততালি দিয়ে ক্ষেপাবে। কেমন মজা হবে বল্! আমাদের ঠকানো? আমাদের পেছনে লাগা? এই কষ্ট নিয়েই ওকে সারা-জীবন কাটাতে হবে। রেহাই নেই, কান ঢাকার উপায় নেই। ওর নিষ্ঠুর কাজের যোগ্য জবাব পেয়েছে। কি বল্ ভাই?'

এই জ্ঞানের কথায় দুজনে প্রাণভরে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। কেমন মজা! এবার টের পাবে। দুজনেই খুব খুশি হল। দুজনেই পথিকের দুটো কান কেটে নিতে পেরেছে। একজন একটা, আর একজন আর একটা। মনের সব দুঃখ, সব অপমান ঘুচে গেল। আর কোনো ব্যথা-বেদনা মনে নেই। দুজনেই খুশি।

লাফিয়ে উঠল পায়ের ওপরে। হাঁটা দিল বাড়ির পথে। হেলে-দুলে আনন্দে হাঁটছে। মনে আজ বড় ফুর্তি। শত্রুকে জব্দ করতে পেরেছে! অন্ধ হয়েও প্রতিশোধ নিতে পেরেছে।

পথে হাঁটছে আর বারবার বলছে, —ওঃ, কানকাটা পথিক। হাঃ হাঃ হাঃ! একটু পরে পরেই বলছে আর প্রাণ খুলে হাসছে। ওঃ, কানকাটা পথিক। হাঃ হাঃ হাঃ। বলছে আর হাঁটছে, হাঁটছে আর বলছে। দুজনে চলেছে বাড়ির পথে। আনন্দে।

সিঁথির সিঁদুর

শীতকালে এক পরবের সময় খুব নাচ গান হচ্ছে। খুব জমে উঠেছে নাচের আসর। সেই আসরে নাচতে নাচতে চারজনের মধ্যে খুব ভাব হল, তারা সেদিন থেকে বন্ধু হয়ে উঠল। চারজন চারজনকে খুব ভালোবাসত। এক সঙ্গেই তারা থাকত। মনের বড় মিল।

চার বন্ধুর একজন সিঁদুর বিক্রি করত, একজন তাঁতে কাপড় বুনত, একজন কাঠের মিস্ত্রি, আর একজন সোনার গয়না তৈরি করত। সবাই সবার কাজে খুব পাকা।

একদিন তারা পরামর্শ করল, 'ভাই এখানে আর খুব সুবিধে হচ্ছে না। চল, দূর দেশে যাই। যেখানে ভালো কাজ জুটবে, সেখানেই চারজনে মিলে-মিশে থাকব।' সবাই রাজি হল। যে যার যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে রওনা হল।

অনেক দিন ধরে তারা পথ হাঁটছে। সুবিধে মতো জায়গা এখনও মেলেনি। আরও এগোতে হবে। এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন তারা এক জঙ্গলে এসে থামল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একে জঙ্গল, তার ওপরে অচেনা পথ। তাই সেখানেই রাতটা কাটাতে হবে। একটা ঘন আমগাছ দেখে তারা তলায় বসল। আরও অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ঘন বন। কোথায় কি আছে তারা জানে না। কি জানোয়ার আছে তাও জানা নেই। সবই অচেনা। তাই সবাই যদি একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে বিপদ হতে পারে। সেটা ঠিক হবে না। তাই পালা করে জেগে থাকাই ভালো। চারজনেই জাগবে, একেক জন কিছুক্ষণ করে জাগলেই রাত কেটে যাবে। যে জেগে থাকবে, সে ভালোভাবে নজর রাখবে। সেই ভালো চারজনে রাজি হল।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। তারা বলল, 'ভাই ছুতোর, প্রথম রাতে না হয় তুমি-ই জেগে থাক! কি রাজি তো?'

ছুতোর বন্ধু বলল, 'এ আর বেশি কি? একজনকে তো জাগতেই হবে! দেরি না করে তোমরা তিনজনে ঘুমিয়ে পড়। আমি জাগছি।'

একা জেগে রয়েছে ছুতোর। অন্য সবাই ঘুমোচ্ছে। চারদিকে চুলের মতো কালো অন্ধকার। কতক্ষণ আর এমনি করে বসে থাকা যায়? বড় একঘেয়ে লাগছে। সে মনে মনে বলল, 'এভাবে কাজ না করে কতক্ষণ বসে থাকব? তার চেয়ে একটু কাজ করি। একঘেয়েও লাগবে না, ঘুমও আসবে না।'

সে থলি থেকে বাটালি বের করল, এক টুকরো কাঠ নিল। তারপরে টুক্‌টুক্ করে বাটালি চালিয়ে কাঠ খোদাই করতে লাগল সে একটা সুন্দরী মেয়ের পুতুল তৈরি করল। বেশ হয়েছে। পুতুলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে

এবার তার পালা শেষ হয়েছে। সে স্বর্ণকারকে ডেকে তুলে বলল, 'ভাই, এবার নাহয় তুমি-ই জেগে থাক। আমি এবার ঘুমোই।' স্বর্ণকার উঠে বসল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বড় একঘেয়ে লাগছে। এধার-ওধার চাইতেই সে পুতুলটিকে দেখতে পেল। বাঃ, কি সুন্দর পুতুল। কিন্তু এ কি? গায়ে যে একেবারেই কোনো গয়না নেই! এতে কি মেয়েদের মানায়!

সে কাজে লেগে গেল। বের করল হাপর, কাঠ-কয়লা, জলের পাত্র। লেগে গেল কাজে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি, পায়ের ঘুঙুর আর চুলের টিক্‌লি বানিয়ে ফেলল। পুতুলকে পরিয়ে দিল। বাঃ বেশ লাগছে। এবার ঠিক মানিয়েছে।

তার পালা শেষ হল। সে তাঁতি বন্ধুকে ডেকে তুলল। বলল, 'ভাই, এবার নাহয় তুমিই জেগে থাক। আমি ঘুমোই।'

তাঁতি উঠে বসল। জেগে রইল। বড় একঘেয়ে লাগছে। চোখে ঘুম। এধার-ওধার চাইতেই গয়না-পরা পুতুলকে দেখতে পেল। বাঃ সুন্দরী মেয়ে পুতুল। কিন্তু এ কি! দেহে কাপড় নেই কেন? শাড়ি না পরলে মানায়? শাড়ি হলেই আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে। সুন্দরী লাগবে।

ভাবা মাত্রই সে কাজে লেগে গেল। বের করল তাঁত আর সুতো। শাড়ি বুনতে শুরু করল। শেষ হল সুন্দর একটা রঙ-বেরঙের শাড়ি। পুতুলকে পেঁচিয়ে পরিয়ে দিল সেই শাড়ি। বাঃ, এতক্ষণে মানিয়েছে। তৃপ্তির হাসি তার চোখেমুখে।

তার পালা শেষ। ডেকে তুলল সিঁদুর-বিক্রেতাকে। বলল, 'ভাই, এবার নাহয় তুমি-ই জেগে থাক। আমি ঘুমোই। অবশ্য রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। আঁধার অনেক কমে এসেছে। চারদিকের অনেককিছুই ঝাপসা

ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়ল রঙিন শাড়ি-পরা, গয়না-পরা সুন্দর পুতুলটার দিকে। এ কি! এত সুন্দর শাড়ি যার দেহে, এত ভালো ভালো গয়না যার মাথায় গলায় কানে হাতে পায়ে,—তার কিনা মাথায় সিঁদুর নেই। সিঁদুর মাথায় না থাকলে কি মেয়েকে মানায়! তক্ষুণি সিঁদুরের কৌটো বের করল। আর পুতুলের সিঁথিতে সুন্দর করে পেছন দিকে টেনে সিঁদুর পরিয়ে দিল। হঠাৎ পুতুল প্রাণ পেল। সে এক রূপসী নারী হয়ে উঠল। কোথায় গেল পুতুল, কোথায় গেল আঁধার? চারিদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

সবাই জেগে উঠল। তাকিয়ে দেখল সুন্দরী মেয়েকে। ছুতোর স্বর্ণকার তাঁতি অবাক হল। সিঁদুর-বিক্রেতা তো আগেই অবাক হয়েছে।

ছুতোর বন্ধু বলল, 'এই মেয়ে আমার বৌ হবে, কেননা ওকে প্রথমে আমিই গড়েছি।'

স্বর্ণকার বন্ধু বলল, 'না, এই মেয়ে আমার বৌ হবে, ওকে যে আমি গয়না পরিয়ে দিয়েছি।'

তাঁতি বন্ধু বলল, 'তা হবে কেমন করে? এ মেয়েকে আমিই বিয়ে করব। নিজের হাতে শাড়ি বুনে ওকে আমি পরিয়েছি। ও আমার বৌ হবে।'

সিঁদুর বিক্রেতা বন্ধু বলল, 'তাই কি হয়? আমি যে ওকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছি। ওকে তো আমি বিয়েই করে ফেলেছি। আমার বৌকে আমার কাছ থেকে অন্যে নেবে কেমন করে? ও-যে আমার বিয়ে-করা বৌ।'

বন্ধুত্ব উবে গেল। শুরু হল ঝগড়া। কে বিয়ে করবে সেই মেয়েকে? আর একজন বলছে, সে সিঁদুর পরাবার সঙ্গেসঙ্গেই তাকে বিয়ে করে ফেলেছে। ঝগড়াঝাটি চলল। কেউ কারও মত মানছে না। এমনিভাবে সূর্য ওপরে উঠছে।

এমন সময় তারা দেখল,—বনের পথ দিয়ে একজন সাধুমতন লোক আসছে। তারা তাকেই ডাকল আর বিচারের ভার দিল।

'আমি তাকে প্রথমে গড়েছি।'

'আমি তার দেহে গয়না পরিয়েছি।'

'আমি শাড়ি বুনে তার দেহ ঢেকে দিয়েছি।'

'আমি তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি।'

সাধুমতন পথিকটি একটু হেসে বললেন, 'যে মানুষটি মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়েছে, সে-ই মেয়েটির স্বামী। মেয়েটি তার বৌ।'

একজন খুব খুশি হল। অন্য তিনজন পথিকের বিচারকে মেনে নিতে পারল না। আবার ঝগড়া শুরু হল। আবার পথ হাঁটা। সূর্য তখন অনেক ওপরে। ঝগড়া থেমে গেল। সকলেই চুপচাপ হাঁটছে। কেমন যেন থমথমে ভাব সবার মুখে।

এমন সময় পথে দেখা হল এক যুবকের সঙ্গে। দেবতার মতো তার রূপ। তাকে দেখলেই কেমন ভক্তি হয়। চারজনে থেমে গেল। দেবতার মতো রূপবান যুবকই বিচার করুক। তার কথাই তারা মেনে নেবে।

'আমি তাকে প্রথমে গড়েছি।'

'আমি তার দেহে গয়না পরিয়েছি।'

'আমি শাড়ি বুনে তার দেহ ঢেকে দিয়েছি।'

'আমি তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি।'

তাহলে? এই মেয়ে কার বৌ হবে?

খুব শান্তভাবে দেবতার মতো রূপবান যুবক বলল, 'সেই মানুষটি-ই কেবলমাত্র মেয়েটির স্বামী হতে পারে, যার হাতে সে প্রথম সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে। যে মানুষটি তাকে প্রথম গড়েছে, সে হল মেয়েটির পিতা। যে মানুষটি তার দেহে গয়না পরিয়ে দিয়েছে, সে হল মেয়েটির মামা। যে মানুষটি তার দেহ শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, সে হল মেয়েটির ভাই।'

চারজনে মেনে নিল দেবতার মতো রূপবান যুবকটির বিচার। মাথা নত করে মেনে নিল। মেয়েটি সিঁদুর বিক্রেতার বৌ হল। চারজনে বন্ধু রইল। চলল নতুন দেশে। পাঁচজনে পাশাপাশি।

দূর আকাশের তারা

অনেক অনেক কাল আগে এক ঘন জঙ্গলে বাস করত এক মস্ত শিকারী। তার নাম সুম্‌রো। সে একা। তার বৌ ছিল না, তার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। শুধু ছিল তীর আর ধনুক। এই নিয়ে সুম্‌রো বনের এক দিক থেকে অন্য দিকে শিকার করে বেড়াত। সে কখনও বনের বাইরে আসত না।

তীর-ধনুক বাগিয়ে সুম্‌রো একদিন চলেছে। ধনুকে তীর লাগানোই রয়েছে, ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে, চোখ ওপরের গাছের দিকে। হঠাৎ সে দেখল, একটা গাছের উঁচু মগডালে বসে রয়েছে দুটো সাদা সারস পাখি। থেমে পড়ল সুম্‌রো। আস্তে আস্তে কোনো শব্দ না করে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনুক তুলে তাক্ করল। তীর ছুটে গেল ওপরে। ধপ্ করে পড়ে গেল একটা পাখি। মদ্দা সারস পাখি। অন্য পাখিটা ডানা ঝট্‌পট্ করে নিচে তাকাল। চুপ করে বসে রইল ডালে।

সুম্‌রো শুকনো কাঠ-পাতা এনে আগুন জ্বালল। পাখির পালক ছাড়িয়ে গোটা পাখিটাকে উল্‌টে-পাল্‌টে ঝল্‌সাতে লাগল। মাংস বেশ পুড়ে এসেছে। পোড়া মাংসের ধোঁয়া ওপরে উঠছে। সুম্‌রো বেশ খুশি।

ওপরে সারসের বৌ তার স্বামীর মাংসের পোড়া গন্ধ পেল, ধোঁয়া এসে নাকে ঢুকল। ডাল থেকে আলগা হয়ে গেল তার পা, সে ধপ্ করে আছড়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। আগুনে পড়ে ঝল্‌সে গিয়ে সারস-বৌ মরে গেল।

সুম্‌রো চমকে উঠল। সে মুগ্ধ হল। তার চোখের পাতা ভিজে এল। স্বামীর প্রতি এত গভীর ভালোবাসা! এরকম প্রেমিক-যুগল সে আগে কখনও দেখেনি। সে ঝল্‌সানো পাখিটাকে খেল না। আগুন থেকে দুটো পাখিকে হাতে তুলে নিল।

ওপর দিকে পাখি-দুটোকে তুলে ধরে সুম্‌রো বিড়্‌বিড় করে বলল, 'তোমরা দূর আকাশে চলে যাও। সেখানে সুখে বাস কর। তোমরা হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল দুই তারা, পাশাপাশি থাকবে। তোমাদের সুখী সংসারে আসবে অসংখ্য সন্তান, তারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে। এই মাটির পৃথিবীতে তোমাদের দেহ ছিল সাদা ধব্‌ধবে ও পরিষ্কার। দূর আকাশে তোমরা হবে আরও উজ্জ্বল। এখানকার সব মানুষ তোমাদের দেখবে আর প্রশংসা করবে। যাও তোমরা দূর আকাশে।'

এমনি করেই আকাশ হল তারায় ভরা। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা দুটি এল প্রথমে, তারপরে তাদের ছেলেমেয়ে অন্য সব তারা।

রামধনু আর বৃষ্টি

আমাদের আদি পিতা হলেন কিত্‌তুঙ। তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই আদি পিতা কিত্‌তুঙ-এর একটি ছেলে ছিল। তার নাম মারু।

মারু একদিন ডাগর হল। সে ধনুক হাতে তীর ছুড়তে পারে। তীর-ধনুক তার নিত্যসঙ্গী। তার বিয়ের বয়স হল।

কিত্‌তুঙ মারুর বিয়ে ঠিক করলেন এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। এই মেয়ে হল রুয়ান্‌গান রাজার মেয়ে। রুয়ান্‌গান রাজা থাকেন সেই দূর আকাশে। বিয়ে হয়ে গেল। সবাই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

এমনি করে দশ বছর কেটে গেল। মারুর বৌয়ের ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হল। সেই বিয়েতে জামাই মারু আর মেয়েও গেল আকাশে। অনেকদিন পরে মারু আবার এল আকাশে।

বরযাত্রীরা এসেছে। বিয়ে শুরু হবে। হঠাৎ কি একটা ব্যাপার নিয়ে বচসা শুরু হল। বচসা থেকে ঝগড়া। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি-মারামারি। গোলমালের মধ্যে মারু রুয়ান্‌গান রাজার হাতে খুব মার খেল। বেচারী মারু! তার হাত থেকে তার নিত্যসঙ্গী অতি প্রিয় ধনুকটা ছিটকে পড়ল। আকাশে ছিটকে পড়ল। আর মারু মারা গেল।

এই ছেলের মৃত্যুর খবর এসে পৌছল। বাবা কিত্‌তুঙ তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। কেন এমন হল দেখা দরকার। এসে দেখলেন, তার প্রিয় ছেলে মাটিতে পড়ে রয়েছে, পাহাড়ের মতো অচল হয়ে। আর ছেলের হাতের ধনুক আকাশে ঝুলে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিত্‌তুঙ।

তারপরে ভেজা গলায় আকাশের পানে তাকিয়ে ধনুককে লক্ষ্য করে বললেন, 'ও আমার প্রিয় মারু, তুমি আর কোনোদিন প্রাণ ফিরে পাবে না। তুমি চিরকালের জন্য চলে গেলে। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ তোমার ধনুক দেখতে পাবে। তুমি হবে আকাশের রামধনু। তোমার রঙের বাহারে সবাই মুগ্ধ হবে। তোমার রূপের কথা সবাই বলবে। ধনুকের মধ্যেই রামধনু হয়ে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

আকাশে রামধনু বিচিত্র রঙ্‌ ছড়িয়ে এদিক থেকে ওদিকে দেখা দেয়। মারুর বিধবা বৌ সেই রামধনু দেখে, বেদনায় সে কেঁদে ওঠে আর তার চোখের জল বৃষ্টিধারা হয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।

দুঃখ এল মানুষের জীবনে

সবার আগে এল মানুষ, তারপরে দেবতাদের জন্ম হল। দেবতাদের আগেই মানুষের সৃষ্টি হল। কিন্তু সেই পুরনো কালে মানুষ দেবতাদের কোনো পুজো দিত না, তাদের নামে প্রসাদ দিত না, কোনো জন্তুকেও বলি দিত না। তারা সারাদিন জমিতে চাষ করত, বনে কাঠ কাটত, খাওয়া-দাওয়া করত, —আর নাচে-গানে সময় কাটিয়ে দিত। এসব করে মানুষের আর কোনো সময় হাতে থাকত না, তাই সে দেবতাদেরও পুজো দিত না। ওসব কোনো খেয়ালও তার থাকত না। সেই পুরনো কালে দেবতারা দূরের গভীর বনের মধ্যে বাস করত। তারা মানুষের থেকে অনেক দূরে একা একাই থাকত। বনের ফল আর ফুল খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে ছিল। আর খেত নদীর জল আর হাওয়া। মানুষ কোনো ধর্মকর্ম করত না, তার জন্য কিছু ব্যয়ও হত না। বেশ সুখে দিন কাটাত মানুষ। এমনি করে মানুষ শেষকালে খুব বড়লোক হয়ে উঠল। কোনোকিছুরই অভাব নেই তার।

মহাপ্রভু সব দেখলেন। মানুষের সম্পদ দিনে দিনেই বেড়ে যাচ্ছে। তিনি সব বুঝলেন। শেষকালে তিনি মানুষকে ভয় পেতে শুরু করলেন। ভাবলেন,—'মানুষ যদি এভাবে সম্পদের অধিকারী হতেই থাকে, তাহলে তো সে কোনোদিন কাউকে আর ভয়ই পাবে না! নিজেই নিজেকে নিয়ে থাকবে। তাহলে? এমন কিছু করতে হবে যাতে তার ধনদৌলত ছিনিয়ে নেওয়া যায়। ধন-দৌলত গেলেই সে কাবু হয়ে পড়বে।'

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহাপ্রভু সব দেবতাকে নিজের কাছে ডাকলেন। তাদের বেশ কিছুদিন তার কাছেই থাকতে বললেন। দেবতারা খুব আরামে রইল। দুধ আর চিনি খেতে লাগল। বড় সুস্বাদু, পুষ্টিকর! তারা মহা আরামে দিন কাটাতে লাগল। এমনি করে বেশ কিছুকাল কেটে গেল।

শেষকালে মহাপ্রভু একদিন দেবতাদের ডেকে বললেন, 'এবার তোমাদের যেতে হবে। অনেকদিন রইলে আমার কাছে। আর, মানুষের মধ্যে গিয়ে তোমাদের থাকতে হবে। না, কোনো ভয় নেই। মানুষের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম সেতি সিসা। সেই শুধু দেবতাদের মেনে চলে। তোমরা সোজা তার কাছে চলে যাও। সে সব ব্যবস্থা করবে। তোমাদের

যা যা দরকার সে সবকিছুই দেবে। তার কথামতো চলবে। যাও, নির্ভয়ে যাও। কোনো ভয় নেই।'

দেবতারা চলল সেতি সিসার কাছে। মহাপ্রভু বলেছেন, তবু দেবতাদের মানুষকে বড় ভয়। শেষকালে তারা সেতি সিসার কাছে পৌঁছল। সে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করল। কাকে কোথায় থাকতে হবে সব বলে দিল। দেবতাদের ভয় একটু কমল।

আগে দেবতাদের কোনো নামধাম ছিল না। সেতি সিসা তাদের আলাদা আলাদা নাম দিল।

সে একজন দেবতার নাম দিল ডুম্‌বার। তাকে থাকতে দিল পবিত্র কুঞ্জবনে, সুন্দর তরুবীথিতে। ডুম্‌বার হল পবিত্রকুঞ্জবনের দেবতা। গাঁয়ের পাশেই এই পবিত্র কুঞ্জবন।

আর একজনকে সে বাঘের দেবতা করল। তার নাম দিল ওবুসেলে। পাহাড়ী বনে তাকে থাকতে বলল। গাঁয়ের পাশেই পাহাড়ী বন।

আর একজন দেবতার নাম রাখল রুন্‌কৃতা। তাকে করল পাহাড়ী নদীর দেবতা। সেখানে তাকে থাকতে বলল। গাঁয়ের কাছেই পাহাড়ী নদী। এখানে মানুষজন স্নান করতে আসে, খাবার জল নিতে আসে।

গাঁয়ের পাশেই উঁচু পাহাড়। সেখানে থাকতে দিল একজন দেবতাকে। তার নাম হল সাওরুলি।

গাঁয়ের কাছেই ঘন বনভূমি। সেখানে রইল আর এক দেবতা। এ দেবতার নাম হল বুগাবোর।

ঝরনার দেবতা হল সিংরাজ। সেতি সিসা নিজের বাড়িতে থাকতে দিল দুজন দেবতাকে। তারা হল ঘরের দেবতা। একজনের নাম দাগোই, অন্যজনের নাম গুরাঙ্‌পোই। একটা পাথরের আসন করে থানের দেবতা করল একজনকে। তার নাম সিন্‌দিবোর।

গাঁয়ের মধ্যে, ঘরের মধ্যে, গাঁয়ের আশেপাশে, বনে-নদীতে-ঝরনায়-পাহাড়ে সব জায়গায় রইল এক এক দেবতা। সেতি সিসার জন্য দেবতারা এখন ভালোভাবে রয়েছে, তাদের ভয় কমেছে।

আগে মানুষ দেবতাদের নিয়ে মোটেই ভাবনা-চিন্তা করত না। তারা থাকত গাঁয়ে, চাষ করত জমিতে, নাচে-গানে সময় কাটত। দেবতারা থাকত দূর বনে। কিন্তু এখন গাঁয়ের মধ্যে, চারপাশে শুধুই দেবতা। বনে-পাহাড়ে-নদীতে,—কোথায় নেই দেবতা?

এত দেবতা চারিদিকে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য তো অনেক খাদ্য চাই। দেবতারা নিজে কোনো কাজকর্ম করে না। তাদের খাবার যোগাড় করে দিতে হয়।

তাই সেতি সিসা আদেশ করল, দেবতাদের ভরণ-পোষণের জন্য গ্রামবাসীদের সবাইকে কর দিতে হবে। তারা যা দেবে তাতেই দেবতাদের ভরণ-পোষণ চালাতে হবে। প্রতিটি গ্রামবাসীকেই কর দিতে হবে।

এখন হয়েছে কি, দেবতারা মহাপ্রভুর কাছে থেকে থেকে ভালো ভালো খাবার খেতে শিখে গিয়েছে। আগের মতো ফল-ফুল-হাওয়া-জল মুখে রোচে না। বনে থাকতে এগুলো খেতেই বাধ্য হত। কিন্তু এখন চাই ভালো খাবার। আর কাজ না করেই যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন সুখী দেবতারা সেসব ছাড়বে কেন? তাদের লোভও অনেক বেড়ে গিয়েছে। মহাপ্রভু দেবতাদের কাছে রেখেছিলেন তো এই জন্যই। তারা জানুক ভালো খাবারের স্বাদ, তারা জানুক বনের ফলমূল ছাড়াও অন্য অনেক ভালো খাদ্য আছে, দেবতাদের লোভ বাড়ুক। বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে যাক। তখন আরও দাও, আরও দাও। মহাপ্রভু যে সব বোঝেন।

গ্রামবাসীরা যা দিত দেবতাদের তাতে কিছু হত না। আরও চাই, নতুন জিনিস চাই। চারিদিকে দেবতা, মানুষও ভয় পেয়ে যেতে লাগল। দেবতাদের মন পাওয়ার জন্য আরও জিনিস দিতে লাগল। দেবতারা সাদা চালের ভাত আর মাংস চাইল। মানুষও তাই দিতে শুরু করল। মানুষের মনে এক নতুন চিন্তা বাসা বাঁধল,—সে হল দেবতা, চারপাশের অনেক দেবতা।

এমনি করে মানুষ একদিন গরিব হয়ে গেল। দেবতার পুজো দিতে দিতে সে গরিব হয়ে গেল। আগে পুজো ছিল না,—মানুষ গরিব ছিল না। এখন পুজো এল, মানুষ গরিব হল। মানুষের জীবনে দুঃখ এল।

এক পালি বুনো মোম

পাহাড়ী ঘন এক জঙ্গলের পাশে ছিল এক গ্রাম। আর সেই গ্রামে থাকত একটা লোক। সে খুব গরিব। তার চেয়ে গরিব আর কেউ সেই গ্রামে ছিল না। তার কোনো জমি-জিরেত ছিল না, লাঙল ছিল না, ছিল না একটাও হেলে বলদ। এমন মানুষ গাঁয়ে দুটি নেই। তবে তার ছিল এক জোড়া ছাগল। এই তার একমাত্র সম্পদ।

এমনি করে দিন যায়। কিন্তু দিন তো আর কাটে না। কত সহ্য করবে সে। শেষকালে সে মন ঠিক করে ফেলল, — আর নয়, এই এক জোড়া ছাগল দিয়েই চাষ করব। দেখি না কি হয়!

লোকটি ছিল একগুঁয়ে। লেগে গেল কাজে। সে বন থেকে গাছের ডাল কেটে আনল। তাই দিয়ে ছোট্ট একটি লাঙল তৈরি করল। বড় লাঙলে কাজ হবে না। ছাগলদের মাপে ছোট লাঙল তৈরি করল। ছাগল দুটোর ঘাড়ে জুড়ে দিল লাঙল। তারপর চলল জমিতে। তার নিজের কোন জমি নেই। কিন্তু চাষ তাকে করতেই হবে। দূরে উঁচু ডাঙায় রয়েছে জমি। কাঁকরে মাটি, কেউ কোনোকালে সেখানে চাষ করে না। কেননা করেও লাভ নেই, ফসল ফলবে না। সে জমির দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সে জমি কারও নয়। ছাগল-লাঙল নিয়ে লোকটি গেল সেই কাঁকরে ডাঙা জমিতে। শুরু করল লাঙল চালাতে। বড় পরিশ্রম, ঘাম ঝরছে দেহে, শক্ত মাটি। তবু সে হাল ছাড়ল না। শেষকালে জমি চাষ করা হয়ে গেল।

কিন্তু জমিতে বুনবে কি? তার তো বীজধান নেই। শস্য তো বুনতে হবে। সে গেল এক পড়শীর কাছে। ধার চাইল কিছুটা বীজধান। পড়শী হাসল, ফিরিয়ে দিল তাকে। বীজধান নিলে শোধ করবে কেমন করে? ঐ জমিতে ফসল ফলবে?

ফিরে এল লোকটি। দুঃখ পেল, হাল ছাড়ল না। আরও কয়েকজন পড়শীর কাছে ধার চাইল বীজধান। সবাই ফিরিয়ে দিল। সবার মুখেই এক কথা।

এবার লোকটি গেল আর এক পড়শীর কাছে। না, ধার চাইতে নয়। ভিক্ষে চাইতে। তার বীজধান ভিক্ষে চাই না, ধানের অল্প তুষ হলেই চলবে। তুষ ভিক্ষে? সঙ্গে সঙ্গে পড়শী রাজি। ধানের তুষ তাকে দিল। সে ফিরে এল জমিতে।

ধানের তুষে বীজ নেই, ভেতরে চাল নেই। নাই-বা থাকুক। পরম যত্নে আদর করে সে তাই বুনে দিল জমিতে। এমনভাবে বুনছে যেন মনে হল সে বীজধানই বুনছে। সকাল হলেই সে চলে যায় জমিতে। সারাদিন বসে থাকে গাছের নিচে।

অবাক কাণ্ড! কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি তাই ঘটল। সবুজ লক্লকে চারা বেরুল তুষ থেকে। কচি কচি চারা, হাওয়ায় দুলছে। লোকটির চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ। চারা বড় হচ্ছে, আরও বড়, আরও লক্লকে। একদিন তাতে ধান হল, গাছভর্তি ধান। এত ধান আর কারও জমিতে কোনোদিন ফলেনি। ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়ছে। সারাদিন ধরে লোকটি নিজের ফসল দেখাশোনা করে। রাতে অল্পক্ষণের জন্য বাড়িতে যায়। ধান পেকে এল। আর দু-চার দিনের মধ্যেই ফসল কাটার সময় আসবে।

সেই সকালেও সে তাড়াতাড়ি চলল জমিতে। মনে ফুর্তি। এ কি! সর্বনাশ! দূর থেকেই সে দেখতে পেল, জমি কেমন ফাঁকা ফাঁকা। দৌড়ে এল। জমির কাছে এসে দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে লোকটি বসে পড়ল। তার সব ধান গাছ দলে-পিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাশের পাহাড়ী ঘন বন থেকে এক পাল বুনো মোষ রাতে এসেছিল। যতটা পারে ধান গাছ খেয়েছে, আর তাদের পায়ের চাপে দেহের চাপে সব ধান গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ বসে রইল সে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার জমির দিকে।

আর তো কিছুই নেই। সব গেল। কি হবে এই গাঁয়ে থেকে? তার চেয়ে মোষগুলোর পেছন ধাওয়া করাই ভালো। জঙ্গলে ওদের হদিস ঠিক পওয়া যাবে। সে চলল পাহাড়ী ঘন জঙ্গলের পথে। বুনো মোষের পাল কোনদিকে গিয়েছে তা খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন হল না। শত শত খুরের চিহ্ন সারা পথে—মাঠে ছড়ানো। খুরের চিহ্ন-দেওয়া পথ দিয়ে সে এগোতে লাগল। মাঠ ছাড়িয়ে বনে ঢুকল। আরও গভীর বনে। শেষকালে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। চারিদিকে শাল-মহুয়ার গাছ, মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে বুনো মোষের পাল রাতে ঘুমোয়। সুন্দর জায়গা, আকাশ ফাঁকা, চারিদিক ঘেরা। সেখানেই ঘুমিয়ে থাকে বুনো মোষের পাল। এরাই তার জমির ধান দলে-পিষে নষ্ট করে এসেছে।

একটা গাছের নিচে অনেকক্ষণ লোকটি বসে রইল। বড় বিশ্রি গন্ধ বেরুচ্ছে। জায়গাটা বড় অপরিষ্কার। রাতের ফেলে-রাখা দলাদলা ময়লা।

মোষেরা তার ওপরেই শুয়ে থাকে। লোকটিরও কোনো কাজ নেই। বড় একঘেয়ে লাগছে। উঠে পড়ল সে। গাছের লম্বা লম্বা কয়েকটা ডাল ভাঙল। একসঙ্গে করে লম্বা ঝাঁটার মতো তৈরি করল। আর অপরিষ্কার খোলা জায়গাটিতে ঝাঁট দিতে লাগল। অনেক দিনের নোংরা। বাঃ! বেশ সুন্দর লাগছে। কি পরিষ্কার!

গাছের ওপারে সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অন্ধকার চারিদিকে। এমন সময় লোকটি বহু খুরের আওয়াজ পেল। বুঝল, বুনো মোষের পাল ফিরে আসছে। সে তাড়াতাড়ি একটা শুকনো শাল গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বুনো মোষের পাল তাদের পরিচিত ফাঁকা জায়গায় এসে অবাক হল। আঃ! কি পরিষ্কার! শোবার মতো জায়গাই বটে! তারা অবাক হল, খুশিও হল। কিন্তু ভেবে পেল না, কে তাদের জন্য এমন সুন্দরভাবে জায়গাটা পরিষ্কার করে রেখেছে। ঘুমিয়ে পড়ল তারা। বড় ক্লান্ত।

পরের দিন ভোর বেলা দূর বনে-মাঠে যাওয়ার সময় মোষেরা এধার-ওধার তাকিয়ে দেখল। তারপরে পাল বেঁধে মিলিয়ে গেল ঘন বনের মধ্যে।

লোকটি তো সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সে বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। আবার ঝাঁটা দিয়ে তাদের ঘুমিয়ে থাকার জায়গাটি পরিপাটি করে পরিষ্কার করে রাখল। খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁট দিল। তারপরে গাছের নিচে ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে মোষের পাল আবার অবাক হল। সেই একই কাণ্ড। এদিন জায়গাটি যেন আরও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে লাগছে। কে করছে এমন উপকার? সে রাতে তারা ঠিক করল, পরের দিন একজনকে এখানে রেখে যেতে হবে। সে নজর রাখবে কে এমন উপকার করছে।

পরের দিন ভোরবেলা মাঠে-বনে চরতে যাওয়ার সময় তারা একটা মোষকে সেখানে রেখে গেল। সে ছিল খোঁড়া। সবাই চলে গেল। সে রইল খোলা জায়গায়। দুপুর হল। ওপর থেকে আগুন ঝরছে। কোনো কাজ নেই। ক্লান্ত হয়ে খোঁড়া মোষটা গাছের নিচে বসে পড়ল। ঘাড়টা বেঁকিয়ে পায়ের ওপরে রাখল। চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে এল। সে ঘুমিয়েপড়ল।

লোকটি সব দেখছে। বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। হাতে ডালের ঝাঁটা নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঝাঁট দিতে লাগল। কোনো শব্দ না করে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আবার লুকিয়ে পড়ল কোটরে। মোষটা তখনও ঘুমোচ্ছে।

মোষরা ফিরে এল। এবার আরও অবাক হল। কেননা, খোঁড়া মোষটা কাউকেই দেখেনি। অথচ খোলা জায়গাটি তেমনি পরিষ্কার। এবার তারা আর একটা মোষকে ঠিক করল। সে অন্ধ। কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু অন্ধ বলেই তার কান অন্যদের চেয়ে বেশি সজাগ। অল্প শব্দ হলেও সে ঠিক টের পায়।

অন্ধ মোষ দুপুরে গাছের নিচে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু সে ঘুমোবে না। ধরতেই হবে তাকে যে এমন উপকার করছে। চোখ বন্ধ করে সে শুয়ে রইল।

লোকটি সব দেখছে। সে বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। ডালের ঝাঁটা তুলে নিল হাতে। কান খাড়া করে রইল মোষ। সে সব বুঝতে পারছে। ঝাঁট দেওয়া শেষ হল। লোকটির চলার শব্দ হচ্ছে মাটিতে। এক জায়গায় গিয়ে-শব্দ থেমে গেল। মোষ সব বুঝল।

বুনো মোষের পাল ফিরে এল। অন্ধ মোষ সব বলল। দেখিয়ে দিল লোকটির লুকোনোর জায়গা। মোষেরা কোটরের কাছে গেল। উঁকি মেরে দেখল, ভেতরে বসে রয়েছে তাদের উপকারী বন্ধু। তাকে বাইরে আসতে বলল। লোকটি একটু ভয় পেল।

মোষ সর্দার বলল, 'তুমি খুব ভালো লোক। ভয়ের কি আছে? তুমি আমাদের কত উপকার করছ। আমরাও তোমাকে দেখব। তোমার সব দায়িত্ব আমরা নিলাম। তুমি আমাদের মধ্যেই থাকবে। রাজি তো?'

লোকটির জমি-জিরেত নেই, সংসার নেই, বৌ-ছেলেমেয়ে কেউ নেই। গরিব বলে পড়শীরাও তেমন খোঁজ নেয় না। সে যাবেই বা কোথায়? সে রাজি। বুনো মোষের পালের সঙ্গেই সে থাকবে। সে রাজি। মোষের পাল খুশি হল। মোষের পাল তার দেখাশোনা করবে, আর সে মোষের পালের ঘুমোবার জায়গা পরিষ্কার করবে। এমনি করে দিন কাটে।

একদিন বনের পথ দিয়ে কয়েকজন পথিক চলেছিল। তাদের সঙ্গে অনেক অনেক জিনিসপত্র। মোষের পাল তৈরি ছিল। শিঙ বাগিয়ে তেড়ে গেল। বুনো মোষের পাল দেখে পথিকেরা যে যার জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে গেল। সব জিনিস শিঙে তুলে নিয়ে চলে এল সেই ফাঁকা জায়গায়। লোকটিকে দিল। জামা-কাপড়, চিরুনি,—অনেক কিছু। লোকটির আর কোনো অভাব থাকল না। এরকম মাঝে-মধ্যেই ঘটে। পথিক সে পথে গেলেই মোষের পাল শিঙ বাগিয়ে তেড়ে যায়। তারাও প্রাণ নিয়ে পালায়। ফেলে যায় তাদের

জিনিসপত্র। শিঙে তুলে মোষেরা সেগুলো আনে লোকটির কাছে। বেশ সুখে দিন কাটছে।

সারা দিন লোকটি একা থাকে। কোথায় কি বিপদ ঘটে তার ঠিক নেই। মোষের পাল তাই চিন্তিত। শেষে একদিন মোষ সর্দার লোকটিকে ছুটো শিঙ দিয়ে বলল, 'বন্ধু, তুমি একা একা থাকো। কোথায় কি বিপদ ঘটে কে জানে। কোনো বিপদ ঘটলেই তুমি এই শিঙের শিঙা বাজাবে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন তোমার কাছে ছুটে আসব। কোনো বিপদ তোমার হতে দেব না। কেউ তোমার কিছু করবে তা আমরা সহ্য করব না। তুমি যে আমাদের বন্ধু।'

লোকটি মোষের শিঙের শিঙা সববময় নিজের কাছে রাখে। বন্ধুর দান। একদিন লোকটি পাহাড়ী নদীতে স্নান করছে। ঘাসের ওপরে শিঙছুটো রেখে দিয়েছে। এমন সময় কয়েকটা কাক ঠোঁটে করে তার শিঙা নিয়ে উড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। জল থেকে তাড়াতাড়ি সে উঠে এল, ধাওয়া করল কিছুটা পথ। কিন্তু পাখিদের আর দেখা গেল না। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়ার কথা সে আর মোষেদের বলল না। লজ্জা পেল।

আর একদিন স্নান করতে গিয়েছে পাহাড়ী নদীতে। স্নান সেরে নদীর পারে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। কতদিন চুল কাটা হয়নি। বিরাট লম্বা হয়েছে। মাথা থেকে নেমে চুল হাঁটুর কাছে এসেছে। আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা চুল গোড়া থেকে উপড়ে এল। পাশে পড়ে ছিল একটা লোয়া ফল। সে ফলটাকে দুভাগ করে তার মধ্যে চুলটাকে জড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল। আবার লোয়া ফলটিকে বন্ধ করে আপন খেয়ালে ফেলে দিল নদীর জলে। লোয়া ফল ভাসতে ভাসতে স্রোতের টানে অনেক দূর চলে গেল। সে তাকিয়ে রইল। আরও দূরে। এখন আর ফলটিকে দেখা যাচ্ছে না। সে ফিরে এল মোষেদের আস্তানায়।

এখন হয়েছে কি, ফল ভাসছে, ভাসছে। ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গিয়েছে। নদীর এক জায়গায় স্নান করছিল সেই গাঁয়ের সর্দারের মেয়ে। লোয়া ফল মেয়ের পাশ দিয়ে যেতেই সে সেটাকে ধরে ফেলল। ফাঁক করল। ভেতরে দেখতে পেল লম্বা চুল। তাড়াতাড়ি চলে এল বাবার কাছে। মেয়ে বলল, 'এই লম্বা চুল যে মানুষটির, আমি তাকেই বিয়ে করব। আর কাউকে নয়।'

সর্দার বিরাট ধনী মানুষ। বিরাট বাড়িঘর, মস্ত গাঁ। আর ঐ একমাত্র

মেয়ে। কত ভালো বর জুটবে মেয়ের। সবই তো পাবে ঐ মেয়ে আর জামাই। এখন কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তার সঙ্গে এমন মেয়ের বিয়ে? কিন্তু মেয়ের প্রতিজ্ঞা, মেয়ে নাছোরবান্দা। সে ঐ লম্বা চুলের মানুষটিকেই বিয়ে করবে। বড় আদুরে মেয়ে। কি আর করবে বাবা! নদীর উজান পথে লোক পাঠাল। অনেকে চলল মেয়ের বরের খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে একজন মোষের পালের আস্তানায় তার দেখা পেল। হ্যাঁ, এই সেই লোক। চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাকে নিয়ে এল সর্দারের গাঁয়ে। সর্দারের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

খুব খাওয়া-দাওয়া, হৈচৈ আর ধুমধামের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। সর্দারও কথা দিলেন, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই জামাই। সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল। আর কোনো অভাব নেই।

একদিন জামাই ঘেরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশেপাশে একটু দূরে কিছু সঙ্গী-সাথী। এমন সময় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কয়েকটা কাক। হঠাৎ তাদের ঠোঁট থেকে মোষের দুটো শিঙ তার পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি তুলে নিল। হাতে নিয়েই চিনতে পারল। তার হারিয়ে-যাওয়া শিঙের শিঙা। মোষ সর্দার বন্ধুকে দিয়েছিল। আনন্দে মন ভরে গেল।

সে ভালোভাবে দেখছে শিঙ দুটো। কয়েকজন সঙ্গীসাথী তার কাছে এল। বলল, 'এমন করে দেখার কি আছে? ও-তো মোষের শিঙ।'

জামাই হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে। তবে এর অনেক গুণ। আমি যদি এই শিঙা বাজাই, তবে এক মুহূর্তে এই বিরাট গ্রাম মাটিতে মিশে যেতে পারে। তখন আর গ্রাম বলেই চেনা যাবে না।'

জামাই কি পাগল? বলে কি? শিঙা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম মাটিতে মিশে যাবে কেন? তারা ঠাট্টা করতে লাগল। তাই আবার হয় নাকি? ঠাট্টার কথা শুনে জামাই গেল রেগে। বিশ্বাস হচ্ছে না? আরও ঠাট্টা। এবার ভীষণ রেগে গেল সে। মুখের কাছে শিঙের শিঙা এনে জোরে ফুঁ দিল। বেজে উঠল শিঙা। সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ দূর বনের মধ্যে থেকে ভীষণ শব্দ ভেসে এল। মাটিতে দাপাদাপির শব্দ। মাটি কাঁপছে। শব্দ কাছে আসছে, মাটি আরও বেশি কাঁপছে। বনে গাছপালা নড়াচড়া করছে। আরও শব্দ। হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পাল কালো মেঘ। এক পাল বুনো মোষ। মাথা নিচু করে শক্ত

শত বুনো মোষ ধেয়ে আসছে গ্রামের দিকে। যারা দেখছিল তাদের বুক কেঁপে উঠল। হ্যাঁ, গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে বটে।

না, কোনো অঘটন ঘটল না। গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে গেল না। লোকটি ঝড়ের বেগে ঘেরা-দেওয়া উঠোন থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে খোলা মাঠে তাকে দেখেই মোষের পাল গতি আস্তে করল। না, বন্ধু অক্ষত আছে তার কোনো বিপদ ঘটেনি। আস্তে আস্তে বন্ধুর সামনে বুনো মোষের পাল দাঁড়িয়ে গেল। মোষ সর্দারের গায়ে হাত রেখে বন্ধু বলল, 'না, আমার কোনো বিপদ ঘটেনি। আমি ঠিক আছি। অনেকদিন তোমাদের দেখি নি। তাই।'

বন্ধুর কথায় মোষের পাল শান্ত হল। যাক্, বন্ধু ভালো আছে। তারা বসে পড়ল সেখানে। তখন সর্দারের বাড়ি থেকে সমস্ত খড় আর দানাশস্য বের করে আনা হল। জামাইয়ের বন্ধু বুনো মোষের পালকে খেতে দিতে হবে। তারা অতিথি। প্রাণভরে তারা খেল। চোঁ চোঁ করে পুকুরের জল খেল। তারা আবার ফিরে চলল পাহাড়ী ঘন বনের দিকে। সবাই চলে গেল দুজন ছাড়া।

দুটি মোষ রয়ে গেল বন্ধুর কাছে। সর্দারের বাড়িতে, গাঁয়ে। এই একজোড়া মোষ আর বনে ফিরে গেল না। তারা হল গৃহপালিত, তারা হল পোষা। তাদের বুনো স্বভাব চলে গেল। আজ যে আমরা ঘরে ঘরে এত পোষা মোষ দেখতে পাই, তারা সবাই ঐ একজোড়া মোষের বাচ্চা থেকেই এসেছে। ওদের বাচ্চারাই ঘরে ঘরে পোষা মোষ হয়ে রইল। বনে রইল বুনো মোষ, ঘরে রইল পোষা মোষ।

আদিকালের কথা

শোনো বাছারা আদ্যিকালের কথা। এ কথা সবাইকে শুনতে হয়। শুনে মনে রাখবে। আবার বলবে তোমাদের ছেলেমেয়েকে, তোমাদের নাতিপুতি-দের। শোনো সেই আদ্যিকালের কথা।

সেই আদ্যিকালে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু ফুলুগা। ফুলুগা আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে একটা মস্ত তালগাছ। আর তারই মাথায় বসানো রয়েছে এই পৃথিবী। নিচে শুধুই ডাঙা। সমুদ্র নেই, তখনও সমুদ্র জন্মায়নি। নিচের অন্ধকার জঙ্গলে বাস করে অনেক অনেক আত্মা। তারা বনের জীবজন্তু শিকার করে আর তাই খেয়ে বনেই থাকে। তারা শুয়ে থাকে এক বিশাল ডুমুর গাছের নিচে। ডুমুরও খায় তারা।

আর একটা জায়গা ছিল। সেটা সেই পুবদিকে। সেখানে থাকে যত শয়তান আত্মা। বড় পাজি তারা। এখানকার সঙ্গে শয়তান আত্মাদের দেশের মধ্যে আসা-যাওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেটা একটা সাঁকো। সব সময় কিন্তু সেই সাঁকোকে দেখতে পাওয়া যায় না। দিন যখন খুব খারাপ যায়, আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি নামার কালে, চারিদিকে যখন থমথম্ তখন সাঁকো দেখা যায়। সাঁকোর নাম হল রামধনু। মস্ত বড়।

পৃথিবী তো হল। ফুলুগা চিন্তা করলেন। শেষকালে তৈরি করলেন মানুষ। একটা মানুষ। এই মানুষটার নাম দিলেন তোমো। তার গায়ের রঙ বেজায় কালো, ঠিক আমাদের এখনকার মতো। কিন্তু তার মুখভর্তি লোম আর সে বেজায় লম্বা। আমাদের মতো নয়।

তখন সমুদ্র হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে দুটো ডাঙা ছিল। এই দুই ডাঙার মধ্যিখানে আবার এক ঘন জঙ্গল। তার নাম ওতিমি। মানুষ তোমোকে ফুলুগা রাখলেন সেই ওতিমির জঙ্গলে। গাছে গাছে ফল ধরে রয়েছে, অনেক ফল। ফুলুগা তোমোকে একটা একটা করে ফল চিনিয়ে দিলেন। সব চিনল মানুষ। ফুলুগা বললেন, 'সব সময় গাছের ফল খাবে। কিন্তু আকাশ থেকে যখন জল পড়বে, এক নাগাড়ে অনেক দিন ধরে পড়তে থাকবে তখন কিন্তু কয়েকটা ফল খাবে না। এই কটা বাদ দিয়ে অন্য ফল খাবে। মনে রাখবে।'

তোমো মাথা নাড়ল।

ফ্লুগা ডাকলেন তোমোকে। দুটো গাছের কয়েকটা শুকনো ডাল ভেঙে আনলেন। প্রথমে মাটিতে রাখলেন এ গাছের একটা ডাল, তার ওপরে ও গাছের একটা ডাল, তার ওপরে এ গাছের। এমনি করে বেশ উঁচু হল ডালের ওপরে ডাল। সূর্যকে ডাকলেন। সূর্য ফ্লুগার কথায় ডালের ওপরে বসল। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত ডাল দিলেন তোমোকে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষ তোমো আগুন পেল।

এতদিন তো সব কিছু কাঁচাই খেত তোমো। এখন আগুন আছে। রান্না শেখালেন ফ্লুগা। বুনো শুয়োর মেরে তার মাংস রাঁধতে শেখালেন। বুনো শুয়োর এখনকার মতো ছিল না। তখন ছিল বেজায় বোকা। তাদের নাক ছিল না, কান ছিল না। নাক নিয়ে তেড়ে আসতে পারত না, কানে শুনে পালিয়ে যেতেও পারত না! শুধুই মারা পড়ত। তোমোর বেজায় সুবিধে। ওরা তখন নিজেরা খেতে জানত না।

মানুষ তোমো সব শিখল। ফ্লুগা আর থাকবেন কেন এখানে? তিনি চলে গেলেন ঐ দূপ রাহাডের চূড়ায় কিংবা বোধহয় ঐ সাদা মেঘের আকাশে। মানুষ আর কোনোদিন দেবী ফ্লুগাকে দেখে নি। তিনি আছেন, কিন্তু তার দেখা পাওয়া যাবে না।

তোমো ছিল পুরুষ। প্রথম নারীর নাম চানা ইলেওয়াদি। তাকেও সৃষ্টি করেছেন ফ্লুগা। ফ্লুগাই সব সৃষ্টি করেছেন। তবে পুরুষের পরে জন্মেছে নারী। তোমো যখন আগুন পেল তার অনেক পরে নারী জন্মাল। তাকেই তো ঘর গেরস্থালি দেখতে হবে। জন্মাবার পরে সে জলে সাঁতার কাটছিল। তোমোর আস্তানা দেখে, আগুন দেখে জল থেকে উঠে এল। তোমোর কাছে। সে হল তোমোর বৌ।

এমনি করে দিন যায়। শেষকালে চানা ইলেওয়াদির হল দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। আমরা এখন যারা এখানে থাকি তারা সবাই ওদেরই বংশধর। হ্যাঁ, ওরাই আমাদের সবচেয়ে পুরনো বাবা-মা।

মানুষ বাড়ছে। বনের শুয়োর বাড়ছে। কিন্তু শুয়োর বাড়ছে অনেক বেশি। বেজায় অসুবিধে। শুয়োররা তো নিজেরা খেতে পারে না। এত শুয়োরকে খাওয়ানোই হল এক দায়। চানা ইলেওয়াদি আর কি করে? সে এক বুদ্ধি করল। ছোট্ট শুঁড়ের নিচে খুঁচিয়ে ফুটো করে দিল। মুখ হল শুয়োরের। এখন নিজেরাই খুঁজেপেতে খাবার খেতে লাগল। ঝামেলা কমল। কিন্তু আবার কষ্টও বাড়ল। শুয়োরগুলো নিজেরা খেতে শিখে চালাক হয়ে

উঠল। মানুষের ওপর আর নির্ভর করতে হচ্ছে না। নিজেরাই খাবার-দাবার খুঁজে নিচ্ছে। ঘন বনে ঢুকে পড়ছে। তাদের শিকার করা কঠিন হয়ে পড়ল। তোমো তীর-ধনুক নিয়ে অনেক কষ্টে তবেই শুয়োর শিকার করতে পারে। আগে হাতের কাছেই শুয়োর পাওয়া যেত। এখন তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতে হয়। অবশ্য তীর-ধনুক ভালোই চালাতে পারে মানুষ। কেননা, ফুলুগা আকাশে কিংবা পাহাড়ের চূড়োয় যাবার আগে তোমোকে গাছের ডাল থেকে তীর-ধনুক বানাতে শিখিয়েছিল, তীর ছুড়তে শিখিয়েছিল। এখন তো তোমো জলেও তীর ছুড়তে পারে, মাছের গায়ে বিঁধে যায় সেই তীর।

সেই চলে যাওয়ার পরে ফুলুগা আর একবার পৃথিবীতে এসেছিলেন। চানা ইলেওয়াদির কাছে এসেছিলেন। তিনটে কাজ তিনি শিখিয়ে গেলেন। ঝুড়ি আর জাল বুনতে শেখালেন। বড় কাজে লাগল মানুষের। আর মেয়েদের কিভাবে সাজতে হবে তাও শেখালেন। লাল-সাদা কাদামাটি দিয়ে কিভাবে মুখে-হাতে-বুকে-পায়ে ছবি আঁকতে হয় তা শিখিয়ে দিলেন চানা ইলেওয়াদিকে। না সাজলে কি মেয়েদের মানায়?

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি। ফুলুগা তো চলে যাবেন, তিনি নিষেধ করলেন কয়েকটা কাজ করতে। ঝমঝম বৃষ্টির সময়ে কয়েকটা ফল খাবে না, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির সময়ে সূর্য চলে গেলে চারিদিকে আঁধার হলে তারা যেন কোনো কাজ না করে। শুধুই বিশ্রাম। আঁধার হবার পরে কাজ করলে পোকা-জন্তু-জানোয়ার বিরক্ত হবে। তারা বিরক্ত হলে মানুষের ভালো হবে না। সন্ধ্যের পরে কুঠার দিয়ে গাছ কাটবে না, কাঠ কাটবে না। বড় বিশ্রি শব্দ হয়। তাতে মানুষের মাথা ধরবে, ফুলুগারও মাথা ধরতে পারে। বড় বিরক্তিকর। ওসব করবে না। যাওয়ার আগে দেবী ফুলুগা আর একটা মস্ত উপকার করলেন। স্বামী-স্ত্রী, তোমো ও চানা ইলেওয়াদিকে কথা বলতে শিখিয়ে গেলেন। সেটাই তো আমাদের আদি ভাষা।

তোমো একদিন সমুদ্রের ধারে বসে মাছ ধরছে। ধরা পড়েছে একটা বিরাট মাছ। ডাঙার কাছে আসতেই মাছটা এমন জোরে লেজের ঝাপটা দিল যে চারিদিকে চৌচির হয়ে গেল। অনেক ছোট ছোট নদীর জন্ম হল। ছোট ছোট নানা ডাঙা হল। তখন সেইসব ডাঙায় জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ ছড়িয়ে পড়ল। তারা সঙ্গে নিল জলন্ত আগুন আর ঘর-সংসার পাতার টুকিটাকি জিনিসপত্র। লোক তো তখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। এমনি

করে নানা ডাঙায় নানা ধরনের লোকজন বসতি করল। কত রকমের মানুষজন, কত রকমের ভাষা।

অনেক কাল কেটে গিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে তোমো ও চানা ইলেওয়াদির। এখন তারা বুড়ো-বুড়ি হয়েছে। চারিদিকে তাদের বংশধর। শেষকালে একদিন তোমো জলে নামল, ডুব দিল,—আর উঠল না। তার পরেই বৌ জলে নামল, ডুব দিল,—আর উঠল না। তোমো হয়ে গেল সমুদ্রের তিমিমাছ,—যাকে দেখে সমুদ্রের সব জন্তুই ভয় পায়। এমন কি এতবড় কচ্ছপও ভয় পায়। চানা ইলেওয়াদি হয়ে গেল সমুদ্রের কাঁকড়া। দুজনেই সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। আর তারা মানুষ রইল না।

তোমোর চলে যাবার পরেও ওতিমির সর্দার হল কোল্‌য়োত। সে ছিল তোমোর নাতি। কোল্‌য়োত ছিল মহা শক্তিশালী পুরুষ। যা আগে কেউ পারেনি, সে তা পেরেছিল। সে সমুদ্রের এক বিরাট কচ্ছপকে শিকার করেছিল। আশ্চর্য শক্তি। খুব ভালো সর্দার।

কোল্‌য়োত একদিন বুড়ো হল। সে মারা গেল। তখন থেকেই আমাদের কপাল খারাপ হতে শুরু হল। দেবী ফুলুগা যা যা নিষেধ করেছিলেন, তোমো তা শুনত, কোল্‌য়োত তা শুনত। কিন্তু তাদের পরে আর তেমন কেউ ওসব নিষেধ গ্রাহ্য করত না। যা খুশি তাই করত। নিষেধের কথা মনেই আনত না।

দূর আকাশ কিংবা পাহাড়ের চূড়ো থেকে সবই দেখছেন ফ্‌লুগা। তাকে দেখা যায় না, তিনি সব দেখেন। ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। তার নিষেধ অমান্য করা? এবার বুঝবে মজা। বন্যা বইয়ে দিলেন চারিদিকে। সেই পাহাড়ের চূড়ো ছাড়া আর সবকিছু জলের তলায়। সবাই ডুবে মরল। শুধু চারজন বাদে। দুজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে তখন নৌকোয় ছিল। জল যত বাড়ছে, নৌকো উপরে উঠছে। তাই তারা বেঁচে গেল। বন্যা সবাইকে ডুবিয়ে দিল, চারজন শুধু বেঁচে রইল।

অনেক দিন পরে জল নামল। একে একে ডাঙা ভেসে উঠল, জেগে উঠল বন আর মাটি। কোনো জন্তু নেই, মানুষ নেই। ঐ চারজন ওতিমিতে ফিরে এল। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আগুন নেই, আগুন নিবে গিয়েছে। সর্বনাশ।

হাজার হলেও ফ্‌লগা দেবী। কতক্ষণ আর রেগে বসে রইবেন তিনি? আবার সৃষ্টি করলেন সমস্ত প্রাণী। মানুষ তো আছেই। প্রাণী সৃষ্টি করে তিনি আর কিছু করলেন না।

মানুষের মধ্যে আগুন নেই। দিন কাটে, রাত কাটে। বড় কষ্ট মানুষের। আগুন নেই,—যেন কিছুই নেই। মুখে কিছুই রোচে না, রান্না করা যাচ্ছে না। উপায়ও নেই।

একদিন একটা মাছরাঙা পাখি তীরের বেগে ছুটে চলেছে। সে আনবে আগুন। আগুন আছে ফ্লুগার ডেরায়। কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হবে। ফ্লুগা দেখলে আর আস্ত রাখবেন না। ফ্লুগা তখন আগুন পোয়াচ্ছিলেন। একটু আনমনা ছিলেন। ঠোঁটে এক টুক্‌রো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়েই উড়ে চলল মাছরাঙা। ডানার শব্দে চোখ ফেরাতেই ফ্লুগা দেখতে পেলেন মাছরাঙার কাণ্ড। একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে মাছরাঙার দিকে ছুড়ে মারলেন। মাছরাঙা এঁকেবেঁকে উড়ছে, জ্বলন্ত কাঠ তার গায়ে লাগল না। ফস্‌কে গেল। জ্বলন্ত কাঠ এসে পড়ল,—পৃথিবীতে, ওতিমিতে। সেই জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল চারজন মানুষ। সে আগুন আর কোনোদিন নেভেনি। এখনও জ্বলছে।

ঐ চারজন মানুষ থেকে আরও মানুষ বাড়তে লাগল। ঐ চারজন তো বন্যার কথা জানে। ফ্লুগা যে বন্যায় ডুবিয়েছে পৃথিবীকে তাও জানে। তারা প্রায়ই এসব কথা বলাবলি করে। সবাই জানে বন্যার কথা; ফ্লুগার রাগের কথা। মানুষ তখন ঠিক করল,—ফ্লুগাকে বরং মেরে ফেলাই ভালো। তারা ভাবল, তাদের পরামর্শের কথা অন্য কেউ জানতে পারবে না। তারা ভুল করল।

ফ্লুগা সব জানলেন। শেষ বারের মতো নেমে এলেন পৃথিবীতে। বললেন, 'তোমরা মানুষেরা আমার নিষেধ অমান্য করেছিলে, তাই শাস্তি পেতে হয়েছিল। এখন আমাকে মেরে ফেলবার কথা ভাবছ। আমার দেহ শক্ত কাঠে গড়া। যদি কারও সাহস থাকে আগে আমার দেহে তীর ছোড়।'

মানুষেরা ভয়ে-বিস্ময়ে চুপ করে রইল। ফ্লুগা আবার বললেন, 'আবার তোমরা আমার নিষেধগুলো অমান্য করে চলেছ। আমার নিষেধ মনে রেখো। আমাকে মেরে ফেলার কথা মন থেকে মুছে ফেলবে। নইলে বিপন্ন হতে পারে।' ফ্লুগা চলে গেলেন। আর ফেরেন নি।

সেদিন থেকে ফ্লুগার সব নিষেধ তারা মেনে চলল। আমরাও মেনে চলেছি। তাই কোনো বিপদ আসেনি। ফ্লুগার নিষেধ মেনে চললে বিপদ আসবে কেন?

সাবাই ঘাসের জন্মকথা

সে অনেক কাল আগের কথা। এক গাঁয়ে ছিল সাত ভাই। আর তাদের ছিল এক আদরের বোন। ভাই-বোনে খুব মিল। হবে না কেন? সাত ভাইয়ের একটাই বোন।

একবার সাত ভাই ঠিক করল, তারা একটা পুকুর কাটবে। জলের বড় অভাব। লেগে গেল কাজে। সারা দিনমান কাজ করে। অনেক কষ্ট হল, অনেক পরিশ্রম হল। পুকুরও হল অনেক গভীর। কিন্তু তবু জলের দেখা নেই। এতটা মাটি তোলা হল, জল বের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পুকুরের তলায় তেমনি শক্ত লালচে মাটি। জল নেই, জলের দেখা নেই, পুকুরে ভিজে ভিজে মাটি নেই। পুকুর শুকনোই রইল।

একদিন সাতভাই পুকুরের পারে বসে রয়েছে। নানা চিন্তা, কত রকমের কথা। কেন জল নেই পুকুরে? অথচ এত গভীর পুকুর। এখন কি করা উচিত? এইসব। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, দূরের পথ দিয়ে একজন যোগী এদিকেই আসছেন। তার হাতে একটা লোটা।

পুকুরের কাছে আসতেই সাত ভাই যোগীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে এই পুকুর কেটেছি। দেখুন, কত গভীর করে কেটেছি। তবু জল উঠছে না। কি করি বলুন তো? আপনি তো অনেক কিছু জানেন। কত দেশে দেশে, বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়ান। অনেক কিছু দেখেছেন। আপনি বলে দিন,—কি করলে পুকুরে জল আসবে? টল্‌টলে জলে পুকুর ভরে যাবে?'

যোগী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপরে সব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের একটা বোন আছে। আদরের বোন। পুকুরের নামে তাকে যদি উৎসর্গ কর, পুকুর জলে ভরে উঠবে। টল্‌টলে জলে ভরে উঠবে।'

যোগী আর কোনো কথা বললেন না। সাত ভাই কি বলবে তা শুনবার জন্য অপেক্ষাও করলেন না। দূর বনের পথে এগিয়ে গেলেন।

যোগী চলে যেতেই সাত ভাই চমকে উঠল। এ কি করে সম্ভব? বোন যে তাদের বড় আদরের। একমাত্র বোন। তাকে উৎসর্গ করতে হবে? বোন তো মরে যাবে। তবে? কিন্তু পুকুরেও যে জল নেই। এত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে? তারাই বা কি করবে? দেখাই যাক না কি হয়। যোগীর

কথামতো একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক। সলা-পরামর্শ চলল। একবার মত হয়, আবার মত পাল্টায়। শেষে বোনকে উৎসর্গ করাই ঠিক হল। সবাই রাজি হল।

পরের দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তারা মাকে বলল, 'আজকে দুপুরে বোন যখন পুকুরে আমাদের খাবার নিয়ে যাবে তখন ওকে খুব সাজিয়ে পাঠাবে। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরতে দেবে। আমাদের খাবার দেবে নতুন পাত্রে। আর বোনের সঙ্গে দেবে একটা নতুন মাটির লোটা। সে ঐ লোটাতে করে আমাদের জন্য খাবার পরে জল বয়ে আনবে। ভুলে যেও না কিন্তু।'

সাত ভাই রওনা দিল পুকুরের দিকে। পথে কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। মন খারাপ হয়ে আছে। আহা! তাদের আদরের বোন। কিন্তু উপায় কি?

দুপুর হল। বনে-মাঠে-আকাশে আগুন। বোন আসছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। সাত ভাই বোনকে দেখে মাথা নিচু করে ফেলল। বুকের মধ্যে যেন মাদল বাজছে। কষ্টের মাদল। বোন হাসতে হাসতে কাছে এল। কি সুন্দর লাগছে তাদের বোনকে। ঝলমলে পোশাক, হাতে-গলায়-কানে ঝকমকে গয়না, পরিপাটি চুলে ফুলের বাহার। বোনকে উৎসর্গ করতে হবে? বোন আর বেঁচে থাকবে না? তাদের চোখে জল টস্‌টস্ করতে লাগল। বুক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

ভাইদের চোখে জল দেখে আদরের বোন উতলা হল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছ কেন?'

ভাইরা নিজেদের সামলে নিল। কষ্টের হাসি হেসে বলল, 'দূর পাগলী। কই কিছু হয়নি তো? এমনি।'

খাবার নিল তারা। নতুন মাটির লোটা নিয়ে বোনকে পুকুরে নামতে বলল। খাবার পরে জল দরকার। বোন তো কিছুই জানে না। লোটা নিয়ে হাল্‌কা পায়ে পুকুরের দিকে গেল। উঁচু পারে উঠতেই পুকুরের তলায় মাটি থেকে জল উঠ্‌তে লাগল। কুল্‌কুল্ করে জল উঠছে। নেমে গেল পুকুরের ঢালু বেয়ে। জলের কিনারে যেতেই জল এসে লাগল তার পায়ের পাতাতে। টল্‌টলে জল। সে নতুন মাটির লোটা হাতে নিয়ে নিচু হল,—জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, আরও বাড়ছে। লোটা ডোবাল জলে, অনেক জল তবু লোটা

ডুবল না। এ কি? এত জল, তবু লোটায় কেন জল ঢুকছে না! আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে পায়ের পাতা ডুবছে!
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল আরও বেড়ে চলেছে। আরও টলটলে হয়েছে জল। জল আদরের বোনের হাঁটু ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে জলে হাঁটু ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা।
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল বাড়ছে। টলটলে জল বাড়ছে। জল আদরের বোনের কোমর ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে জলে কোমর ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল বাড়ছে। আরও টলটলে জল। আদরের বোনের গলা ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,

ডুবছে ডুবছে জলে গলা ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা ?

শেষকালে জল আরও বেড়ে চলল। টলটলে জল অল্প অল্প ঢেউ তুলে আদরের বোনের চোখ-কপাল-চুল ডুবিয়ে দিল। জল মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আর তখনি নতুন মাটির লোটা টলটলে জলে পূর্ণ হয়ে উঠল। বোন এখন জলের তলায়। হাওয়ার দোলায় জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে পুকুরময় ছড়িয়ে পড়ছে। শুকনো পুকুরে টলটলে জল,—আদরের বোন জলের তলায়। বোন ডুবে গেল। জলের তলায় আদরের বোন হারিয়ে গেল।

এখন হয়েছে কি, এই দুঃখী বোনের আগেই বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের শুভদিনও ঠিক হয়ে ছিল। আর সেই দিনের বেশি দেরি ছিল না। সেই দিন এসে গেল। সেদিন সকালে বিয়ের ঘটক এসে মেয়ের ভাইদের জানাল,—বর আসছে, একটু পরেই রওনা দেবে। বিয়ের সব ব্যবস্থা যেন ঠিকঠাক থাকে। ভাইদের মাথায় বর্ষাদিনের বাজ পড়ল।

বর এল। সঙ্গে অনেক বরযাত্রী। বর এল সুন্দর সাজানো পালকিতে। তারা গাঁয়ের বাইরে এসে থামল। খবর পেয়েই সাত ভাই সেখানে গেল। বরকে বরণ করল। তারপরে শুরু হল খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান। আনন্দ, আনন্দ,—মাদলের মিষ্টি সুরে গান আর নাচ।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেল। তবু কেন কনে আসছে না? এতক্ষণ তো আসা উচিত ছিল। সাত ভাইও তো তেমন কিছু বলছে না। বরযাত্রীরা কনের কথা জানতে চাইল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? এবার কনে আসুক। ভাইরা নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। এই তো আসবে। আসলে বোন তার বন্ধুদের সঙ্গে একটু দূরের বনে গিয়েছে, শুকনো কাঠ কুড়োতে। তাই একটু দেরি হচ্ছে। আসলে বোন গিয়েছে কিছু দূরের নদীতে, জল আনতে গিয়েছে। তাই একটু দেরি হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ চলুক গান আর নাচ।

আরও অনেক সময় কেটে গেল। কনে তবু এল না বর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বরযাত্রীদের বড় একঘেয়ে লাগছে। বিয়ের আনন্দে কনে না থাকলে কি ভালো লাগে? এবার তারা ভীষণ রেগে গেল। সাত ভাইকে যা-তা বলতে লাগল। বিয়ে করতে এসে এমন ব্যবহার কেউ করে? দরকার নেই

বিয়ের। তারা এ বিয়ে মানে না। তারা বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল। সাত ভাই জলভরা চোখে তাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যেরা জানবে কি করে, তাদের বুকের মধ্যে কত ব্যথা। হায়! আজ তাদের আদরের বোন তাদের কাছে নেই। দুঃখী বোন হারিয়ে গিয়েছে। তাদের দোষেই হারিয়ে গিয়েছে।

বরের পালকি আর বরযাত্রীর দল মাঠের পথ বেয়ে চলে যাচ্ছে। সেই পুকুরের পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে,যে পুকুরে আদরের বোন জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ তারা দেখল, পুকুরের মাঝখানে একটা সুন্দর ফুলের গাছ। আর সেখানে একটিমাত্র ফুল ফুটে রয়েছে,—এমন সুন্দর ফুল তারা জীবনে দেখেনি। রঙের কি বাহার!

বর পালকি থেকে সে ফুল দেখতে পেল। পালকির পাশে চলছিল একজন। সে মাদল বাজাচ্ছিল। বর তাকে বলল, 'ঐ সুন্দর ফুল আমার চাই।'

সে নেমে গেল পুকুরে। বুক জলে এসে হাত বাড়াল ফুলের দিকে। জল নড়ে উঠল, ওপাশে সরে গেল। ফুল চলে গেল নাগালের বাইরে। হঠাৎ ফুল গান গেয়ে উঠল,

ফুল দেব দুল নাও, বন্ধু,
ভেঙো না ভেঙো না ডাল, বন্ধু।

মাদল-বাদক চমকে উঠল। ফুল কথা কইছে? ফুল সরে যাচ্ছে? জল থেকে উঠে এল তক্ষুণি। বরকে এসে বলল,---ফুল যে গান গেয়েছিল। বর অবাক হল। তাহলে সে একবার চেষ্টা করুক। দেখাই যাক না, কি হয়!

পুকুরের পারে এল বর। তাকিয়ে রইল ফুলের দিকে। জলের ধারে নামতে যাবে,—এমন সময় দুলতে দুলতে জল কেটে ফুলের গাছ এগিয়ে আসতে লাগল বরের দিকে। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ফুল মাথা নেড়ে দুষ্টু মেয়ের মতো এগিয়ে আসছে। তার সামনে এসে থেমে গেল ফুলের গাছ। জলের তলায় হাত ডুবিয়ে মাটি থেকে শেকড় সমেত ফুলের গাছ তুলে আনল বর। ফুল সমেত গাছ নিয়ে পালকির ভেতরে গিয়ে বসল। আজকের দিনে মনে যে ক্লান্তি এসেছিল, বিয়ে করতে এসে যেভাবে বিরক্ত হয়েছিল,—এখন সে সবকিছু ভুলে গেল।

বর চলেছে পালকিতে, পাশে পাশে বরযাত্রীর দল। সবাই ক্লান্ত। যারা পালকি বইছিল, হঠাৎ তারা অবাক হল। এ কি! পালকি হঠাৎ এত ভারি

হয়ে উঠল কেন? তারা ক্লান্ত বলে কি? কিন্তু না। পালকি আগের চেয়ে অনেক ভারি। একজন পাশে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে চেয়ে দেখল। বরের পাশে ফুটফুটে বৌ বসে রয়েছে। ঝলমলে পোশাক দেহে, কানে-হাতে-গলায় ঝকঝকে গয়না। মাথায় ফুলের বাহার। হলুদ রঙের শাড়িতে কি সুন্দর মানিয়েছে বৌকে। ফুল হল কনে, বরের বৌ। হবেই বা না কেন? ঐ সুন্দর হলুদ রঙের ফুলই তো সাত ভাইয়ের আদরের বোন দুঃখী বোন। সেই বোন যে জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছিল।

বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। আলো-আঁধারিতে বেজে উঠল মাদল। বনে বনে অনেক পাখির কিচির-মিচির গান। পাগুলো নেচে উঠল নাচের ছন্দে। গলায় বিয়ের গান। আনন্দে তারা গাঁয়ের দিকে চলল বর আর নতুন বৌকে নিয়ে। আনন্দ, আনন্দ—চারিদিকে আনন্দ। সুখের সংসার।

সাত ভাই গাঁয়ে থাকে। তারা এসব কিছুই জানে না। এমনি করে দিন যায়। সাত ভাইয়ের জীবনে দুঃখ নেমে এল চরম দুঃখ। জমি গেল, ফসল ঘরে আসে না। পেট চলে না, অনাহার। তাই তারা বনে কাঠ কুড়োতে লাগল। সেই কাঠ মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে। তারা বনে বনে শালপাতা কুড়োতে লাগল। কাঠিতে গেঁথে গেঁথে শালের পাতার থালা তৈরি করে। মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে। গাঁয়ের মধ্যে তাদের মতো গরিব আর কেউ ছিল না। হায়! সাত ভাই।

এমনি করে কষ্টে দিন চলে। চড়া রোদ্দুরে অনেক দূরের দূরের গাঁয়ে তাদের যেতে হয়। যতক্ষণ বিক্রি না হয়, ততক্ষণ ঘোরে। বিক্রি হলেই পেটের খাবার জোটে, নইলে নয়।

ঘুরতে ঘুরতে সাত ভাই একদিন এসেছে এক নতুন গাঁয়ে। গাঁয়ের পথে হেঁকে চলেছে শুকনো কাঠ, শালপাতার থালা। গাঁয়ের পথে একজন তাদের একটা বাড়িতে যেতে বলল। সে বাড়িতে ক'দিন পরেই একটা বিয়ের উৎসব হবে। তাই চাই অনেক কাঠ, অনেক শালপাতার থালা। বাড়ির পথ দেখিয়ে দিল সে। তারা চলল সেই বাড়ির পথে। হ্যাঁ, ঠিকই। সে বাড়িতে এসব দরকার।

মাথার বোঝা নামিয়ে তারা বসেছে। দরদাম, গোনাগাঁথা চলছে। হঠাৎ দাওয়ার ওপরে একটি বৌ এল। বৌ সাতভাইকে দেখে চমকে উঠল, বুক ঠেলে কান্না এল। তার ভাইদের এ কি অবস্থা! দেহে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, তাও এক চিলতে। কোনোরকমে কোমরে জড়ানো। দেহ রোগে

পুড়ে পুড়ে উনুনের ঝিঁকের মতো কালো হয়েছে। তাতে খড়ি উঠছে, ফেটে ফেটে গিয়েছে চামড়া, ঠিক যেন কুমিরের দেহের মতো। ভাইদের এমন দশা কেমন করে হল ?

বোন উঠোনের পাশে গাছতলায় নামল। আরও কয়েকজন মেয়ে এল তার পাশে। তারা দূর থেকে কাঠ-পাতা কেনা দেখছে। বৌটি কাঁদতে লাগল, চেপে চেপে কাঁদছে। চোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল পড়ছে। বন্ধুরা অবাক হল। বৌ কাঁদছে কেন ? কি হয়েছে ?

বৌ বলল, 'কিছুই হয়নি তো ! ঐ ঘরের চাল থেকে একটুকরো খড় চোখে পড়েছে তাই।'

বন্ধুরা ঘরের চাল থেকে বেরিয়ে-আসা খড়েব ডগা ভেঙে দিল। তবু বৌ কাঁদছে, চেপে চেপে কাঁদছে। আবার কি হল ? আবার কেন চোখে জল ?

বৌ বলল, 'ও কিছু নয়। একটা পাথর রয়েছে মাটিতে, দেখিনি তো ! পায়ে লেগেছে আঘাত। তাই।'

বন্ধুরা মাটি থেকে পাথরটা টেনে তুলল। ফেলে দিল দূরে। তবু বৌ কাঁদছে, এবার ঝর্ঝর্ করে কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। আবার কি হল ? আবার রান্না কেন ?

এবার বৌ আর মিথ্যে কথা বলতে পারল না। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কেন কাঁদছি ? না কেঁদে থাকি কেমন করে ? ঐ যারা শুকনো কাঠ বিক্রি করছে, ঐ যারা শালপাতা বিক্রি করছে,—ওরা কারা জানো ? ঐ ছেঁড়াখোঁড়া লেংটি-পরা লোকগুলো কে জানো ? ওরা আমার আপন ভাই। ওদের আমি আদরের বোন। কেন এমন দশা হল ?' আর বলতে পারল না বৌ, কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে।

খবর শুনল বৌয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী। সে কি কথা ? ওরা সবাই বৌমার ভাই ? ওরা যে ঘরের অতিথি, আদরের অতিথি ! বৌকে কাঁদতে নিষেধ করল, তাদের বাড়িতে যখন একবার এসেছে তখন কোনো ভাবনা নেই। বৌ শান্ত হল। বড় ভালো শ্বশুর-শাশুড়ী।

সাত ভাইকে তখনি তারা অনেকটা তেল দিল। কাছের নদীতে গিয়ে গায়ে ভালোভাবে তেল মেখে তারা স্নান করে আসুক। এদিকে খাওয়ার তৈরি হয়েই আছে।

সেই সাত সকাল থেকে মাথায় বোঝা নিয়ে সাত ভাই গাঁ থেকে গাঁয়ে ঘুরছে। এখন দুপুর। প্রচণ্ড খিদে। পেট ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। চোখে

অন্ধকার, মাথা ঘুরছে। খিদের সময় কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে? নদীর পথে যেতে যেতে তারা গায়ে মাথার তেল খেয়ে ফেলল। গায়ের নোংরা ওঠাবার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী তেলের সঙ্গে খৈল দিয়েছিল। তাও তারা খেয়ে ফেলল।

ফিরে এল বোনের বাড়ি। দেহের চামড়া তেমনি খসখসে খড়িওঠা রয়েছে। সব বুঝল তারা। আবার দিল তেল আর খৈল। কিন্তু এবার সঙ্গে দিল বাড়ির একজনকে। তার সঙ্গে তারা চলল নদীর পথে। ভালোভাবে তেল মেখে, জলে নেমে খৈল দিয়ে দেহ পরিষ্কার করে সাত ভাই স্নান করল। উঠে এল ওপরে। বাড়িতে এলে তাদের নতুন কাপড় দেওয়া হল। নতুন কাপড় পরে তারা বসল। এতক্ষণে সাত ভাইকে মানুষের মতো মনে হচ্ছে। কি যে অবস্থা হয়েছিল তাদের! তাদের দিকে তাকিয়ে বোন একটু শান্তি পেল।

এবার ঘরে আসন পাতা হল। আমাদের সমাজের নিয়ম মতো বয়স অনুযায়ী সাত ভাই বসল। প্রথমে বড় ভাই, তারপর পরপর বয়স বুঝে অন্য ভাইরা বসল, একেবারে শেষে ছোট ভাই। সবার সামনে শালপাতার থালা। থালায় ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত আর গরম সুস্বাদু শুয়োরের মাংস। বহুদিন এমন ভাত আর মাংস তারা চোখে দেখেনি। এমন পরিপাটি করে কেউ তাদের অনেক কাল খেতে দেয়নি। তারা খেতে শুরু করল। সামনে বসে রয়েছে তাদের আদরের ছোট বোন। তারা খাচ্ছে।

বোন আস্তে আস্তে বলল, 'ভাইরা, কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। আজ খাবার জন্য তোমরা আমার বাড়িতে এলে। তোমাদের কি দশাই হয়েছে। আমারই বাড়িতে বসে তোমরা কত সুখে খাচ্ছ, নতুন কাপড় পরে খাচ্ছ। আর এই তোমরাই আমাকে পুকুরে উৎসর্গ করেছিলে। শুকনো পুকুর জলে ভরে উঠবে,—তাই তোমরা আদরের বোনকে উৎসর্গ করে দিলে। পারলে কি করে?' বোনের দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে।

সাত ভাই লজ্জায় মুখ নিচু করল। এ তারা কি করেছিল? সত্যি, আজ ভাবতে অবাক লাগে, এ কাজ তারা করল কিভাবে? তাদেরই তো আদরের ছোট বোন! হায়! এ তারা কি করেছিল? লজ্জায় তারা মরে যাচ্ছে। সামনে বোন কাঁদছে।

সাত ভাই আকাশের দিকে চাইল। সেখানে পালাবার পথ নেই, আকাশের পথে মুক্তির পথ নেই। তারা চোখ নামাল। মাটির দিকে চাইল, পৃথিবীতে পালাবার পথ খুঁজল। হঠাৎ সামনের মাটি দুফাক হয়ে ফেটে গেল,

পৃথিবী দ্বিধা হল। তারা গভীর খাদের মধ্যে ঢুকতে চাইল। লজ্জা থেকে বাঁচতে চাইল। ঢুকে পড়ল গভীর পৃথিবীর মধ্যে। একে একে। হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ভাই। বোনের চোখের সামনে মাটির গভীরে ভাইরা হারিয়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বোন পাগলের মতো হয়ে গেল। ও কথা সে কেন বলল ভাইদের? মনে বড় দুঃখ হয়েছিল তাই। কিন্তু ভাইরা এ কি করল? বোন একথা কেন বলল? হায়! হায়! হায়!

ছোট ভাই ছিল বোনের সবচেয়ে কাছে। সে যখন ঢুকে চলেছে গভীর ফাঁকের মধ্যে, বোন আর সহ্য করতে পারল না। বুক ফেটে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে ছোট ভাইকে ধরতে গেল, সে ঢুকে পড়েছে, বোন হাত দিয়ে চেপে ধরল ভাইয়ের চুলগুলো। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ভাই, ফিরে আয়, ভাই আমার।' প্রচণ্ড গতিতে ছোট ভাইও হারিয়ে গেল। বোনের হাতের মুঠোয় রইল ভাইয়ের কয়েকটি চুল।

চোখের সামনে চুলগুলো ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল আদরের বোন, ঘরের বৌ। এ কথা সে কেন বলল? এ কাজ কেন করল? হায়!

কান্না থামিয়ে বোন উঠল। তাদের সুন্দর সাজানো বাগানের এক পাশে গেল। ছোট ভাইয়ের স্মৃতি, হাতের মুঠোয় ধরা চুলগুলো যত্ন করে চোখের জলে ভিজিয়ে পুঁতে দিল মাটিতে। নরম হাতে চাপা দিল ঝুরঝুরে মাটি। ভাইয়ের স্মৃতি থাক ঐখানে, ঐ বাগানে।

একদিন সেই মাটি-চাপা স্মৃতির চুলগুলো থেকে সুন্দর ঘাস গজিয়ে উঠল। মানুষের চুল থেকে ঘাস। ভাইয়ের চুল থেকে ঘাস। বোনের হাতে-বোনা ঘাস। আজকের সাবাই ঘাসই হল সেই ঘাস। এমনি করেই সাবাই ঘাস জন্মাল। সবাই বলে, এই হল সাবাই ঘাসের জন্মকথা।

অনেক সায়েস্তা সে

এখন আমরা যেমন দেখতে পাই, সেই অনেক কাল আগে কিন্তু অন্যরকম ছিল। তখন পাহাড়ের ঐ উঁচুতে থাকত যত রাজ্যের শেয়াল আর পাহাড়ের একেবারে নিচের দিকে থাকত যত রাজ্যের বাঘ। শেয়ালরা পাহাড় থেকে নামত না, বাঘরা পাহাড়ে উঠত না।

একদিন, কেন জানি না, তাদের মধ্যে ঠিক হল, তারা নিজেদের এলাকা বদলাবে। একের এলাকায় চলে যাবে অন্যে। শেয়াল আসবে পাহাড়ের নিচের বনভূমিতে, আর বাঘ যাবে পাহাড়ের ঐ উঁচু বনভূমিতে। সব ঠিক হয়ে গেল। রাতও ঠিক হয়ে গেল।

দল বেঁধে বাঘেরা চলেছে পাহাড়ের চূড়োর দিকে, দল বেঁধে শেয়ালেরা নামছে পাহাড়ের চূড়ো থেকে। বাঘেরা উঠছে যে পথে, শেয়ালেরা নামছে সেই পথেই। ওপর থেকে নিচে ভালোভাবে সব কিছু দেখা যায়। বেশ দূর পথ থেকেই শেয়ালেরা দেখতে পেল, সারি সারি বাঘের পাল ওপরে উঠে আসছে। এত বাঘ? তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা যদি তাদের আক্রমণ করে? এক এক থাবায় তো অনেক শেয়াল মরে যাবে: তাদের মেরে বাঘেরা যদি খেয়ে ফেলে? সবারই চার পা কাঁপতে লাগল। একই পথে উঠে আসছে অসংখ্য বাঘ!

কিন্তু তারা শেয়াল। এত সহজে দমবার পাত্র তারা নয়। দারুণ তাদের উপস্থিত বুদ্ধি। জোয়ান মতো একটা শেয়াল এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ তার চোখের কোণে ঝিলিক খেলে গেল। পাশেই রয়েছে একটা বিরাট লম্বা গাছ। আর তার তলায় মরে পড়ে রয়েছে একটা বিরাট হাতি। যেন পাহাড়ের একটা মস্ত কালো পাথর। জোয়ান শেয়াল সময় নষ্ট না করে দৌড়ে গেল হাতির কাছে, লাফিয়ে উঠে পড়ল শোয়ানো হাতির পেটের ওপরে। অন্য শেয়ালদের কাছে ডাকল, হাতির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতে বলল। বন্ধুর কথায় বন্ধুরা তাই করল।

চুপ করে রয়েছে জোয়ান শেয়াল। চুপ করে রয়েছে চারপাশের অনেক শেয়াল। বাঘেরা সারি বেঁধে ওপরে উঠছে। আরও ওপরে। তাদের প্রায় কাছাকাছি।

হঠাৎ হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা জোয়ান শেয়াল পেছনের দুপায়ে ভর

দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুপা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'এই হাতি আমিই মেরেছি। খুব সহজে মেরেছি।' বাঘেরা তখন একেবারে কাছে চলে এসেছে। শেয়াল চিৎকার করে বলল, 'হাতি তো মারলাম। এখন, নিয়ে এস আমার পাথরের অস্ত্র। প্রথম যে বাঘ আসবে তার মাথার খুলি একেবারে গুঁড়িয়ে দেব। আমি তৈরি।'

বাঘের পাল শুনতে পেল শেয়ালের কথা। দেখতে পেল, মস্ত হাতির ওপরে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ঐ বিশাল হাতি ঐ শেয়ালই মেরেছে। আশ্চর্য! বাঘেরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। বাঘেদের জটলা বেঁধে গেল। পেছনের বাঘ সামনের বাঘকে ঠেলে, সামনের বাঘ পেছনে ঢুকতে চায়। ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। কেউ আগে যেতে চায় না, কেউ সামনের সারিতে থাকতে চায় না। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি থেকে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। পেছন থেকে যারা ঠেলছে তারা কথা বলছে কম, কিন্তু একেবারে সামনে রয়েছে যারা তারা ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। প্রচণ্ড গর্জন। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে আওয়াজ শতগুণ হচ্ছে। বাঘেরা সেই একই জায়গায় রয়েছে।

এবার হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা শেয়াল হাসতে হাসতে বলল, 'ও আমার বাঘভাই, তোমরা আমাদের ভয় পেয়ো না, আমাদের দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে? আমরা সবাই ভাই ভাই, আমরা সবাই বন্ধু। তাই না? আর তা যদি না হয়, তবে এখন থেকে বন্ধু হতে দোষ কি?'

শেয়ালের কথায় বাঘেরা একটু শান্ত হল। তবু পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা শেয়ালের ভাবভঙ্গি দেখে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে।

শেয়াল আবার শুরু করল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান ভাব-ভালোবাসা শুরু হোক। তোমাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা অনেক মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের ছেলেদের বিয়ে-থাওয়া হোক। প্রথমে একজনকে দিয়েই না-হয় শুরু হোক। আমিই প্রথম বিয়ের চলন শুরু করি। কি রাজি তো?'

বাঘেরা বুঝল, এ প্রস্তাবে রাজি না হলে সর্বনাশ। যাক, অস্ত্রের ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সম্মতি জানাল। প্রাণ তো কারও গেল না! সেই ভালো।

সেই মুহূর্তে এক বাঘিনীর সঙ্গে সেই শেয়ালের বিয়ে হয়ে গেল। দুই

গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। তারা বন্ধু হল। বাঘের দল পাহাড়ের ওপরের জঙ্গলে চলে এল, শেয়ালের দল নেমে এল পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলে। শেয়াল নতুন বৌকে নিয়ে এক পাহাড়ী গুহায় সংসার পাতল।

একদিন শেয়াল আর বাঘিনীর খুব খিদে পেয়েছে। ঘরে কিছুই নেই। বাঘিনী বলল, 'শিকার করা দরকার। চলো, শিকারে যাই।' শেয়াল চুপ করে রইল, আপত্তি করল না। দুজনে চলল শিকারে।

কোথায় বাঘিনী আর কোথায় ক্ষুদে শেয়াল! বনের পথে এক জায়গায় গিয়ে বাঘিনী বলল, 'তুমি এই সরু পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ওধার থেকে পশুদের তাড়িয়ে আনছি। এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপরে।' শেয়াল রাজি হল।

একটু পরেই শেয়াল দেখতে পেল, ঘন জঙ্গলের পথ দিয়ে কয়েকটা বড হরিণ এ পথেই প্রাণভয়ে ছুটে আসছে। এত বড় বড় হরিণ? কি লম্বা ছুঁচলো শিঙ? বুক কাঁপতে লাগল। শেয়ালের সাহসই হল না, ভয় পেয়ে গেল। কেমন করে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে? যদি তার পেট ফেঁসে যায় কিংবা চোখে ঢুকে যায় ছুঁচলো শিঙ? সে দাড়িয়ে রইল। হরিণগুলো বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঘিনী আসছে অনন্দে। লম্বা জিবে মুখ চাটছে। এল বাঘিনী। অবাক হল সে। একটা হরিণও মরে পড়ে নেই। শেয়াল একা দাঁড়িয়ে আছে। কেন? কি হল? শিকার কই?

শেয়াল ভীষণ রেগে গিয়েছে। রাগে সে কাঁপছে। বাঘিনীর কানের ওপরে প্রচণ্ড এক থাবার চড় মেরে শেয়াল বলল, 'আর কোনোদিন যেন এরকম করতে না দেখি। ছিঃ ছিঃ। জন্তুদের ভয় পাইয়ে শিকার করা? এ শিকার কি আমায় সাজে? বেচারা হরিণগুলো! শিকার করতে হবে বীরের মতো। মনে থাকবে তো?'

কি আর করে বাঘিনী! হাজার হলেও সে স্বামী। বৌ হয়ে তার কথার জবাব দেবে কেমন করে? সে খুব ভালো বৌ। চড় খেয়েও টুঁ শব্দটি করল না। স্বামীকে মেনে চলাই যে বৌয়ের ধর্ম। বাঘিনী সব সহ্য করল।

তখন তারা গেল একটু দূরে। সেখানে আনমনা হয়ে অনেক হরিণ ঘাস, গাছের পাতা খাচ্ছে। অনেক অনেক হরিণ। শেয়াল ঝোপে লুকিয়ে রইল। পাসে এসেছে নেহাৎ একটা ছোট্ট বাচ্চা হরিণ। তার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল শেয়াল। সে বোধহয় তেমন পালাতে শেখেনি। বাঘিনী দেখল। এতটুকু

বাচ্চা হরিণ ? এতে কি খিদে মিটবে ? এ কি ? এত বড় বড় হরিণ ছিল। এখন তো তারা পলিয়েছে। কেন ? কি হল ? বড় শিকার কেন সে মারল না ?

শেয়াল রেগে গিয়ে বাঘিনীর আর এক কানের গোড়ায় থাবার চড় বসাল। হাজার হলেও স্বামী তো ! বাঘিনী এ অপমান সহ্য করল। সে বড় ভালো বৌ।

তৃতীয় বার। তারা দুজনে গিয়েছে শিকার করতে। বনের মধ্যে এক ফাঁকা জায়গায় অনেক বুনো মোষ ঘাস খাচ্ছে। বাঘিনীর জিবে জল এল। সে স্বামীকে বলল, এবার তাহলে বুনো মোষ শিকার করুক শেয়াল। শেয়ালের বুকের মধ্যে বর্ষাকালের আকাশের মতো আওয়াজ হতে লাগল। কি বিশাল কালো দেহ, কি ভয়াবহ চোখের চাহনি, কি মারাত্মক মাথার ওপরের দুটো শিঙ, কি বড় পায়ের খুর। শেয়াল এদিক-ওদিক চাইল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাঘিনী অশান্ত হয়ে উঠল। কি হল কে জানে ! হাজার হলেও বাঘিনী তো ! দেহটা লম্বা করে গলাটা বাড়িয়ে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেল বাঘিনী। মোষের পাল পালাচ্ছে, বুনো মোষের পাল। এক লাফে একটার পিঠে উঠল বাঘিনী। অল্প দূরে গিয়েই মোষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পিঠের ওপরে বাঘিনী। মোষের গলা লম্বা হয়ে গেল, ছট্‌ফট্‌ করছে সে, মাটিতে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। বাঘিনী ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে, দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেয়াল।

এবার শেয়াল ছুটে এল বাঘিনীর কাছে। চোখে আগুন, পোড়ানো কাঠ-কয়লার মতো লাল। শেয়াল ছুটে এসেই বাঘিনীর পেছনে মারল এক লাথি। রক্ত উঠে এল বাঘিনীর মাথায়। কিন্তু হাজার হলেও সে স্বামী। মাথা নিচু করে বাঘিনী শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে রইল শেয়ালের দিকে।

শেয়াল মরা বুনো মোষের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এটা কি ধরনের শিকার করা ? এক আঘাতে কখনও শিকারকে মেরে ফেলতে হয় ? লাফিয়ে পড়লাম পিঠে, দাঁত বসালাম গলার নিচে.—ব্যাস শিকার শেষ। শিকারকে খেলাতে হবে। সে এগিয়ে যাবে, ছোট্ট করে দাঁত বসাবে। শিকার ঘুরে দাঁড়াবে, ভয় পাবে, একটু তেড়ে আসবে, আবার পালাবে। আবার ছোট্ট করে আঘাত। খেলাতে খেলাতে তাকে ক্লান্ত করে তুলতে হবে। এই তো বীরের মতো শিকার। আমি তাই ভাবছি,—আর তুমি ছুটে গেলে ? স্বামীকে অমান্য ? খবরদার। আর যেন না দেখি।'

বাঘিনী বড় ভালো বৌ। সে নিজের ভুল বুঝল। আর হবে না কখনও। শেয়ালের রাগ পড়ল।

আর একবার তারা দুজনে গিয়েছে একটা পাহাড়ী নদীর পাশে। নদীটা পার হতে হবে। বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। দেহ জলের তলায়, মাথাটা জলের ওপরে। সহজেই পার হয়ে গেল সে। শেয়াল জলে নামল না। কি স্রোত! সে ভয় পেল। বাঘিনী তখন অন্য পারে উঠে পড়েছে। এপাশ থেকে চিৎকার করে শেয়াল বৌকে ডাকল। বাঘিনী এ পারে চলে আসুক, তারপরে স্বামীকে নিয়ে নদীর ওপারে যাক। বাঘিনী তক্ষুণি জলে নেমে পড়ল। পাহাড়ী নদীতে স্রোত ঠেলে এপারে উঠল। পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেয়াল। পারে উঠে আসা মাত্র শেয়াল বাঘিনীকে একটা লাথি মেরে বলল, 'আমি তখনও তোমাকে অনুমতি দিই নি, আমার অনুমতি ছাড়াই তুমি জলে নেমে পড়লে? এতবড় স্পর্ধা? স্বামীকে অমান্য করা? আর যেন কখনও না দেখি।'

হাজার হলেও বাঘিনীর স্বামী! সে তো বড় ভালো বৌ। লাথি খেয়েও চুপ করে গেল। অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আর হবে না। শেয়াল খুশি হল। এরকম বৌ না হলে কি সংসার চলে?

আর একবার। আর একটা পাহাড়ী নদী পেরোতে হবে। বাঘিনী আর শেয়াল পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলে নামল শেয়াল। জলে নামল বাঘিনী। জলের ওপর মাথা তুলে বাঘিনী সোজা সাঁতার দিয়ে চলেছে। স্রোতের মধ্যে চলেছে বাঘিনী, সে অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেয়াল জলে নেমেই বুঝল মস্ত ভুল করেছে। একে পাহাড়ী নদী, তার ওপরে কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। জলের গতি প্রচণ্ড। শেয়াল যত দেহকে সোজা রাখতে চাইল, স্রোত তত বেঁকিয়ে দিচ্ছে দেহকে। একটু পরেই শেয়াল বুঝল সোজাসুজি নদী পার হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে কি ডুবে মরবে? দু-একবার চেষ্টা করতে গিয়ে জল খেল, নাকে জল ঢুকল। কিন্তু সে তো হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। সে দেহ এলিয়ে দিল। কোন চেষ্টা করল না। শেয়ালের দেহ স্রোতের টানে ভেসে চলল। গা ছেড়ে দিয়েছে শেয়াল। এমনি করেই যাওয়া যাক।

বাঘিনী সোজা পার হয়ে গিয়েছে পাহাড়ী নদী। পারে এসে তাকিয়ে দেখে, নিচের দিকে ভেসে চলেছে তার স্বামী। নদীর তীর বেয়ে ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে নিচের দিকে হাঁটতে লাগল বাঘিনী। ঐ দিকে চলেছে শেয়াল।

অনেক নিচে গিয়ে শেয়াল তীরে উঠল। হাঁপিয়ে গিয়েছে সে। তবে

পড়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাঘিনী এল শেয়ালের কাছে তাকে দেখেই শেয়াল চিৎকার করে উঠল, তাকে প্রচণ্ড বকুনি দিতে লাগল বাঘিনী তার বৌ, কোথায় তার পেছনে পেছনে সে আসবে, না একা একা পার হল? এ কি বৌয়ের মতো কাজ? বড্ড বেড়ে গিয়েছে বৌ। শেয়াল এগিয়ে গেল বাঘিনীর দিকে। কি হল কে জানে! হাজার হলেও বাঘিনী তো? একটা থাবা এসে পড়ল শেয়ালের মুখে। দূরে ছিট্‌কে পড়ল শেয়াল। ঠিক যেন একটা পাথর। পাথরটা ওখানে পড়ল,—নড়ল না, এপাশ ওপাশ গড়াল না, পরেই থেমে গেল। শেয়াল লম্বা হয়ে পড়ে রইল। নিথর, এক খণ্ড নরম তুলতুলে পাথর।

বাঘিনী শেয়ালের বৌ। কিন্তু অনেক সয়েছে সে। হাজার হলেও বাঘিনী তো!

বড় ভালো বৌ তারা দুজন

অনেক কাল আগে এক পাহাড়ী গাঁয়ে থাকত একটা লোক। তার ছিল ছিল একটি ছেলে। কিশোর বালক। তার নাম কারে। একদিন বাবা-ছেলে আগুনের পাশে বসে রয়েছে! গল্প-গুজব করছে। হঠাৎ ছেলে বলল, 'বাবা, আমাকে কিন্তু একটা তীর-ধনুক দিতে হবে।'

বাবা কোনোদিন তীর-ধনুক দেখেনি, এরকম কোনো জিনিসের নামও শোনে নি। বাবা জানেই না, তীর-ধনুক আবার কিরকম দেখতে হয়। তাই বাবা কিছু বলতে পারল না। চুপ করে রইল। যে জিনিস সে কোনোদিন দেখেনি, তা নিয়ে সে কথা বলবে কেমন করে?

ছেলে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল। তীর-ধনুক তার চাই-ই। বারবার একই কথা বলতে লাগল, একই জিনিস চাইতে লাগল। বাবা আর কি করবে? জানতে চাইল, —তীর-ধনুক কেমন দেখতে হয়। ছেলে বলল। বুঝিয়ে দিল বাবাকে। শেষকালে বাবা ধনুকের মতো একটা জিনিস বানিয়ে দিল। চুল্লি থেকে এক টুকরো কাঠ তুলে নিল, আগুন নিভিয়ে ফেলল আর সেই কাঠ থেকে তৈরি করল একটা তীর। কারের আনন্দ দেখে কে! সেই তীর-ধনুক নিয়ে সারাদিন সে খেলে বেড়াল।

রাত্তির হল। খেলা বন্ধ। ভোর হতেই আবার খেলা শুরু হল। হাতে তীর-ধনুক। বাড়ির বাইরে খুব কাছাকাছি খেলছে কারে। পাশ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে যাচ্ছিল একটা মুরগী। নিজেদের মুরগী। তীর ছুটে গেল কারের ধনুক থেকে। উল্‌টে পড়ল মুরগী। মরে গেল। পরের দিন খেলছে কারে, হাতে তীর-ধনুক। শুয়োরের একটা বাচ্চা ছাইগাদায় খাবার খুঁজছে। নিজেদের শুয়োর। তীর ছুটে গেল কারের ধনুক থেকে। ছট্‌ফট্ করল শুয়োরের বাচ্চা, চিৎকার করল, পা চারটে ছড়িয়ে পড়ল। মরে গেল শুয়োরের বাচ্চা।

বাবা ভীষণ চটে গেল। দু-দুটো প্রাণী মারা পড়ল ছেলের হাতে। অকারণে। বাবা রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি যদি এভাবে নিত্যিনিত্যি ঘরের পোষা পশুপাখি মারতে থাক তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কয়েকদিনেই তা সব শেষ হয়ে যাবে। কিছুই বাকি থাকবে না। পশুশিকার যদি

করিতেই চাও, তবে বনে চলে্ যাও। সেখাসে অনেক বুনো পশুপাখি আছে। ঘরের পশু আর মারবে না। বনে চলে যাও।'

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে আমাকে সত্যিকারের তীর-ধনুক বানিয়ে দাও। বাঁশের তৈরি বাঁকানো ধনুক, বাঁশের তৈরি ছুঁচলো তীর। আমি ঠিক বনে চলে যাব।'

কিন্তু তাদের এলাকায় ভালো বাঁশগাছ জন্মায় না। বাবা এখন কি করবে? এধারে বাঁশের ভালো তীর-ধনুক না পেলেও তো ছেলে ছাড়বে না? আর মারা পড়বে ঘরের নিরীহ মুরগী আর শুয়োরের বাচ্চা। বাবা আর কি করে? রওনা দিল দূর পাহাড়ী বনে। সেখানে রয়েছে খুব সুন্দর বাঁশের ঝাড়। চলেছে পাহাড়ী পথে, বাবা চলেছে বাঁশ আনতে। শেষকালে বাবা পৌছল এক পাহাড়ী গাঁয়ে। চারিদিকে বন। আবিঙ-নিবো-র গাঁয়ে। সেই গাঁয়ের পাশে একটি সমাধি রয়েছে। উইয়ু তোতিক-বোত্তের-সমাধি। সেই সমাধির ওপরে সুন্দর সুন্দর বাঁশের গাছ। এত সুন্দর গাছ আর কোথাও নেই। সেখান থেকে সে কেটে আনল একটা লম্বা লক্‌লকে বাঁশ। তার থেকে তৈরি করল খুব শক্ত একটা ধনুক আর অনেক ছুঁচলো তীর। ফিরে এল বাড়িতে। তুলে দিল ছেলের হাতে। কারে মহাখুশি। হ্যাঁ, এতদিন যা সে চেয়েছে এবার সত্যিসত্যি তাই হাতে পেল। একেই বলে তীর আর ধনুক প্রতিদিন সকাল হলেই কারে চলে যায় পাহাড়ী বনে। মনের সুখে বুনো জন্তু মারে, বুনো মুরগী মারে। মনে আনন্দ, হাতে সঠিক নিশানা। তাদের বাড়িতে অনেক মাংস, অভাব রইল না।

গাছের ডালে ডালে বাঁদররা কারের কাণ্ড-কারখানা দেখে। ভয় পায়। একদিন তারা বলাবলি করছে, 'এই ছেলে তো সাংঘাতিক! এ দেখছি একদিন আমাদেরও মারবে। মেরে শেষ করে দেবে। ওর তো আছে তীর ধনুক। আমাদের যা নেই। কি যে হবে?'

বাদুড় ওদের কথা শুনতে পেল। উড়ে এল বাঁদরদের কাছে। বলল, 'কোনো ভয় নেই। আমি আছি। আমি ঠিক তীর-ধনুক ছিনিয়ে আনব। তোমাদের দেব। তোমরাও তীর-ধনুক পাবে।

পরের দিন সকালে কারে বেরিয়েছে শিকারে। হাতে ভয়ানক তীর-ধনুক। এক তীরের আঘাতে সে মেরে ফেলল একটা বুনো দাঁতালো শুয়োরকে। আশ্চর্য নিশানা তার। বেত গাছের দড়ি দিয়ে শুয়োরকে বাঁধল, পিঠে ফেলে রওনা দিল কারে। শুয়োরের মাথা নিচে ঝুলছে, দুলছে।

বাদুড় উড়ে এল কারের কাছে। বলল, 'কি শক্তিমান তুমি। আশ্চর্য তোমার গায়ের শক্তি। আমি জীবনে তোমার চেয়ে সাহসী আর শক্তিশালী মানুষ দেখিনি। সাবাস!'

কারে হাসল। তৃপ্তির হাসি।

বাদুড় আবার বলল, 'কিন্তু, তুমি ঐ বেত গাছের দড়ি নাও কেন? ও কি তোমায় মানায়? আমি আরও ভালো দড়ির খবর জানি। ঐ দেখ, ঐ গাছ থেকে লম্বা লম্বা লতা ঝুলছে। ওগুলো আরও শক্ত। এই নাও একটা। শুয়োরটাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেল। ঝুলিয়ে নাও পিঠে। বাড়ির দিকে হাঁটা দাও। মানাবে ভালো।' লতাটা কারের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বাদুড় উড়ে ঘন গাছের ফাঁকে চলে গেল। নতুন কিছু জানার আনন্দে কারে খুশি হল।

দাঁতালো শুয়োরের দেহ থেকে খুলে ফেলল বেত গাছের শক্ত দড়ি। অনেক দিন থেকে সে এই দড়িই ব্যবহার করে আসছে। শুয়োরের দেহে জড়াতে লাগল নতুন-পাওয়া লতার দড়ি। পিঠে ঝুলিয়ে নিল শুয়োরটাকে। মাথা নিচের দিকে, শুয়োর ঝুলছে, দুলছে।

পটাং করে ছিঁড়ে গেল লতা। পিঠ থেকে শুয়োর গেল পড়ে। শুয়োরের একটা দাঁত এসে বিঁধে গেল কারের পায়ে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল। কারের মুখ-চোখের চেহারা পালটে গেল। খুঁড়িয়ে চলল বাড়ির পথে। বাদুড় ছিল কাছেই। নেমে এল। কারের তীর-ধনুক তুলে নিল। সেগুলো ছিল বাঁদরদের। তারা মহাখুশি।

কারে যখন বাড়ি পৌঁছল তখন তার পা ভীষণ ফুলে গিয়েছে, যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করছে। এসেই সে শুয়ে পড়ল। রক্ত-পড়া বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দেহ পুড়ে যাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণা। কয়েকদিন কেটে গেল। পা আরও ফুলেছে। টোট্‌কা ওষুধে কোনো কাজ হল না। কারে মারা গেল।

কারের দুই বৌ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এ তাদের কি হল? এই বয়সে স্বামী মারা গেল? আর তো কিছু করার নেই। যেখানে দাঁতালো শুয়োরটা পড়ে ছিল, যেখানে কারে আহত হয়েছিল,—কারের দেহকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে মাটির তলায় শুইয়ে দিল দুই বৌ। সব কাজ করল, কিন্তু সবসময় তারা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ভালেঙ উইয়ু এমন কাজ করল, সেই আমাদের স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।' তারা কাঁদছে।

দুই ভালো বৌ তখন পাখি হয়ে গেল। পাখি হয়ে উড়ে চলল বনের ওপর দিয়ে। উড়তে উড়তে এল তালেঙ-এর গাঁয়ে। গাঁয়ে পৌঁছে দেখে, তাদের স্বামী কারে একজন উইয়ু হয়ে গিয়েছে। সে রয়েছে সেখানে।

গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা গাছ। দুই পাখি-বৌ সেই গাছের ডালে বসল। কাঁদতে কাঁদতে কারেকে ডাকতে লাগল,—স্বামী আসুক বৌদের কাছে,—আসুক আসুক আসুক। কাঁদছে আর বলছে, বলছে আর কাঁদছে।

পাখিদের এই কান্না আর চিৎকারে উইয়ুরা ভীষণ রেগে গেল। বড় বিরক্ত করছে তো দুটো পাখি! তারা তাদের দিকে তীর ছুড়ল। ফস্‌কে গেল তীর। তীর তাদের গায়ে লাগল না। তখন তারা কারেকে ডাকল। তাকে তীর ছুড়তে বলল। সেই মারুক ঐ পাখি-দুটোকে। সে তো বিরাট শিকারী। কারে এল, ধনুকে তীর লাগিয়ে নিশানা করে ছেড়ে দিল তীর। ফস্‌কে গেল নিশানা। পাখিদের গায়ে লাগল না।

কারেকে তীর ছুড়তে দেখে অবাক হল দুই বৌ। তাদের গায়ে তীর লাগল না, কিন্তু ঝপ্‌ করে নিচের ঝোপে পড়ে গেল। ওপর থেকে পড়েও তারা বেঁচে রইল। কারে গেল কাছে। ঝোপের মধ্যে। তাকে দেখেই পাখি দুটো আর পাখি রইল না। তারা সত্যিকারের বৌ হয়ে গেল। তারা মানবী হয়ে গেল। দুজনে কারেকে দুপাশ থেকে ধরে বাড়ির পথে নিয়ে চলল। পাহাড়ী পথে তারা তিনজনে চলেছে। অনেক কষ্টে তাদের স্বামীকে ফিরে পেয়েছে।

এমন সময় তারা এল সেই সমাধির কাছে, যেখানে দুই বৌ কারেকে মাটির তলায় শুইয়ে রেখেছিল। সমাধি দেখেই কারে বলল, 'সমাধির মধ্যে আমার অনেক কিছু রয়েছে। সেগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার। সেসব তো আমারই।'

কারে সমাধির এক পাশে খুঁড়তে লাগল। নরম মাটি। হাত দিয়ে মাটি তুলছে। একটা গর্তের মত হল। হাত অনেকটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কারে গর্তের মধ্যে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিল। মাথা দিয়ে নিজের মৃতদেহ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে কারে হয়ে গেল একটা শুয়োর, আর দৌড় দিল বনের পথে।

বৌ দুজন পাশে দাঁড়িয়েছিল। অতশত বোঝেনি। এবার বুকফাটা

কান্নায় ভেঙে পড়ল। শুয়োরের দৌড়নোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারা আর্তনাদ করে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কত কষ্ট করে তোমাকে ফিরিয়ে আনলাম। তুমি আবার আমাদের হলে। কত কষ্ট! কত কষ্ট! কিন্তু এ তুমি কি করলে? তুমি আবার শুয়োর হয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেলে। হায়!'

তবু তারা ভালো বৌ। হাল ছেড়ে দিল না। তারা তাদের পোষা কুকুরকে ডাকলো। তাকে পাঠাল বনের গভীরে। স্বামীকে খুঁজতে। তাদের স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে।

কুকুররা আজও শুয়োর দেখলেই নিজে থেকেই তেড়ে যায়। তারা আজও তাকেকে খুঁজছে, বৌ দুজনের স্বামীকে খুঁজছে। আজও পায়নি তাকে।

জেগে-ওঠা ভাগ্য

এক মায়ের পেটের দুই ভাই ছিল। হলে কি হবে, বড় ভাই ছিল ভীষণ হিংসুটে আর দুষ্টু স্বভাবের। ছোট ভাইকে দুচোখে দেখতে পারত না। সংসারের যত কঠিন আর নোংরা কাজ ছোট ভাইকে দিয়েই করাতো। ছোট ভাই শক্ত পাথুরে জমি চাষ করত, গোরু-মোষদের মাঠে নিয়ে যেত। সারাদিন তার এইভাবে খাটুনিতে কাটত। এত খাটুনি। কিন্তু খেতে পেত চারটে মাত্র চাপাটি। এই খেয়েই তাকে সারাদিন কাটাতে হত।

একদিন ছোট ভাই জমিতে বীজ ছড়াচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই জমিতে লাঙল দিয়ে জমিকে তৈরি করে নিয়েছে। বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বীজে কম পড়ে গেল। ফিরে এল বাড়িতে। আরও বীজ নিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে ভাই নেই, বড় ভাইয়ের বৌও নেই। কোথায় তারা বাইরে গিয়েছে। সে বীজ খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে সে রান্নাঘরে গেল। একটা হাঁড়ির মুখ খুলতেই দেখল, কি সুন্দর ভাত রান্না করা রয়েছে। কতদিন সে এমন ধপ্‌ধপে সাদা চালের ভাত খায়নি। ঢেকে রাখল হাঁড়ি। অন্য হাঁড়ি থেকে বীজ নিয়ে জমিতে গেল। মনে বড় ফূর্তি। আঃ কতদিন পরে ভাত খাবে।

সারাদিনের কাজের পরে ফিরে এল ঘরে। গোয়ালে রাখল গোরু-মোষ। খেতে দিল তাদের। খেতে বসল সে। সেই অন্য দিনের মতো শুকনো চাপাটি আর অল্প ডাল। সে কি? সে যে ভাত দেখে গেল হাঁড়িতে? কোনোদিন রাগে না সে। খাপ্পা হয়ে গেল। বড় ভাইয়ের এ কি ব্যবহার? বড় ভাইয়ের বৌয়ের এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার? সে রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করল। কেন তাকে ভাত দেওয়া হয়নি? অথচ আজ তো বাড়িতে ভাত রান্না হয়েছে?

বড় ভাই বলল, 'তোকে চাপাটি খেতে দেওয়া হয়েছে? রোজ তাই দেওয়া হয়? কেন জানিস্ না? তোর ভাগ্য সাত সমুদ্রের ওপারে যে ঘুমিয়ে আছে! ভালো জিনিস জুটবে কি করে? ভাগ্য যে ঘুমিয়ে রয়েছে।' বড় ভাই হাসছে, ঠাট্টা করছে। সে নিষ্ঠুর।

ছোট ভাই অতশত বোঝে না। সে ভাবল, তাই তো, ভাগ্য যদি সাত সমুদ্রের ওপারে ঘুমিয়ে থাকে, তবে ভালো জিনিস জুটবে কেমন করে? সে বিশ্বাস করল বড় ভাইয়ের কথা। বড় সরল সে। বড় ভাইয়ের নিষ্ঠুর ঠাট্টা

সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে ভাগ্যের ঘুমিয়ে থাকার কথা।

বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সাত সমুদ্রের ওপারে যেতে হবে। ছোট ভাই চলেছে গভীর বনের পথে। এই পথেই নাকি সেখানে যেতে হবে। আরও দূরে অনেক দূরে।

যেতে যেতে হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা মস্ত সাপ গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল, গাছের ডালে একটা মস্ত পাখির বাসা আর তার মধ্যে বাচ্চা পাখিদের কিচির মিচির শোনা যাচ্ছে। তক্ষুণি সে সাপটাকে মেরে ফেলল। বেঁচে গেল পাখির বাচ্চারা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সারাদিন হেঁটেছে। কোথায় আর যাবে? সে সেই গাছের নিচেই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই গাছে ছিল শকুনের বাসা। বাবা-মা ফিরে আসতেই বাচ্চারা সব বলল। নিচের ঐ লোকটা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছে। নইলে সাপ ঠিক তাদের খেয়ে ফেলত। সন্ধ্যেবেলা খাবার এনেছে বাবা-মা, বাচ্চারা তাই খাচ্ছে। নিচের দিকে তাকিয়ে বাবা-মার চোখে জল এল।

সকাল হলেই শকুন-শকুনি বিরাট ডানা মেলে নেমে এল গাছের নিচে। লোকটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাল। তার জন্যই তাদের বাচ্চারা বেঁচেছে। এখন সে কি চায়? প্রাণ দিয়েও তারা লোকটির উপকার করবে।

ছোট ভাই তার সব কথা বলল। সে যেতে চায় সাত সমুদ্রের ওপারে, তার ভাগ্যকে জাগাতে। এ আর এমন কি কথা? পিঠে চাপিয়ে তাকে সাত সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবে শকুন। সে তৈরি। ভাগ্যকে জাগানো হয়ে গেলে আবার তাকে পিঠে করে এখানে নিয়ে আসবে।

পাশে এক মস্ত গাছ। সে তাদের কথা শুনতে পেয়েছে। সে বলল, 'তাহলে আমার জন্যও একটা উপায় দেখ। আমার ভাগ্য এমন কেন জেনে এস। আমি এত বিরাট গাছ, কিন্তু দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে জানিও কেন এমন হচ্ছে।' বারবার অনুরোধ করল সেই গাছ।

শকুন-শকুনি উড়ে চলল। তাদের মেলে-দেওয়া ডানার ওপরে বসে রয়েছে ছোট ভাই। শেষকালে সাত সমুদ্রের ওপারের দেশে পৌঁছল তারা তিনজন। ছোট ভাই তার ঘুমিয়ে-থাকা ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলল। বলল, 'আমি বড় হতভাগা। আমাকে যে সাহায্য করতে হবে। আর তো ঘুমিয়ে

থাকলে চলবে না।' প্রথমেই জেগে-ওঠা ভাগ্যকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ঐ বিশাল গাছ কেন শুকিয়ে যাচ্ছে? সে বাঁচবে কেমন করে?'

তার ভাগ্য বলল, 'ঐ গাছের নিচে রয়েছে এক মস্ত সাপ। সে এক গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে বহুকাল থেকে গুপ্তধন ওখানে পোতা রয়েছে। তুমি গিয়ে ঐ সাপটাকে মারবে। গাছ আবার সবুজ পাতায় ভরে যাবে। আর গাছের নিচে যত মণি মাণিক্য সোনাদানা আছে সব তুমি নেবে।'

মেলে-দেওয়া ডানায় চেপে সাত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ফিরে এল তারা। এসে নামল সেই বনে। সাপ মারা পড়ল। গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ল, অনেক মণি-মাণিক্য সোনাদানা। শুকিয়ে ওঠা গাছ আবার সবুজ পাতায় ভরে গেল। জেগে-ওঠা ভাগ্য যা যা বলেছিল তাই হল। শকুন শকুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছোট ভাই নিজের দেশে ফিরছে। বনের পথে দেখতে পেল এক বুনো ঘোড়াকে। বুনো ঘোড়াকে সে কৌশল করে ধরল। তাকে পোষ মানাল। দুরন্ত সুন্দর ঘোড়া তার বশ মানল। তার সঙ্গী হল। ঘোড়ায় চাপল সে।' বনের পথে রওনা দিল।

যেতে যেতে সে এল এক রাজ্যে। দেখল, সেখানকার সব মানুষ কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। কারণ কি? জানতে পারল, গোষ্ঠীপতির একমাত্র মেয়ে খুব অসুস্থ। ধীরে ধীরে সে শুকিয়ে যাচ্ছে। কত চেষ্টা করা হয়েছে, কত চিকিৎসা করা হয়েছে, কত গাছ-গাছড়া খাওয়ানো হয়েছে, -কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গোষ্ঠীপতি সব দেবে যে তার মেয়েকে ভালো করে দিতে পারবে।

ছোট ভাই গেল গোষ্ঠীপতির বাড়িতে। নিজের গাঁয়ে থাকতে সে খুব সাধারণ অতি সামান্য একটা টোট্‌কা ওষুধ জানত। অতশত না ভেবে মেয়েকে খেতে দিল সেই ওষুধ। আশ্চর্য! মেয়ে ভালো হয়ে উঠল। অল্পদিনেই সেরে উঠল।

গোষ্ঠীপতির আর আনন্দ ধরে না। ছোট ভাইকে সে অনেক কিছু দেবে, এমন কি মেয়েকেও। সে চাইলে তার জামাইও হতে পারে। সে কি চায়? ছোট ভাই গোষ্ঠীপতির ধন-দৌলত পেল, সবচেয়ে মূল্যবান রত্নও পেল। গোষ্ঠীপতির মেয়ে তার বৌ হল।

শেষকালে ছোট ভাই নিজের পাহাড়ী গাঁয়ে পৌঁছল। গুপ্তধন, ধনদৌলত, বৌ—সব নিয়ে। তার ভাগ্যকে সে জাগিয়ে তুলেছিল। এখন সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

টাটন

সে অনেক কাল আগের কথা। এক বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে ছিল। মা বিধবা, তাই ছেলেকে নিয়ে থাকত বাপের বাড়িতে। ছেলেটির ছয় মামা। এমনি করে দিন যায়।

পাহাড়ী নদীতে ঢল নেমেছে। নিচের দিকে উথলে জল হুড়্‌হুড়্‌ করে বয়ে চলেছে। মামারা বলল, 'চলো ভাগ্নে, মাছ ধরতে যাই। বাঁশের ফাঁদ পেতে আসি।' ছেলের মহা ফুর্তি। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ছয় মামা নদীর ওপরের দিকে সুন্দর করে বাঁশের জালের আটল বাঁধল। সুন্দর ফাঁদ তৈরি হল। এ ফাঁদ এমনই, মাছ ঢুকবে কিন্তু বেরুতে পারবে না। ছেলেটি কিছুটা নিচের দিকে জালের আটল বাঁধল। সেখানে খুব স্রোত। সে ছোট, ভালো কাজ জানে না। যেমন তেমন করে ফাঁদ পেতে বাড়িতে ফিরে এল।

পরের দিন সকাল হতেই সাতজন গেল তাদের নিজের নিজের ফাঁদের কাছে। আশ্চর্য! তার মামারা কতো ভালোভাবে ফাঁদ পেতেছিল, কিন্তু বাঁশের জালে আটকে পড়েছে কয়েকটা কুচো চিংড়ি। আর কোনো মাছ নেই। আর ছেলেটির বাঁশের জালে মাছ ভর্তি। অনেক মাছ। তাদের ছট্‌ফটানিতে এই বুঝি জাল ভেঙে যায়। মামারা অবাক হল।

মামারা বলল, 'ভাগ্নে, এবার আমরা এখানে ফাঁদ পাতি। তুই আরও নিচে নেমে যা। ঐখানে ফাঁদ পেতে রাখ।' ভাগ্নে রাজি। মামারা ভাগ্নের জায়গায় ফাঁদ পাতল। খুব ভালোভাবে আটল বাঁধল। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করল। ছেলেটি নদীর নিচের দিকে অনেকটা নেমে গেল। সেখানে আরও বেশি স্রোত। পা রাখাই দায়। পরের দিন সকালে সেই একই কাণ্ড। আরও মজার কাণ্ড। আজ মামাদের ফাঁদে একটা মাছও ঢোকেনি। একটা কুচো চিংড়িও নয়। আর ছেলেটির ফাঁদভর্তি মাছ। চকচকে রুপোলি মাছে তার ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেল। মামাদের চাঙারি শূন্য।

অমনি করে মামারা প্রতিদিন নতুন করে ভাগ্নের জায়গায় ফাঁদ পাতে, আর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দেয় নদীর আরও নিচের দিকে। সকালে ছেলেটির ঝুড়ি ভরে যায় মাছে, মামারা পায় অল্প কিছু মাছ। কোনোদিন কিছুই পায় না। প্রত্যেক দিন ছেলেটিকে জায়গা পাল্টাতে হয়। একদম ভালো লাগে না। কিন্তু কি করবে সে? সে যে ছোট, মামারা বড়। সে যে বিধবা মায়ের অনাথ ছেলে।

এমনি করে দিন যায়। শেষকালে নতুন নতুন জায়গায় ফাঁদ পেতে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে গেল। এক কাজ নিত্যদিন ভালো লাগে? একদিন সে রেগেমেগে জলের তলায় আর ফাঁদ পাতল না। এক জায়গায় বড় বড় ঘাসের ঘন ঝোপ হয়ে ছিল। তার মধ্যে বাঁশের ফাঁদটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। মামারা জানে না ভাগ্নে কোথায় রেখেছে তার ফাঁদ।

পরের দিন সকালে মামারা ভাগ্নেকে ডাকল। নদীর কাছে যেতে হবে। ফাঁদে কেমন মাছ পড়ল দেখতে হবে। ছেলেটি অনেক দিন পরে মুখ খুলল। বলল, 'কালকে তো আমি ফাঁদ পাতি নি। আমার ফাঁদ জলের তলায় বসাই নি। ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। এমনি যাচ্ছি।' মামারা খুশি হল। ছেলেটি মামাদের পেছন পেছন চলল।

নদীর তীরে এসে মামারা নেমে পড়ল জলে। আর ছেলেটি গেল ঘন ঘাসের ঝোপের কাছে। আরে! ভেতরে একটা বনের ঘুঘু পাখি! ঠোঁট দিয়ে বাঁশের সরু কাঠিগুলো ভাঙার চেষ্টা করছে। ছেলেটি বুনো লতা ছিঁড়ে আনল। হাত ঢুকিয়ে ঘুঘুকে বের করল আর তার পায়ে লতার ফাঁস দিয়ে আনন্দে চলল বাড়ির দিকে। আজ সে নতুন কিছু ধরেছে। খুব ভালো লাগল তার।

এই অনাথ ছেলেটির ছিল গোরুর একটা বাছুর। যেমন নাদুস্-নুদুস্ তেমনি মসৃণ চিক্কণ কোমল তার দেহ। অমন সুন্দর বাছুর ও এলাকায় আর কারও ছিল না। ছেলেটি খুব ভালোবাসত তাকে। মামারা হিংসেয় জলে পুড়ে যেত। তাদের বাছুরগুলো কেন ওরকম সুন্দর নয়? একদিন সুযোগ পেল তারা। ছেলে গিয়েছে বনে। তারা বাছুরটাকে মেরে ফেলল। হিংসে বেশি হলে মানুষ সব পারে।

ছেলে বাড়ি ফিরে দেখে, পাশের বাঁশঝাড়ে তার বাছুর পড়ে রয়েছে। মাটি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। কি আর করবে সে! বসে বসে বাছুরের ছাল ছাড়িয়ে ফেলল। কষ্ট হল মনে, কিন্তু উপায় কি? বাছুরের একটা ঠ্যাং কেটে ফেলল। সেটা নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল এক ধনীর বাড়ির গোলাঘরের নিচে। এই লোকটির খুব দেমাক, সে নাকি খুব উঁচুজাতের মানুষ। গোরুর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, ছোঁয়ও না।

ছেলেটি তার বাড়ির এপাশ-ওপাশ ঘুরছে। এমন সময় দেখা হল ধনী লোকটির সঙ্গে। মুখোমুখী হতেই ছেলেটি বলল, 'এঃ, আপনার বাড়ির ভেতর থেকে কেমন যেন গোরুর মাংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

ভীষণ চটে গেল সে। এতবড় কথা? রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'শয়তান হতচ্ছাড়া বদমাইস কোথাকার! আমার বাড়িতে গোরুর মাংসের গন্ধ? তোর খুব আস্পর্ধা বেড়েছে। আমি হলাম গিয়ে উঁচুজাতের লোক। আমি কি ওসব খাই? হতচ্ছাড়া পাজি, তোকে বাঘে খায় না কেন? খোঁজ। খুঁজে দেখ। কোথায় গোরুর মাংস। যদি খুঁজে না পাস, তোকে মেরেই ফেলব। এতবড় কথা!' রাগে সে কাঁপছে, জ্বলছে।

'ঠিক আছে, খুঁজে দেখি।' বোকা-বোকা চোখে ছেলেটি বলল। এমন ভাব করল যেন সে কিছুই জানে না।

ছেলেটি আলগা পায়ে উঠোনের মধ্যে ঢুকল। এলোমেলো এধার-ওধার ঘুরতে লাগল। নাঃ, পাওয়া তো যাচ্ছে না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনী মানুষটি। আস্তে আস্তে আস্তে তার মুখে হাসি ফুটছে। ছেলেটি কোমর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে নানা জায়গায় উঁকি মারছে। ছেলেটি জানে কোথায় আছে গোরুর ঠ্যাং, কোথা থেকে গোরুর মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে আস্তে আস্তে গোলাঘরের কাছে গেল, নিচু হল। চিৎকার করে উঠল, 'আমি ঠিক বলেছিলাম। এই তো গোরুর মাংস।' লোকটির বুক কেঁপে উঠল। নিচ থেকে ছেলেটি ঠ্যাংটা বের করে আনল। সামনে তুলে ধরল।

লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। গাঁয়ে একথা জানাজানি হয়ে গেলে তার সর্বনাশ হবে। উঁচুজাতের দেমাক আর থাকবে না। সবার সঙ্গে সমান হয়ে যেতে হবে। হায় কপাল! এ তার কি হল? সে আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছে গেল। তাকে গোলাঘরের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। ছেলেটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'বাছা, তুই বড় ভালো ছেলে। তোর কত কষ্ট, বাবা নেই, মামারা তোকে দেখতে পারে না। তুই বড় অনাথ রে। তা বাবা, কাউকে যেন একথা বলিস না। সোনা ছেলে আমার। আমি তোকে অনেক সোনা-রুপো দেব। বলবি না তো?' তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে লোকটি অনেক রুপো নিয়ে এল। থলে ভর্তি করে ছেলের হাতে দিল। লোকটি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। ছেলেটি কোনো কথা বলল না। জিনিস নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। গোরুর ঠ্যাংটা পথে ঘন ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল।

বাড়ি পৌঁছিয়েই ছেলে মাকে ডাকল। বলল, 'মা, মামারা বেতের যে কুন্‌কেতে ধান মাপে সেটা নিয়ে এসো।'

মা ভাইদের কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ, তোদের ভাগ্নে কুন্‌কেটা চাইছে।

কেন চাইছে তা তো বাপু জানি না।' ছোট মামা কুন্‌কে হাতে দিদির সঙ্গে এল। ভাগ্নে রুপোর চাক্‌তিগুলো কুন্‌কেতে ভরে মাপতে লাগল। এত রুপো? ভাগ্নে পেল কোথা থেকে?

ফিরে এসে অন্য ভাইদের বলল, 'আশ্চর্য! ভাগ্নে অনেক রুপোর চাক্‌তি নিয়ে এসেছে। সেগুলো সব মাপছে। কোথায় পেল কে জানে! অনেক অনেক রুপো!'

মাপা হয়ে গেলে মা কুন্‌কে ফিরিয়ে দিতে এল। ভাইরা বলল, 'ভাগ্নেকে একবার পাঠিয়ে দাও তো।'

মা ফিরে এসে ছেলেকে বলল, 'তোর মামারা তোকে এখুনি ডাকছে। কি সব কথা আছে তোর সঙ্গে। যা দেখা করে আয়।'

ছেলেটি ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। গেল মামাদের ঘরে। মামারা একসঙ্গে বলে উঠল, 'তা ভাগ্নে, এত রুপো পেলি কোথায়? হাঁারে, কোথায় পেলি?' মামাদের চোখ চক্‌চক্ করছে।

ছেলেটি খুব শান্তভাবে বলল, 'এগুলো গোরুর মাসের দাম। তোমরা আমার যে বাছুরটাকে মেরে ফেলেছিলে, তার মাংস বিক্রি করে এই দাম পেলাম। হাটের লোকজন বলল, খুব ভালো মাংস। আরও চাই। আমাকে আবও মাংস আনতে পাঠিয়ে দিল। তাই এলাম। আবার যাব।'

মামারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা যদি গোরুর মাংস হাটে নিয়ে যাই, ওরা কিনবে তো? মানে আমাদের কাছ থেকে মাংস কিনবে তো?'

ছেলেটি উৎসাহ দিয়ে বলল, 'কেন কিনবে না? নিশ্চয়ই কিনবে। ওরা তো বসে রয়েছে। মাংস কিনবে বলেই বসে রয়েছে। তোমাদের তো অনেক অনেক গোরু আছে। সেগুলোকে মেরে তাদের সব মাংস যদি হাটে নিয়ে যাও, তবে কত টাকাই না পাবে। আমার তো মোটে একটা বাছুর। তাতেই কত পেলাম। তোমাদের তো ঘর ভরে যাবে।' ছেলেটি হঠাৎ চুপ করে গেল। নিজের ভাঙা ঘরে ফিরে গেল।

এক ভাই তক্ষুণি একটা গোরুকে কেটে ফেলল। বড় বড় ঝুড়িতে চাপিয়ে ছয় ভাই রওনা দিল। ভাগ্নে তাদের ডেকে বলল, 'শোনো মামা, গাঁয়ের ওখানে এক ধনী লোক থাকে। তাকে তো তুমি চেনোই। তার বাড়ির কাছে গিয়ে তার কাছে মাংস বেচতে চাইবে। তার বাড়ির কাছে গিয়ে

চিৎকার করে হাঁকবে—কে নেবে গোরুর মাংস ? খুব ভালো মাংস। মনে রেখো।'

ছয় ভাই পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবার মাথায় মাংসের ঝুড়ি। একটা বড় গোরুর অনেক মাংস। সেই ধনী মানুষের বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'আরও গোরুর মাংস আছে। কে নেবে গোরুর মাংস ? ভালো মাংস।'

অনেক লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁক শুনে বলল, 'হ্যাঁ গোরুর মাংস নেব। নামাও এখানে।' অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ছয় ভাই তখন ঢুকে পড়েছে ধনী লোকটির উঠোনে। লোকজনও সেখানে ঢুকল। ছয় ভাইকে তক্ষুণি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল আর সবাই মিলে বেদম প্রহার করল। একসঙ্গে বলে উঠল, 'হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! আমাদের পাড়ায় এসেছিস্ গোরুর মাংস বিক্রি করতে ? জানিস না আমরা কত উঁচুজাতের লোক ? আমরা খাব গোরু! তোরা এখানে ঢুকলি কি বলে ? মাংস বিক্রি করতে সাহস পেলি কেমন করে ?' বলছে আর মারছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে তারা ছয় ভাইকে পাড়া থেকে দূর করে দিল।

ছয় ভাই ফিরে আসছে বাড়ির পথে। সারা দেহে ব্যথা। চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছে, মাথার চুল ছিঁড়ে গিয়েছে। পথে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করছে, 'ওঃ! কি সাংঘাতিক ভায়ে! কিভাবেই না আমাদের বোকা বানালো! অমন সুন্দর গোরুটাকে কেটে ফেললাম ? কিছুই বুঝতে পারি কি আগে। শয়তান কোথাকার। গোরুও গেল, মারও খেলাম। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি মজা। বাড়ি গিয়েই ওর ঘর পুড়িয়ে দেব। ওকে ঘরছাড়া করব। আমাদের কাছেই থাকবে আর আমাদেরই জ্বালাবে ?'

বাড়ি ফিরে এসেই তারা আর কোনোদিকে তাকাল না। আগুন জ্বালিয়ে দিল ভায়ের ঘরে। বাঁশ আর কাঠের তৈরি ঘর। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। অল্পক্ষণ পরেই ঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেল। শুধু পড়ে রইল ছাইয়ের গাদা। কি আর করবে ছেলেটি! ছোট দুটো ঝুড়ি ছিল তার। সেই দুটো ঝুড়িতে বাড়ি-পোড়া ছাই ভর্তি করে নিল। তারপরে রওনা দিল দূরের এক গ্রামের পথে।

ছেলেটি আগেই শুনেছিল, এই গ্রামে সবার ভীষণ চোখের ব্যামো হয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখ, সবসময় কট্‌কট্ করে, অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুতেই চোখের এই রোগ সারছে না। কত লতা-পাতার রস লাগাচ্ছে, কত টোট্‌কা

ওষুধ দিচ্ছে;—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ছেলেটি গেল সেই গাঁয়ে। ছেলেটিকে গাঁয়ে ঢুকতে দেখে কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, 'ভিন্ গাঁয়ের ছেলে মনে হচ্ছে। তা কোনো কাজ আছে নাকি? কাকে চাই?'

ছেলেটি খুব নম্রভাবে বলল, 'না কাউকে চাই না। আমি এসেছি আপনাদেরই কাছে। শুনলাম, আপনাদের গাঁয়ের সবার চোখের ব্যামো হয়েছে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। কিছুতেই নাকি সারছে না? তাই ওষুধ নিয়ে এলাম। খুব ভালো ওষুধ। চোখের রোগ সারবেই।'

সবার মুখে হাসি ফুটল। বড ভালো ছেলে, ভিন্ গাঁয়ের ছেলে হয়েও কত উপকারী। তারা গাঁয়ের সবাইকে ডেকে আনল। কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। সবাই এল তাড়াতাড়ি। জড়ো হল এক জায়গায়। যার যা সামর্থ্য তাই দিল ছেলেটিকে। অনেক টাকা। হাতের থলে ভরে গেল। কেনই বা দেবে না? চোখের যন্ত্রণা তো সারবে।

ছেলেটি বলল, 'এক্ষুণি কিন্তু আপনারা এই ওষুধ চোখে লাগাবেন না। এ লাগাবার বিশেষ সময় আছে। দৈব ওষুধ তো! আমি কিছুটা পথ যাওয়ার পরে যেই চিৎকার করে বলব,—এবার ওষুধ চোখে লাগান, তখন ওষুধ চোখে দেবেন। চোখে দিয়ে ঘষবেন।'

বাড়ি-পোড়া ছাইয়ের বদলে অনেক টাকা-ভর্তি থলিটা ছেলেটি পিঠের ওপরে ফেলল। ভালোভাবে জুত করে রাখল। ছুটতে হবে তো? হাঁটছে ছেলেটি। পেছন থেকে শুনতে পেল, 'এখন কি চোখে ওষুধ দেব?' ছেলেটি জোরে পা চালালো, 'এখনও নয়, একটু পরে।' এমনি করে পেছন থেকে কথা ভেসে আসে, তারা অনুমতি চায়। আর দূর থেকে সেই গাঁয়ের মানুষগুলো শুনতে পায়, 'এখনও নয়।'

অনেক এগিয়ে গিয়েছে ছেলেটি। এবার যদি গাঁয়ের লোক তাড়াও করে তবু তাকে ধরতে পারবে না। আর কোনো ভয় নেই। দূরের পথ থেকে ছেলেটির গলা ভেসে এল, 'এবার ওষুধ লাগান।' বলেই দৌড় দিল ছেলেটি। পিঠে ভারি বোঝা, দৌড়তে গেলে বোঝা দুলছে এধার-ওধার। কিন্তু গ্রামবাসীরা অনেক পেছনে। খুব জোরে না দৌড়লেও চলবে। তবু যত তাড়াতাড়ি পারে সে পথ চলছে।

এদিকে গাঁয়ের সবাই তখন শতগুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। পোড়া ছাই চোখে ঢুকে ব্যথা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তারা ভালো হয়ে উঠবে ভেবে অনেকটা ছাই চোখে দিয়েছিল। উঃ, কি সর্বনাশ। চোখ ফুলে লাল হয়ে

একাকার। এখনকার কষ্ট অনেক বেশি। আগের যন্ত্রণা কিছুই নয়। এ কি হল তাদের? নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'টাকাও গেল, চোখের ব্যামোও বেড়ে গেল। কি ঠকবাজ ছেলে? কিভাবে ঠকিয়ে গেল? আসুক না আর একবার। হাত-পা বেঁধে এমন মার দেব যে জীবনে ভুলবে না।' বলছে আর চোখ কচ্‌লাচ্ছে। ভীষণ যন্ত্রণা।

ফিরে এল বাড়িতে। মাকে পাঠালো মামাদের বেতের কুন্‌কে আনতে। মা কুন্‌কে নিয়ে এল। দিদির পেছনে পেছনে এল ছোট ভাই। ভাগ্নে কেন কুন্‌কে চাইছে? দেখতে হবে সে কি করে। এসে দেখে,—ভাগ্নে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখেছে অনেক অনেক টাকা। আর কুন্‌কে দিয়ে সেইসব টাকা গুণছে। অবাক হল ছোট মামা। ছুটে এল দাদাদের কাছে। সব বলল। ভাগ্নে ফিরে এসেছে। আরও অনেক টাকা। অনেক অনেক টাকা। সেবারের চেয়েও বেশি।

ছয় ভাই অবাক হল। গেল ভাগ্নের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, কোথা থেকে এত টাকা পেলি? বল না ভাগ্নে?'

ছেলেটি শান্ত চোখে মামাদের দিকে তাকিয়ে বলল. 'বাড়ি পোড়া ছাইয়ের বদলে এই টাকা পেলাম। যে বাড়ি তোমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলে তার ছাই বিক্রি করে এই টাকা পেলাম। যে গাঁয়ে ছাই বিক্রি করে এলাম, সেখানকার মানুষজন বলছে,—আরও ছাই চাই, এত কম ছাই দিয়ে কি হবে? আরও ছাই নিয়ে এসো। আমার ঘরখানা তো ছিল ছোট্ট, তা থেকে আর কত ছাই হবে। তা আমি আর কোথায় বেশি ছাই পাব। তোমাদের অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলো অনেক বড় বড়। ভেবে দেখ, কত ছাই হবে। উঃ, ভাবতেই পারছি না। অত ছাই বিক্রি করলে তো টাকা বয়েই আনতে পারবে না। আর ভাবতে পারছি না।'

ছয় ভাই চলে এল। পরামর্শ করল, 'আমাদের ঘরগুলো পুড়িয়ে দি। কত টাকাই পাব। তখন আবার ঘর ছেয়ে নেব।' বলা মাত্রই কাজ শুরু হয়ে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে শিখা ওপরে উঠল। বাঁশ আর কাঠের বাড়ি জ্বলছে। মাটির সঙ্গে মিশে গেল ঘরগুলো। অনেক ছাই। এত ছাই বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব! তাও ছয়জন মিলে যতটা পারে চেপে ঝুড়িতে রাখল। ঝুড়িও অনেক বড়। মাথায় চাপিয়ে রওনা দিল।

ভাগ্নে তখন তাদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'শোনো মামা, ঐ

গাঁয়ে যাবে। ঐ গাঁয়ে সবার চোখের ব্যামো হয়েছে। গাঁয়ে ঢুকেই চিৎকার করে হাঁক দেবে,—ছাই নেবে গো? চোখের ব্যামো একদম সেরে যাবে। মনে রেখো।'

মাথায় ভীষণ ভারি বোঝা। তবু তাড়াতাড়ি চলেছে ছয় ভাই। আঃ! কত টাকাই না মিলবে। চোখ বুজে মাঝেমধ্যে ভাবছে সেই কথা। পথ চলছে আনন্দে। এসে গেল সেই গাঁ, এই গাঁয়েই সবার চোখের ব্যামো হয়েছে, এখানেই ভাগ্নে ছাই বিক্রি করে অনেক টাকা ঘরে নিয়ে ফিরেছে। গাঁয়ে ঢুকেই তারা হাঁক দিল, 'ছাই নেবে গো? চোখের ব্যামো একদম সেরে যাবে।'

পিল্‌পিল্ করে গাঁয়ের লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। তখনও তাদের চোখের জ্বালা একটুও কমেনি। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ছয় ভাইকে। মাথার ঝুড়ি কোথায় ছিট্‌কে পড়ল, দামী ছাই কোথায় হাওয়ায় গেল উড়ে। মোটা মোটা দড়ি এনে তারা বেঁধে ফেলল ছয় ভাইকে। আষ্টেপিষ্টে বাঁধল। তারা যে ছাই এনেছিল, তা এনে খুব করে তাদের চোখে ঘষে দিল, আর কয়েকজন মিলে শুরু করল বেদম প্রহার। সবারই রাগ, সবারই চোখ জ্বলেছে। সবাই মারতে শুরু করল। পালা করে মারছে আর চোখে ছাই ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে চলল এই অত্যাচার। গাঁয়ের লোকের রাগ শেষকালে কমল। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছেড়ে দিল ছয় ভাইকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ছয় ভাই বাড়ি ফিরল। হায় কপাল!

বাড়িতে ঢুকেই চেপে ধরল ভাগ্নেকে। এবার আর রক্ষা নেই। ওকে মেরেই ফেলবে তারা। এতবড় শয়তান। ওর জন্য ওদের সুন্দর ঘর পুড়ল, দেহের এই হাল হল। ভাগ্নেকে ধরেই ওরা একটা লোহার খাঁচায় পুড়ল। শক্ত করে দরজা এঁটে দিল। ভেতর থেকে খোলার কোনো উপায় নেই। ছয়জন মিলে মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলল সেই খাঁচা। খাঁচার মধ্যে ভাগ্নে। অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। নাঃ, এবার আর বাঁচার উপায় নেই। ঘন জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। সেই নির্জন জায়গায় গিয়ে তারা থামল। ধপাস্ করে ফেলে দিল খাঁচা। তারপরে বলল, 'নদীর জলে ডুবিয়ে তোকে মারব। খাঁচাসমেত তোকে জলে ফেলে দেব। দেখি কে বাঁচায় তোকে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার তুই মরবি। একটু পরেই মরবি।'

খাঁচা তো ভালোভাবে বাঁধাই রয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া দরকার। খেয়ে এসে ওকে জলে ডোবালেই চলবে। তারা গেল গাছের ফল খুঁজতে। একটু দূরে।

খাঁচার মধ্যে বসে বোকাবোকা চোখে চেয়ে আছে ছেলেটি। দু-একবার হাত দিয়ে দরজা নাড়ল। না, বেরিয়ে যাবার কোনোই উপায় নেই। এবার বুঝি মরতেই হবে।

এমন সময় ছেলেটি একজন লোককে দেখতে পেল। খুব সাবধানে পা ফেলে এদিক-ওদিক চেয়ে সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছে। সে একজন বিরাট সর্দারের ছেলে, সর্দারকে সবাই রাজা বলে। রাজার ছেলে শিকার করতে বেরিয়েছে। অনেক দূরের পাহাড়ী গাঁয়ে তার বাড়ি। শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেক দূর চলে এসেছে।

হঠাৎ শিকারী রাজপুত্রের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। এমন জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি। খাঁচার মধ্যে বসে রয়েছে পাখি নয়, জন্তু নয়,—একটা মানুষ। কাছে এল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? তুমি লোহার খাঁচার মধ্যে কেন? কে তোমায় খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে?'

ছেলেটি দুঃখের নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর বলেন কেন। আমার মামাদের একটা মেয়ে আছে। তার মতো সুন্দরী এই এলাকায় আর কেউ নেই। অন্য কোথাও নেই। কি রূপ তার! মামারা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না। আর আমার তো এই চেহারা। ওকে যদি বিয়ে করি, আমার তো ভীষণ হিংসে হবে। কি রূপ তার। লোকে আড়ালে আমাকে হাসি-ঠাট্টাও করতে পারে। কি বৌয়ের কি বর! আমি তাই ওকে কিছুতেই বিয়ে করতে চাই না। মামারাও ছাড়বে না। তাই আমার এই হাল হয়েছে। মত দিলে তবেই নাকি খাঁচার দরজা খুলবে। কি যে করি! ওঃ! মেয়ের রূপ যদি আপনি দেখতেন।'

রাজপুত্র অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো তাহলে মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারি। কি বল তুমি?'

ছেলেটি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তা পারেন। আপনার উপযুক্ত মেয়েই বটে। খুব মানাবে। মামারাও অরাজি হবে না।'

রাজপুত্র বলল, 'কেমন করে বিয়ে হবে? তুমি ঠিকঠাক বলে দাও।'

ছেলেটি এবার আরও উৎসাহ করে বলল, 'আপনি এই খাঁচার মধ্যে বসে থাকবেন। চুপটি করে বসে থাকবেন। অল্পক্ষণ পরেই মামারা এসে পড়বে।

তারা এসেই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে,—তোমার কি আর কিছু বলার আছে? তারা যখন আপনাকে এই প্রশ্ন করবে, আপনি জবাব দেবেন,—মামা, আমার বলার কথা একটাই আছে, আমি রাজি, আমি আপনাদের মেয়েকে বিয়ে করব। আমার মত হয়েছে। ব্যাস, তাহলেই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে যাবে।'

শিকারী রাজপুত্র আনন্দে ডগ্‌মগ্‌ হয়ে বলল, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। খুব ভালো।'

এবার ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখুন, আর একটা কথা আছে। আপনি যদি শিকারের ঐ পোশাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকে বসে থাকেন, তবে মামারা ঠিক আপনাকে চিনে ফেলবে। বুঝবে, এ তো তাদের ভাগ্নে নয়। তাহলে বিয়েও পণ্ড হয়ে যাবে। আমি খাঁচার থেকে বেরিয়ে আপনার পোশাক পরি, আর আপনি আমার পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকে পড়ুন। ব্যাস, তাহলেই হবে। একটু তাড়াতাড়ি করাই ভালো। মামাদের আসার সময় হয়ে এল। এই এল বলে।'

রাজপুত্রের মন উতলা হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিল। বেরিয়ে এল ছেলেটি। পোশাক খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি। রাজপুত্রকে দিল তার পোশাক। রাজপুত্র দিল নিজের নতুন ঝক্‌মকে পোশাক, গলার হার, হাতের বালা। ছেলেটি পরে নিল সেসব। রাজপুত্র পরে নিল ছেলেটির অতি সাধারণ পোশাক। ঢুকে পড়ল খাঁচার মধ্যে। ছেলেটি বাইরে থেকে লোহার খাঁচার দরজাটি খুব ভালোভাবে সাবধানে এঁটে দিল।

সুন্দর নতুন ঝক্‌মকে পোশাকে গলায় হার হাতে বালা পরে ছেলেটি রাজপুত্রের বেশে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। কি সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে।

এখন হয়েছে কি, গাছের ফল খেয়ে নদীর জল খেয়ে মামারা ফিরে এল নদীর তীরে সেই জঙ্গলের কাছে। ওখানেই রয়েছে খাঁচায় বন্দী তাদের ভাগ্নে। এসে দেখে, না খাঁচা ঠিক আছে। ভেতরে বসে রয়েছে তাদের ভাগ্নে। মুখটা নিচু করে বসে রয়েছে। মামারা এসেই ঠাট্টা করে বলল, 'ভাগ্নে, তোর কিছু বলার আছে?'

রাজপুত্র হাসিহাসি মুখে বলল, 'মামা ঠিক আছে, আমি রাজি, আমি ওকেই বিয়ে করব।'

তার কথা মামারা শুনল কি শুনল না, ধাক্কা মেরে উল্‌টে দিল খাঁচা। খাঁচা একবার গড়িয়ে গেল, আবার ধাক্কা, আবার গড়িয়ে গেল। শেষকালে ঝপ্‌ করে গিয়ে পড়ল নিচের নদীতে। ভাগ্নে কি যেন বলতে চাইল, মামারা শুনতে পেল না, শুনতে চায়ও না। জলের ওপরে অনেক বুদ্‌বুদ্‌ দেখা গেল, আবার জলেই সেগুলো মিলিয়ে গেল। নদীর জল যেমন বইছিল তেমন বয়ে চলল।

মামারা ফিরে আসছে জঙ্গলের পথে বাড়ির দিকে। মনে খুব আনন্দ। নিজেরা নিজেদের মধ্যে বলছে, 'কি ভোগান্তিই না ভুগিয়েছে ভাগ্নে। ওঃ, কি পাজি শয়তান। এখন মরে গিয়ে শান্তি হল। আর জ্বালাতে আসবে না।' তারা বাড়ি ফিরল।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই তারা চম্‌কে উঠল। এ কি কাণ্ড! ভাগ্নে তো মরেনি! দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছে। সুন্দর ঝল্‌মলে পোশাক, গলায় হার, হাতে বালা। যেন রাজপুত্র বসে রয়েছে। ও তো মরেনি। আশ্চর্য! আরও সুন্দর হয়েছে।

তারা আস্তে আস্তে ভাগ্নের কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, তোকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে এলাম। খাঁচার দরজা বন্ধ। তা এত তাড়াতাড়ি এলি কেমন করে?'

ছেলেটি তৃপ্তিভরে হাসল। শেষকালে বলল, 'আমি কি আর একা এখানে ফিরে আসতে পারতাম? খাঁচা তো বন্ধ, জল তো অনেক। আমার দাদু-দিদিমারা আমাকে আবার এখানে পাঠিয়ে দিল। পাল্‌কি করে পাঠিয়ে দিল। পাল্‌কি চড়ে তাই এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম। খুব মজা।'

মামারা তাকিয়ে রয়েছে অবাক চোখে। ভাগ্নে বলে চলেছে, 'জলের তলায় ঢুকে যেতেই দাদু-দিদিমারা কাছে চলে এল, খাঁচা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দিল এই নতুন পোশাক, গলার হার আর হাতের বালা। পরে নিলাম। ফিরে এলাম। খুব মজা। ও, বলতে ভুলে গেছি, দাদু-দিদিমারা একটা কথা বলে দিয়েছে। ওঃ, একেবারে ভুলে গেছি। অনেকদিন তোমাদের দেখেনি, তাই একবার তোমাদের ছয়জনকে দেখতে চেয়েছে। এই কথা বলে দিয়েছে। আর তোমাদের জন্য এই সোনার ভোজালি পাঠিয়ে দিয়েছে, সোনার কুকরি। হাতে নিয়ে দেখ।'

মামাদের হাতে সে সোনার ভোজালিটা তুলে দিল। এমন সোনার বড় ভোজালি ভাগ্নে পাবে কোথা থেকে? জলের তলায় দাদু-দিদিমা না দিলে?

সত্যিই, সোনার ভোজালি। মামারা অবাক হল, হিংসেতে ফেটে পড়ল।

একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে, ওখানে যাওয়া যায় কেমন করে? ভাগ্নে, বল তো, কেমন করে দেখা করব বাবা-মাদের সঙ্গে?'

ছেলেটি চোখের কোণে হাসির ঝিলিক টেনে বলল, 'খুব সোজা। মামা, সেখানে যাওয়া খুব সোজা। তোমরা এক একজনে একটা করে লোহার খাঁচা বানাও। নদীর তীরে জঙ্গলের পাশে সেগুলোকে নিয়ে যাও। ঢুকে পড় তার মধ্যে। ব্যাস, হয়ে গেল। পৌঁছে যাবে দাদু-দিদিমাদের দেশে।'

কথামতো কাজে লেগে গেল ছয় মামা। লোহার খাঁচা তৈরি করল। মাথায় করে বয়ে নিয়ে গেল নদীর তীরে জঙ্গলের পাশে। ঢুকে পড়ল যে যার খাঁচার মধ্যে। পেছনে পেছনে চলছিল ভাগ্নে। সে ভালোভাবে সাবধানে ছয়জনের খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিল। পাশাপাশি রয়েছে ছটা খাঁচা। ভেতরে ছয় মামা হাসছে। মনে আনন্দ। এখুনি পৌঁছে যাবে দাদু-দিদিমাদের দেশে। নতুন ঝলমলে পোশাক পাবে, গলায় হার পরবে আর হাতে বালা। তার ওপরে পাবে সোনার ভোজালি। খুব মজা হবে।

বড় মামার খাঁচা গড়িয়ে দিল ভাগ্নে। কয়েকবার গড়িয়ে সেটা গিয়ে পড়ল গভীর জলে। অনেক বুদ্‌বুদ্‌ উঠল জলের ওপরে। আবার মিলিয়ে গেল। ভাগ্নে চিৎকার করে উঠল, 'মামারা, তাকিয়ে দেখ। বড় মামা দাদু-দিদিমাদের কাছে যেতেই তারা তাকে অনেকটা ধেনো মদ খেতে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি পচাই খেয়ে দেখ বড় মামা কেমন ভক্‌ভক্‌ করে বমি করছে। জলে কত বুদবুদ। ইস, কি বমিই না হল।'

তারপরে মেজ মামার খাঁচা ঠেলতে লাগল। খাঁচা গড়াতে লাগল। মেজ মামার মুখে হাসি, মনে আনন্দ। ঝপ্‌ করে খাঁচা গিয়ে পড়ল নদীর গভীর জলে। আবার অনেক বুদ্‌বুদ্‌। এমনি করে ছয় মামার ছটি খাঁচাই হারিয়ে গেল নদীর জলে। জল এখন শান্ত, নদী আগের মতোই বয়ে চলেছে। জঙ্গলে আর কোনো খাঁচা নেই। ভাগ্নে ফিরে চলল বাড়ির পথে।

বাড়ির উঠোনে পা দিতেই ছয় মামী ভাগ্নেকে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মামারা ফিরবে কখন?'

ভাগ্নে আড়চোখে মামীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মামী, খুব তাড়াতাড়ি তো ফিরতে পারবে না। একটু তো দেরি হবেই। সবে মামারা তাদের বাবা-মায়ের কাছে পৌঁচেছে। কত দিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ হল। সহজে

কি তারা ছেলেদের ছাড়বে? একটু দেরি তো হবেই।' মামীরা নিশ্চিন্ত হল।

তিন দিন তিন রাত্তির কেটে গেল। স্বামীরা তবু ফিরল না। চার রাত্তির কেটে গেল,—তবু তো কেউ এল না। আর কত দেরি হবে? এখনও কি বাবা-মায়েরা ছেলেদের ছাড়ছে না? এবার মামীরা উতলা হল। জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, অনেক দিন তো হল। এখনও কেন তোর মামারা ফিরছে না? খুব চিন্তা হচ্ছে।'

ভাগ্নে বলল, 'এই তো ফিরল বলে। মামার তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। কোনো ভাবনা নেই।'

আরও তিন দিন তিন রাত্তির কেটে গেল। তবু স্বামীরা ফিরে এল না একজনও এল না। মামীরা কান্নাভরা চোখে জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, কই বাছা, মামারা তো তোর এখনও ফিরে এল না।'

ভাগ্নে এবার বলল, 'মামী, মামাদের ভাত আলাদা আলাদা করে ভাগ করে নোক্‌সেক এ রেখে দাও।'

মামীরা বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। একথার অর্থ,—ছয় মামাই মারা গিয়েছে। হায়! ছয় স্বামীই মারা গিয়েছে। তারা আর কখনও ফিরে আসবে না। চিরকালের জন্য তারা চলে গিয়েছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মামীরা কাঁদতে লাগল। সে কি কান্না!

মামাদের ভাগ্নে অনাথ ছেলেটি খুব ধনী হয়ে গেল। অনেক টাকাকড়ি তার, রুপোর গয়না, সোনার ভোজালি, কুনকে কুনকে ভর্তি রুপোর চাকতি। কত চাকরবাকর। আর কেউ বেঁচে নেই যে তাকে হিংসে করবে, তাকে কষ্ট দেবে, সর্বনাশ ডেকে আনবে। অনেক বউ-ছেলের হয়ে ভাগ্নে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

আদিবাসী লোককথা : পরিশিষ্ট

আদিবাসী লোককথা ঃ আফ্রিকা মহাদেশ (পৃষ্ঠা ১ থেকে ৮৩)

গল্প এল কোথা থেকে। পৃষ্ঠা ১। নাইজেরিয়ার ইকোই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পশুকথা। এই দেশের দক্ষিণে ক্যামেরুন পর্বত, তারই পাদদেশ ঘিরে বাস করেন এই আদিবাসী গোষ্ঠী। অল্প দূরেই ক্যামেরুনের বামেন্দা আদিবাসীদের বাস। তাদের মধ্যেও এই পশুকথাটি শোনা যাবে। কিন্তু ইকোইদের মধ্যেই এটি বেশি জনপ্রিয়। এই পশুকথাটির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে মানুষের ভাষা এল কি করে তার অনেক গল্প রয়েছে। কিন্তু মানুষ গল্প পেল কেমন করে সে সম্পর্কে বেশি লোককথা নেই। অস্ট্রেলিয়ার আরাণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে একটি পশুকথা রয়েছে,—উলা নামে একটা গিরগিটি পুরনো একটা গাছের কোটর থেকে গল্প এনে মানুষকে দিয়েছিল। গিরগিটি মানুষকে বন্ধু বলে জানে, কেননা সেই আদ্যিকালে প্রথম মানুষ ছিল গিরগিটির মতো দেখতে। এই গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় একটি গল্প রয়েছে। মাকড়সা কেমন করে আকাশ দেবতার গল্প পেল। এই মাকড়সা হল লোককথার ট্যাটন, ধূর্ত, প্রবঞ্চক। মাকড়সার গল্পটিতে একটি সুন্দর ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু ইকোই গল্পে ইঁদুরের গল্প-ছেলেমেয়ের সঙ্গে চিতা ও ভেড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ইঁদুরের পুরনো দরজায় ধাক্কা খাওয়া ছাড়া ভেড়া-চিতার কোনো ভূমিকা নেই। এমন হতে পারে, দুটো আলাদা পশুকথা মিলে গিয়েছে। কথক শুধু একটি যোগসূত্র বজায় রেখেছেন। লোককথায় এমন দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। ভেড়া ও চিতার গল্পাংশের মধ্যে সমাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি করুণ বর্ণনা রয়েছে। খরা ও দুর্ভিক্ষে মানুষের কি শোচনীয় অবস্থাই না ঘটে। ক্যামেরুনের সীমানায় এই এলাকা খুব অনুর্বর। খাদ্যাভাব নিত্যদিনের সঙ্গী। তার আভাস রয়েছে।

কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন। পৃষ্ঠা ৬। জামবিয়ার খোংগা আদিবাসী পশুকথা। দেশের দক্ষিণে জামবেসি নদীর তীরে এদের বাস। কংগোর বেনা লুলুয়া আদিবাসীদের মধ্যেও একটু অন্যভাবে পশুকথাটি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে রয়েছে বাজপাখির কথা, আর আকাশে উড়েছিল কচ্ছপের স্ত্রী, তামাক পাতার বদলে পোঁটলায় ছিল লাল টুকটুকে বুনো ফল। 'কেন হল ও কেমন করে হল'—লোককথায় লোকসমাজ নিজেদের মতো করে অনেক

সরস গল্প সৃষ্টি করেছেন। মানুষ-প্রকৃতি-পশুজগতের বিচিত্র ধরন-ধারণ, দেহের আকৃতি-প্রকৃতি বিষয়ে অনন্য সব গল্প রয়েছে। এই পশুকথাটি হাল্কা ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও অনাহার-জনিত কষ্টের কথা এসে পড়েছে। লোকসমাজ এভাবেই তার সামাজিক মনকে উজাড় করে মেলে ধরেন তাদের মৌখিক সাহিত্যে।

মাকড়সা সব ধার শোধ করল। পৃষ্ঠা ৯। সুদানের নুয়েরে আদিবাসী পশুকথা। দেশের পূর্বদিকে ইথিওপিয়ার সীমানার কাছে এদের বাস। সুদানে দিন্কা আদিবাসীদের বহু লোককথা নুয়েরদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় একই ধরনের একটি গল্প রয়েছে। সেখানে নায়ক মাকড়সা নয়, গঙ্গাফড়িং। আর শেষ লড়াই হয়েছে বুনো কুকুর ও হায়নার মধ্যে। লোককথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য,—যার শক্তি কম, যে অতি ক্ষুদ্র, পরিশেষে সেই বিজয়ী হয়। বুদ্ধির জোরে। টুনটুনি, খেঁকশেয়াল, পিঁপড়ে, খরগোশ, মাকড়সা প্রভৃতি তুচ্ছ শক্তিহীন পশুপাখিই জয়ী হয়ে থাকে। এরা অনেকেই লোককথার ট্যাটন। আর আফ্রিকার লোককথায় মাকড়সা সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রিক্স্টার বা প্রবঞ্চক ধূর্ত ট্যাটন। আফ্রিকার লোককথায় সবচেয়ে বেশি গল্প রয়েছে মাকড়সাকে নিয়ে। ক্ষুদ্র প্রাণীকে বিজয়ী করবার পেছনে মানুষের পরাভূত মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। যে শক্তির বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হচ্ছি, তাকে মনে মনে এবং গল্পে পরাজিত করেও এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। এই পশুকথাটিতে মাকড়সা এক অপূর্ব কৌশল প্রয়োগ করেছে, নিজে নিরাপদ দূরত্বে থেকে একজনকে দিয়ে অন্যজনকে পঙ্গু করেছে। যারা ধার দেয় ধার চাইতে তাদের সংকোচ এবং যে ধার নেয় ধার দিতে সে ভুলে যায়,—চিরকালীন সত্যটি এই গল্পে রয়েছে। এই গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠার গল্পটি আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেমন করে পৃথিবীর মানুষ আগুন পেল। পৃষ্ঠা ১৩। উগাণ্ডার বাগাণ্ডা আদিবাসী রূপকথা। আগুন সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু। মানব সমাজের সভ্যতার শুরু আগুনকে ঘিরেই। প্রায় প্রতিটি লোকসমাজেই আগুন নিয়ে গল্প রয়েছে। মানুষ এই আগুন পেয়েছে পশুপাখি কিংবা আকাশ থেকে। সব গল্পের শুরুতেই আছে,—সেই আদিকালে মানুষের আগুন ছিল না। আগুন এল এবং তাকে রেখে দেওয়া হল শুকনো গাছ কিংবা

পাথরের মধ্যে। অনেক গল্পে আছে, যে মানুষকে আগুন দিল তাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। উত্তর আমেরিকার রাঙাবুক রঙিন পাখি কিংবা গ্রীসের প্রমিথিউসের গল্প খুবই পরিচিত। মোটু আর আদরিণীর গল্পে আগুনের বিষয় ছাড়াও সামাজিক সম্পর্কের কথা রয়েছে। অকারণ কৌতূহল মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। যেমন এনেছে মোটুর জীবনে। এক করুণ বিচ্ছেদের কথায় গল্প শেষ হয়েছে।

পোষা পশুপাখির বিশ্বাসঘাতকতা। পৃষ্ঠা ১৭। অ্যাংগোলার আমবুনডু আদিবাসী পশুকথা। গল্পটি একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। আগুন-বিষয়ক সব গল্পেই রয়েছে পৃথিবীতে আগে আগুন ছিল না। কিন্তু এই পশুকথায় রয়েছে, আগুন আনতে পশুপাখিকে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে। লোভ মানুষকে কিভাবে কর্তব্য ভুলিয়ে দেয় তার অসাধারণ চিত্র রয়েছে এই পশুকথায়। কুকুর, মোরগ ছুটেছে আগুন আনতে, বন্ধুদের বাঁচাতে। কিন্তু খাদ্য পেয়ে তারা কর্তব্য ভুলেছে। অন্যের অধীনতা স্বীকার করাকে লোকসমাজ ঘৃণা করেন, ক্রীতদাসত্বকে স্বীকার করা তাদের কাছে মৃত্যুর সামিল। অথচ নিষ্ঠুর সমাজে এই অভিজ্ঞতা তাদের হচ্ছে। অথচ মন সায় দেয় না। আফ্রিকার যে সব মানুষ আমেরিকা ও অন্যান্য অতলান্তিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে এই পশুকথাটি আজও শোনা যাবে। বাহামা ও জ্যামাইকা দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান অধিবাসী একদা আফ্রিকা থেকে আগত আদিবাসী বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে এই পশুকথাটি খুব জনপ্রিয়। শুধু ভাষা পাল্‌টে গিয়েছে। এক ধরনের বিচিত্র ইংরেজিতে এখন এ গল্প শোনা যাবে।

আজও শুয়োর মাটি খোঁড়ে। পৃষ্ঠা ১৯। নাইজিরিয়ার হাউসা আদিবাসী পশুকথা। এ দেশের পশুকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক হল কচ্ছপ। শুয়োর কেন নাক দিয়ে মাটি খোঁড়ে এই 'কেন'-র উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে মর্মান্তিক একটি সামাজিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুর বিপদে শুয়োর সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, বন্ধু তার চরম মূল্য শুয়োরকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ তো প্রতিটি সমাজের প্রতিদিনের ঘটনা। উদার-মনা শুয়োর শত প্ররোচনাতেও বন্ধু কচ্ছপকে অবিশ্বাস করতে চায় নি। অন্যদিকে সংসার চালাতে হয় বলেই স্ত্রীরা অনেক বেশি বাস্তববাদী ও সন্দেহপরায়ণ।

তাই শুয়োরগিন্নী বলেছে, তুমি ও টাকা আর ফেরৎ পাবে না। এই পশুকথায় সামাজিক অভিজ্ঞতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। এখানেও, টাকা যে ধার দিয়েছে তারই সংকোচ আর যে ধার নিয়েছে তার ভুলে যাওয়ার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অজুহাতগুলো আমাদের সকলের কাছেই খুব পরিচিত।

বাদুড়ের স্বভাব। পৃষ্ঠা ২৮। দাহোমের আবোমে আদিবাসী পশুকথা। পশ্চিমে পাশের দেশ টোগোর ইয়োয়ে আদিবাসীদের মধ্যেও একইভাবে পশুকথাটি প্রচলিত রয়েছে। প্রকৃতিজগতে বাদুড় এক অদ্ভুত প্রাণী। তার এই বিশেষত্ব লোকসমাজের চোখ এড়িয়ে যায় নি। পশুকথাটির মধ্যে বাদুড়ের পাখি ও পশু এই দুই সত্তার কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কিংবা সুযোগ বুঝে দল বদল করে অথবা নিরপেক্ষ থাকে তাদের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে এই গল্পে। অধীনতা স্বীকার করে যে শান্তিতে বাস করা যায় না, সে অভিজ্ঞতার কথাও আছে। বাদুড়কে নিয়ে বিভিন্ন লোকসমাজে খুব মজার মজার গল্প আছে। ভারতের বস্তার জেলার মুরিয়াদের মধ্যে এরকম কয়েকটি সুন্দর গল্প রয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ানরাও অনেক গল্পে বাদুড়ের বিচিত্র স্বভাবের কথা বলেছেন।

ছিঃ কি লজ্জা। পৃষ্ঠা ৩০। গাবোনের ফ্যাঙ্ আদিবাসী লোককথা। পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ওশেনিয়ার কোনো কোনো দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যেও লোককথাটি শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে কচ্ছপের বদলে ছোট্ট বাঁদর আর তালগাছের বদলে নারকেল গাছের উল্লেখ রয়েছে। তালের শাঁস থেকে যে তেল তৈরি হয় তা চুরি যাওয়াতে এক মহাবিপদ উপস্থিত হল। কচ্ছপের দেহের আকৃতি ও গলা ঢুকিয়ে-নেবার বিচিত্র ভঙ্গিটি অনেক গল্পের বিষয় হয়েছে। কচ্ছপ কেন গলা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়,—এই স্বভাবটির কারণ খুঁজেছেন লোকসমাজ। চুরি করা লোকসমাজে এক কুৎসিত অপরাধ, লজ্জাজনক ঘটনা। তারই অভিব্যক্তি রয়েছে এই গল্পে। তালশাঁস চুরির কৌশলটির কথা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা যে মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, স্বভাব নষ্ট করে দেয় সেকথাও অস্পষ্ট থাকেনি।

মানুষ-খেকো রাজা। পৃষ্ঠা ৩৮। ক্যামেরুনের বাফুম ও বাংগোলা

আদিবাসী রূপকথা। রূপকের মাধ্যমে সামাজিক একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। সামন্তপ্রভুদের সাধারণ মানুষ ভক্তি করতেন, কিন্তু সেই ভক্তির পেছনে ছিল অত্যাচারিত হবার ভয়। এরা যদি অত্যাচার না করবেন তবে মানুষের মনে ভয় আসত না। সামন্তপ্রভুর নিষ্ঠুরতা বহুদূর বিস্তৃত, প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজা লোভী, নিষ্ঠুর, আত্মঅসন্তুষ্ট, স্বার্থপর। তার লোভ সীমা ছাড়িয়েছে, এই লোভ স্নেহ-মমতাকেও অস্বীকার করে। সবাই রাজার শিকার হয়েছে। বাস্তব অবস্থায় সাধারণ মানুষ হয়তো এই সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছেন না, কিন্তু গল্পের মধ্যে প্রতিশোধ নিয়ে শান্তি পেয়েছেন। রূপকথাটির শেষ অংশটি আধুনিক ছোটগল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এক অসাধারণ সমৃদ্ধ রূপকথা।

তিন পড়শী। পৃষ্ঠা ৪১। ঘানার ক্রাচি আদিবাসী পশুকথা। দেশের উত্তরে অনুর্বর এলাকায় এদের বাস। অনেক উঞ্ছবৃত্তি করে এদের জীবন কাটাতে হয়। সীমাহীন দারিদ্র্য এদের নিত্যসঙ্গী। ঘানার অন্যান্য জন গোষ্ঠীও এদের খুব অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। এত হীনমন্যতা সহ্য করেও উন্নত লোকসংস্কৃতিকে এরা রক্ষা করে চলেছেন। সমাজে এক ধরনের ফড়ে-জাতীয় মানুষ থাকেন, যারা দৈহিক পরিশ্রম না করেও ফসলের ভালো অংশটা দখল করেন। আর সাদাসিদে কিছু মানুষ শুধুই প্রবঞ্চিত হন। তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাদের শ্রম। কিন্তু শ্রম করেও পেটের আহার জোটে না। অন্যপক্ষে ধূর্ত প্রবঞ্চক এক গোষ্ঠী এদেরই হাড়ভাঙা খাটুনিতে উৎপাদিত ফসল ভোগ করছেন। গল্পের শেষে এই বেদনার কথা ফুটে উঠেছে।

একশ' গোরুর বদলে একটি বৌ। পৃষ্ঠা ৪৩। তানজানিয়ার সোয়াহিলি আদিবাসী রূপকথা। রূপকথা কিভাবে সামাজিক দর্পণের কাজ করে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গল্পটি। মানুষ যদি তার নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা না করেন, তার সাধ্যাতীত কোনো কিছু কামনা করেন তবে তাকে ভুগতেই হবে। ছেলেটি রূপসী মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হল। সে দিনমজুরে পরিণত হল। অথচ তার যা ছিল, বুঝেসুঝে চললে তার অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মানুষ এভাবেই সর্বনাশের পথে এগোয়। ভুল করার পরে ছেলে সেকথা বুঝেছে

কিন্তু আর ফিরবার পথ নেই। সমাজে দারিদ্র্য এক অভিশাপ, এর সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ নারীকে ঘর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করে, সফলও হয়। যে লোকটি মাংস দিল সে বৌকে দ্বিচারিণী হতে প্রলুব্ধ করেছে। মেয়েটি অসহায়। বাবা এসেছে, বাবাকে খেতে না দিতে পারার বেদনায় মেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে কাঁদছে। এই দুর্বল মুহূর্তেই এসেছে শয়তান। এই রূপকথায় যা বলা হয়েছে তা প্রতি সমাজের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা। লোক-কথার মধ্যে এভাবেই লোকসমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের কথা লুকিয়ে থাকে। রূপকের খোলস খুলে এভাবে সত্যকে আবিষ্কার করলে অনেক রূঢ় বাস্তবতার সন্ধান মিলবে।

আকাশের সূর্য আকাশের চন্দ্র। পৃষ্ঠা ৫৫। সিয়েরা লিওনের মেন্‌ডে আদিবাসী লোকপুরাণ। পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, আদ্যিকালে সূর্য, চন্দ্র, তারা ও আকাশ পৃথিবীতেই বাস করত, মানুষের খুব কাছাকাছি ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা দূরে চলে যায়। দেবতারাও এক সময় মানুষের মধ্যেই ছিল। আফ্রিকা, ভারত, আমেরিকা ও পলিনেশিয় দেশগুলোতে চন্দ্র-সূর্যের দূরে চলে যাওয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর লোকপুরাণ আছে। আফ্রিকার জুলু, বাভেন্দা, দিন্‌কা, ইফে, বাবোয়া আদিবাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে অনবদ্য সব লোকপুরাণ আছে। ভারতের নাগা, বিরহড়, ওরাওঁ, গোন্দ আদিবাসীদেরও এ বিষয়ে সুন্দর গল্প আছে। এইসব গল্পের মধ্যে রয়েছে, মানুষের স্বভাবের কদর্যতায় ও হিংসুটে মনের জন্য চন্দ্র-সূর্য দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই গল্পে রয়েছে, গভীর বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়েই তারা ওপরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এককালে তারা এই পৃথিবীরই একজন ছিল, তাই সেই গভীর টানে প্রতিদিন পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

যাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে। পৃষ্ঠা ৫৯। কঙ্গোর মুপোংগোয়ে আদিবাসী রূপকথা। রূপকথাটি পড়লেই ইউরোপের 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ক্স্' রূপকথাটির কথা মনে পড়বে। শুধু পার্থক্য রয়েছে,—কংগোর রূপকথায় আছে একদল ডাকাতের কথা, স্নো হোয়াইট-এ আছে সাত বামনের কথা, স্নো হোয়াইট-এর দেহ বরফের মতো সাদা আর গালদুটি রক্তগোলাপের মতো রাঙা, আফ্রিকার গল্পে মেয়ের দেহের এ রঙ হতে পারে না, বামনরা এসেই সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে স্নো হোয়াইটকে দেখেছে, আর

সুন্দরী মেয়ে রান্নাবান্না করে কয়েকদিন লুকে চুরি খেলেছে। স্নো হোয়াইট বিষাক্ত আপেল খেয়ে মরেছে, প্রথম বারে বিষাক্ত চিরুনি মাথায় ঘষেছিল, কিন্তু বামনরা বাঁচিয়েছিল, তার সুন্দরী মেয়ের মাথায় ঢুকেছিল ছুঁচ কাঁটা, স্নো হোয়াইটকে বাঁচিয়েছিল রাজপুত্র, তার সঙ্গে তার বিয়ে হল, দুষ্ট সৎ মা হিংসের জ্বালায় পড়ে মারা গেল। সুন্দরী মেয়ের সৎ মা কাদায় হারিয়ে গেল।

এই আশ্চর্য মিল দেখে প্রথমেই মনে হয় এক সমাজের গল্প অন্য সমাজে প্রচারিত হয়েছে। গল্পটার একটু ইতিহাস আছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে কংগো থেকে একজন মিশনারি রেভারেণ্ড রবার্ট হ্যামিল নাসাউ গল্পটি সংগ্রহ করেন। তার আড়াইশ' বছর আগে একজন পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্য কংগোয় এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। সে কংগোয়ে আদিবাসী ভাষা তিনি শিখেছিলেন। তেমন ভালো করে নয়। দেশে ফিরে গিয়ে এই গল্পের কাঠামোটি তিনি লিখে যান। সেই সৈনিক বোধহয় স্নো হোয়াইটের গল্প জানতেন না, কেননা একবারও তার সেকথা মনে হয়নি, অন্তত তার লেখায় নেই। পোর্তুগিজ উপনিবেশবাদীরা এই সময় যখন কংগোতে আসে, তখন কংগোর অবস্থা আমরা জানি। বাইরের কোনো যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। এমন কি ১৯০০ সালে যখন রেভারেণ্ড নাসাউ এই গল্পটি সংগ্রহ করেন তখনও এই গোষ্ঠীর মধ্যে বাইরের প্রভাব সামান্য। খ্রীস্টধর্মের কিছু প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। যারা এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের কেউ কেউ সুন্দরী মেয়ের নাম বলেছেন মারিয়া। নিঃসন্দেহে পোর্তুগিজ নাম। কিন্তু গল্পে আর কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অন্যভাবে, আফ্রিকার গল্প ইউরোপে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে, এরকম কোনো যোগাযোগের সম্ভাবনা ছিল না। আফ্রিকার ঐতিহ্যপ্রিয় রক্ষণশীল সমাজ যেমন বাইরের গল্পকে অন্তত সেইকালে সহজে আপনার করে নিতে চাইবে না, তেমনি আফ্রিকার গল্পও ইউরোপের ঘরে ঘরে পৌছে যাওয়া ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে এমন ঘটল কিভাবে?

এটা ভাবা যেতে পারে যে, একটি সমাজের সঙ্গে যখন অন্য একটি সমাজের যোগাযোগ ঘটে, তখন সৈনিক, পর্যটক, বণিক, জ্ঞানান্বেষী প্রভৃতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে গল্প নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু নিরক্ষর সাধারণ লোকসমাজ সহজে অন্যের লোককথাকে সমাজে ঠাঁই দেন না। আসলে এইসব লোককথা নিরপেক্ষভাবেই লোকসমাজে সৃষ্টি হয়। কোনো প্রভাব বা মাইগ্রেশনের

প্রয়োজন পড়ে না। সামাজিক বিকাশের স্তরে অসম বিকাশ সত্ত্বেও মানুষ সর্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। লোককথায় মূর্ত হয় ভয়াবহ অত্যাচারের কথা, নির্মম অবিচারের কথা, হৃদয়-নিংড়ানো কান্নার আর্তনাদ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, অপূর্ণ কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পিত প্রতিরোধের কাহিনী। এইসব মানসিকতা সবকালের, সব অঞ্চলের, সমগ্র মানব সমাজের। তাই এমন সব দুর্গম অঞ্চলের লোককথা পাওয়া গিয়েছে যেখানে আগে কেউ যান নি, অথচ তার সঙ্গে মিল রয়েছে দূরদেশের কোনো লোককথার। এই গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠার 'নিষিদ্ধ ফল' এ জাতীয় আর একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। (এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে একটি গ্রন্থে --লোকসমাজ ও পশুকথা, লোকলৌকিক প্রকাশনা, ১৯৮০)।

নিয়ামবি ও কামোনু। পৃষ্ঠা ৭২। বারোট্সে বা লোজি আদিবাসী লোকপুরাণ। মালয়ি ও জমবিযার মাঝখানে জামবেসি নদীর ওপরের দিকে এরা বাস করেন। এই লোকপুরাণটি কালাহারি মরুভূমি ও পূবে লিম্পোপো নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শোনা যাবে। লোকপুরাণের সৃষ্টিবিষয়ক গল্পে রয়েছে, আদিকালে কিছুই ছিল না, আদি দেবতা সবকিছু সৃষ্টি করলেন। প্রত্যেক লোকসমাজেরই আদি সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। নিয়ামবি হলেন তাই। পুরনো কালের নিয়ম অনুযায়ী নিয়ামবিও থাকেন মানুষের মাঝে। তিনি সবকিছুই মানুষকে শেখালেন। কিন্তু মানুষ কামোনু অকারণে নিয়ামবিকে নাস্তানাবুদ করে তুলল। সামাজিক মানুষ কেউ কেউ যে অকারণেই স্বভাববশে কিছু কিছু দুষ্কর্ম করে চলে, তার একটি সুন্দর চিত্র রয়েছে এখানে। আবার মানুষ যে কত তাড়াতাড়ি সব বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে ওঠে তার কথাও রয়েছে। মানুষের অপরাজেয় শক্তির কথা লোকসমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নিজের সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তাকে নাজেহাল করতে পারে। অবশ্য শেষকালে কামোনুর শুভবুদ্ধি জেগেছে, কিন্তু দেবতা তখন নাগালের বাইরে।

মাকড়সা কেমন করে আকাশ দেবতার গল্প পেল। পৃষ্ঠা ৭৮। ঘানার আশান্তি আদিবাসী পশুকথা। আনানসে বা আনান্সি পশ্চিম আফ্রিকার পশুকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধূর্ত নায়ক। এই আনান্সে মাকড়সাকে নিয়ে অনবদ্য সব লোককথা গড়ে উঠেছে। এই ক্ষুদ্র অথচ অসাধারণ বুদ্ধিমান চতুর প্রাণীটিকে ঘিরে গুরুবা, ঘানা, আইভরি কোস্ট, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, টোগো,

দাহোমে, নাইজিরিয়া (হাউসা), ক্যামেরন, কংগো ও অ্যাংগোলার লোক-সমাজ অসংখ্য মজাদার গল্প সৃষ্টি করেছেন। আফ্রিকার মানুষ যখন আমেরিকার নতুন দুনিয়ায় গেলেন, তখন তাদের মাধ্যমে এই আনানসে সেখানেও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। নাইজিরিয়ার হাউসা আদিবাসী মাকড়সাকে নাম দিলেন গিজো, আশান্তি ও আকান আদিবাসী বলেন কোয়াকু আনানসে। দক্ষিণ ক্যারোলিনা সাগর দ্বীপপুঞ্জে এর নাম হল কুমারী ন্যান্সি, গুলাহ্-এ এর নাম খুড়ি ন্যান্সি, হাইতি দ্বীপে এ হল তি মালিস বা অনিষ্টকারী। সুরিনাম নিগ্রো সম্প্রদায় একে আনানসি নামেই ডাকেন। জ্যামাইকায় মৃতদেহ পাহারা দেওয়ার সময় কিংবা মৃত্যের উদ্দেশে জমায়েতের সময় আনানসির গল্প বলার রীতি রয়েছে। ত্রিনিদাদের ছোট ছেলেমেয়েরা এখনও অসংখ্য আনানসে গল্প বলে যেতে পারে। ঘানার লোকপুরাণে আছে, আনানসেই এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বাণ্টু লোককথায় আনানসে ও সূর্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এদের ধারনায়, সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান একত্রিত করলেও তা আনানসের বুদ্ধির সমান হবে না। আফ্রিকার মানুষের কাছ থেকেই অন্যান্য জায়গায় মাকড়সার এইসব গল্প ছড়িয়েছে। কেননা, সেই সব দেশে আফ্রিকার মানুষ বাগিচা ও খনি শ্রমিক হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেই আনানসের গল্প পাওয়া যাচ্ছে যার মূল অংশ পাওয়া যাবে আফ্রিকায়। এইক্ষেত্রে এই গল্পগুলোর মাইগ্রেশান হয়েছে। পৃথিবীর লোককথার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পশু-ট্যাটন হল মাকড়সা, খরগোশ, খেঁকশেয়াল, কচ্ছপ। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৮ দ্রষ্টব্য। মানুষের মধ্যে গল্পগুলো যে সহজে পাওয়া যায় নি তার ইঙ্গিত রয়েছে মাকড়সার কষ্টকর অভিযানের মধ্যে। আশান্তি আদিবাসী অধিকাংশ গল্পের শেষে বলেন, আমার গল্প শেষ হল।... তবে তাই হোক।

নিষিদ্ধ ফল। পৃ ৮৩। ওরুবার ইকে আদিবাসী লোকপুরাণ। লোকপুরাণটি পড়লেই হিব্রু লোকপুরাণ, বাইবেলের 'বুক অব জেনেসিস'-এর জ্ঞানবৃক্ষের ফল গল্পটির কথা মনে পড়ে। আদম আর ইভ সাপের প্ররোচনায় এই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে অভিশপ্ত হয়েছিল। ইকে গল্পে গর্ভবতী নারী নিজেই লোভের বশে স্বামীকে তাহু গাছের ফল দিতে বলেছে। পরিণামে মৃত্যু এল মানুষের মাঝে। ইভও জানত, ফল খেলে মৃত্যু নেমে আসবে। কিন্তু সাপ বলেছিল, মৃত্যু নয়, তোমরা জানবে জ্ঞান কাকে বলে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল হল বাইবেলের ঐতিহ্য অনুসারে আপেল। পাপের কথা রয়েছে হিব্রু লোকপুরাণে। ইকে গল্পে মৃত্যুতেই গল্পের শেষ। পাপের ধারনা তারা এভাবে ব্যক্ত করেছেন। নিষিদ্ধ

ফল খাওয়া ও তার পরিণতিতে মৃত্যু—এই ধারণার গল্প অসংখ্য রয়েছে। আফ্রিকার বান্টু আদিবাসীর মধ্যে নিষিদ্ধ ফল বিষয়ে সাতটি বিভিন্ন লোকপুরাণ রয়েছে। ক্যামেরুনের জ্যাঙ্গ ও বেগাদের মধ্যেও কয়েকটি গল্প রয়েছে। ইউরোপীয়, সেমিটিক, সাইবেরিয়, লাতিন আমেরিকা ও ইন্দোনেশীয় লোকপুরাণে নিষিদ্ধ ফলের লোককথা অসংখ্য। বহু সমাজেই এক একটি বিশেষ ফল এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে ট্যাবু হিসেবে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে।

আদিবাসী লোককথা ঃ ভারত (পৃষ্ঠা ৮৪ থেকে ১৬৭)

শেয়াল কেন চাষ করে না। পৃ ৮৪। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা আদিবাসী পশুকথা। ওরাঁও আদিবাসীদের মধ্যেও এই পশুকথাটি শোনা যাবে। কয়লাখনি কিংবা শিল্পকারখানায় কাজ করার সুবাদে পাশাপাশি রাখার ফলে এই লোককথাটি দুটি সমাজেই পাওয়া যায়। কিংবা নিরপেক্ষভাবেও এর উৎসার ঘটতে পারে। বিহারের গিরিডি জেলার বেনিয়াডিতে একজন শবর শ্রমিকের মুখেও এই গল্পটি একটু অন্যভাবে শুনেছিলাম। সেখানে মাহাতোর পরিবর্তে জমিদার ছিল এক নেকড়ে। আর নেকড়ের চার প্রহরী ছিল চারটি হায়না। ভূমিহীন কৃষকের কৃষিজমির জন্য যে আকাজ্ক্ষা সেই মনোভাবটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একখণ্ড জমি, সুন্দর ফসল, ভরা সংসার ও শান্তি,—এর চেয়ে বড় কামনা গ্রামীণ মানুষের আর কি হতে পারে? কিন্তু এই সাধারণ আশাও পূরণ হবার নয়। শেয়াল ও শেয়াল-বৌয়ের কথাবার্তার মধ্যে গ্রামীণ একটি পরিবারের অপরূপ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পিহ্‌মুয়াকি আর তার গান। পৃ ৮৮। লুসাই পাহাড়ী এলাকার লুসাই আদিবাসী রূপকথা। নিষ্ঠুর পাহাড়ী প্রকৃতির মধ্যে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এক আশ্চর্য কবিমনের পরিচয় মিলবে তাদের লোককথায়। এরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। এক সময় এদের কোনো কোনো গোষ্ঠী নৃ মুণ্ড শিকারী ছিলেন। অনেক লোককথায় সে ঐতিহ্যের রেশ রয়ে গিয়েছে। খ্রীস্টিয় মিশনারী ও ইংরেজ প্রশাসকেরা লুসাইদের পুরনো গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানলেও, লোকসংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে তারা এখনও বাঁচিয়ে চলেছেন। তাদের লোকসংগীত, বর্ণময় লোকনৃত্য এবং সমৃদ্ধ লোককথা

আজও বিস্ময় জাগায়। আজকে পুরনো দিনের অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার বেদনার কথা এই রূপকথাটির প্রথমেই রয়েছে। নিজের মর্যাদা হারাবার ভয় ও হিংসা মানুষকে কিভাবে নিষ্ঠুর পশু করে তোলে তার বাস্তব চিত্র রয়েছে এই রূপকথায়। গান লুসাইদের জীবনের কতখানি জুড়ে রয়েছে, রূপকথার শেষ অংশটা তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আগুন। পৃ ৯২। মধ্যভারতের ধোবা আদিবাসী লোকপুরাণ। মাণ্ডলা জেলায় বৈগা আদিবাসীদের পাশাপাশি এরা বাস করেন। যারা জামা-কাপড় কাচেন সেই ধোবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠার গল্পের আলোচনায় আগুনের লোকপুরাণ নিয়ে আলোচনা করেছি। ধোবাদের এই লোকপুরাণটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কেননা, মানুষের সমাজের বিবর্তনে যেভাবে স্তরগুলো পার হওয়ার কথা নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। আগে আগুন ছিল না, হঠাৎ প্রচণ্ড খরায় দাবানল জ্বলল, দাবনল-দগ্ধ পশুর মাংসে বেশি স্বাদ পেল, কাঁচা মাংস আর খেতে চাইত না, কিন্তু তখনও আগুনের ব্যবহার জানলেও তা জ্বালাতে জানে না, দাবানলের আগুন এনে পশু ঝলসাতে শিখল, প্রথমে ভুল হল, পরে সব জানল, আগুনকে জ্বালিয়ে রাখবার বুদ্ধি প্রয়োগ করল, শিল্পজ্ঞানের মাধ্যমে শক্ত পোড়া পাত্র পর্যন্ত তৈরি করল। একই গল্পে আগুন দিয়ে রান্না শেখা ও পাত্র তৈরি করার কথা রয়েছে। গল্পটি পড়লে মনে হবে, কোনো নৃবিজ্ঞানী বোধহয় গল্পের মাধ্যমে সভ্যতার বিবর্তনের কথা বলছেন। আগুন সম্পর্কে অন্তত আড়াই শ' লোকপুরাণ অনুবাদ করেছি, গল্প হিসেবে অনন্য নজির অনেক লোকপুরাণে পেয়েছি, কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক এমন লোকপুরাণ আর পাই নি।

বনের কুকুর গাঁয়ে এল। পৃ ৯৬। খাসি-জয়ন্তিয়া আদিবাসী পশুকথা। খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এরা বাস করেন। অনেকে মনে করেন, বহু কাল আগে এরা মোঙ্গলিয়া থেকে এসে এখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এক সময় এরা সমতল ভূমিতেই বাস করতেন, কিন্তু আক্রমণের ফলে এরা পাহাড়ী এলাকায় চলে যান। এদের শিল্প পোশাক মৌখিক-সাহিত্য অত্যন্ত উন্নতমানের। এই আদিবাসী গোষ্ঠী সরল, সৎ, পরিশ্রমী ও স্পষ্টবাদী। এই পশুকথাটির মধ্যে কুকুরের গৃহপালিত হবার পেছনে যে করুণ কাহিনী রয়েছে

তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। হিংস্র বন্য পশুর গায়ের গন্ধ কেন তাও গল্পে বলা হয়েছে। গরিব কুকুরের অপমানিত হবার পর যে প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে উঠেছে তা যেন বঞ্চিত মানুষের মনের কথা। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যে আর্থিক দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতা রয়েছে, কুকুরের বেদনার মধ্যে তা ফুটে উঠেছে। 'বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। সারাদিন হয়তো খাওয়া হয়নি।'—এই অভিজ্ঞতা তো এদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

ধনেশ পাখির পালক। পৃঃ ১০০। বিস্তৃত নাগা পাহাড়ের জেমি-নাগা আদিবাসী রূপকথা। বর্তমানে নাগাল্যাণ্ড রাজ্য গঠিত হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্মা সীমানা পর্যন্ত এদের বাস। এরা আও, সেমা, কোনিয়াক্, আনগামি, লোথা, রেঙ্গমা, জেলিয়েঙ, ফোম্ প্রভৃতি পনেরোটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এদের ঐতিহ্য বর্ণময়, এদের সংস্কৃতি উন্নত। এরা অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন আদিবাসী। পাহাড়ের অপরূপ প্রকৃতির স্পর্শ মিলবে এদের লোককথায়। অনেক লোককথা যেন গদ্যকাব্য। এই রূপকথাটির মধ্যে মাতৃহারা একটি বালকের করুণ কাহিনী রয়েছে। সৎ মায়ের অত্যাচার ও সামাজিক হীনমন্যতা সহ্য করতে না পেরে সে আকাশে দূর বনে পাখি হয়ে উড়ে গিয়েছে। ধনেশ পাখির রঙিন পালক খসে পড়ার মুহূর্তে গল্পটিও যেন কাব্য হয়ে উঠল।

বিচিত্র-রঙা ময়ূর-ময়ূরী। পৃঃ ১০৪। গারো পাহাড়ের গারো আদিবাসী রূপকথা। গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তৃত এলাকা ছাড়াও এরা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকায় ও বর্তমান বাংলাদেশে বাস করেন। গারো আদিবাসী নিজেদের 'আচিক' বলে পরিচয় দেন এবং বিদেশিদের সামনে গারো শব্দ ব্যবহার করেন না। এই আদিবাসী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে রক্তাক্ত আক্রমণের শিকার হয়ে এসেছেন। এদের লোকসংস্কৃতিও খুব উন্নত। আসলে, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর লোককথার মধ্যে এক অনন্য কবিমনের সন্ধান পাওয়া যায়। ময়ূর বিচিত্র-রঙা সুন্দর পাখি, ময়ূরী কিছুটা কম রূপসী,—প্রাকৃতিক এই সত্যটিকে নিয়ে কি অন্যবদ্য রূপকথা সৃষ্টি করলেন এরা। পশু ও পাখিদের মধ্যে পুরুষ সবসময়েই সুন্দর। এই পুরুষ পাখি ও পশুর সৌন্দর্য কেন বেশি তা নিয়ে পৃথিবীর নানান দেশে অসংখ্য সুন্দর গল্প রয়েছে। গারো এই গল্পটির অনুরূপ গল্প রয়েছে তিব্বতের রূপকথায়, মঙ্গোলিয়ার পশুকথায় ও থাইল্যাণ্ডের একটি লোকপুরাণে। সব গল্পেই ময়ূর-ময়ূরী মানব-মানবী ছিল,

অভিশপ্ত হয়ে পাখি হয়েছে। এই তিন দেশের গল্পে রেশমী কাপড়ের কথা নেই। গারো গল্পটির শেষাংশও কাব্য হয়ে উঠেছে।

হাঃ হাঃ দুই কান কাটা। পৃঃ ১০৭। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লখের আদিবাসী রূপকথা। লখের আদিবাসীদের সংগীত ও লোককথা খুব সমৃদ্ধ। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যেসব লোককথা রয়েছে, তাকে প্রতিবন্ধী মানুষদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাদের ভুল ভ্রান্তিকে নিয়ে হাসির গল্পই গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক সহানুভূতির কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু এই গল্পটিতে অন্ধ দুই ভাইয়ের করুণ অবস্থাটি বর্ণনা করা হয়েছে। একজন অসাধু মানুষ তাদের ঠকিয়েছে, তারা তো চোখে দেখতে পায় না। দুই অন্ধ ভাইয়ের এই কষ্টে মনে ব্যথা জাগে, পাঠকের চোখ সজল হয়ে ওঠে। তারা পথিককে যোগ্য শাস্তি দিতে পেরেছে এই আনন্দে যখন পথ চলে তখন পাঠক বেদনায় বিদ্ধ হন। সমাজে এমন কিছু নিষ্ঠুর মানুষ থাকে যারা স্বার্থের জন্য অন্ধ মানুষকেও প্রতারণা করে। কদর্য মানসিকতা হলেও এটা সত্য। এই লোককথাটি প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে আলাদা, কেননা এদের নিয়ে কোনো ব্যঙ্গ-উপহাস করা হয়নি।

সিঁথির সিঁদুর। পৃঃ ১১১। বিহারের রাঁচি ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁ আদিবাসী রূপকথা। ওরাওঁ, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী পাশাপাশি বসবাসের ফলে এই রূপকথাটি তাদের মধ্যেও শোনা যাবে। তবে ওরাওঁদের মধ্যেই এটি বেশি জনপ্রিয়। জলপাইগুড়ির বানারহাটের কাছে মোগলকাটা চা বাগানে একজন শ্রমিকের বৃদ্ধা মায়ের কাছেও এই গল্পটি শুনেছিলাম। বৃদ্ধার বাবা রাঁচি থেকে এই চা বাগানে আসেন। অনেককাল আগের কথা বৃদ্ধা এখনও গল্পটি মনে রেখেছে না। তার কাছেই শুনেছি, তাদের বিয়েতে এখনও মামা এবং দাদা বিয়েতে গয়না ও কাপড় দেন। তা পরেই বিয়ে হয়। এই রূপকথার মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি-আচার-আচরণ, আইন-ন্যায়-অন্যায়বোধ প্রভৃতিকে ঘিরে বহু রূপকথার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে দৈব আদেশের কথাও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ সেগুলো মেনে চলে। এই রূপকথাতেও আগন্তুক মানুষটির সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিয়েছে। সামাজিক প্রথাকে এভাবেই জনপ্রিয় করা হয়ে থাকে।

দূর আকাশের তারা। পৃষ্ঠা ১১৫। ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট এলাকার গাদাবা আদিবাসী রূপকথা। আকাশের সূর্য চন্দ্র ও অসংখ্য তারা কিভাবে সৃষ্টি হল তার কাহিনী। লোকপুরাণের আভাস, অস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সূর্য-চন্দ্র-তারার জন্মের লোকপুরাণ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলি পূজিতও হয়ে থাকে। এই রূপকথাটি শুনলেই আদিকবি বাল্মীকির শ্লোক-রচনার গল্পটি মনে পড়বে। দুটি গল্পেই শোক থেকে মূল মানসিকতার উৎসার ঘটেছে। আদিকবির মুখ থেকে অভিশাপ বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ কাব্যের। আর সুমুরো স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার ঘটনায় তাদের অমর হবার কামনা জানিয়েছে। এ গল্পের শেষাংশও কাব্য। কোরাপুট এলাকার বোন্দো আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথাটি একইভাবে শোনা যাবে।

রামধনু আর বৃষ্টি। পৃষ্ঠা ১১৬। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের শ্রীকাকুলাম জেলার পার্বতীপুর এলাকার শবর আদিবাসী লোকপুরাণ। দক্ষিণ ভারতে বাস করলেও এদের ভাষা মুণ্ডারি গোষ্ঠীর। কোরাপুট এলাকার সাওরা আদিবাসীদের মধ্যেও এ লোকপুরাণ শোনা যাবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যে শবরদের উল্লেখ রয়েছে। এরা বৃহৎ সমাজের বাইরে পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে ভালোবাসেন। আকাশের রামধনু মানুষের কাছে এক বিস্ময়। তাকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য গল্প রয়েছে। আকাশের দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যে সহজ যোগাযোগ ছিল সেই আদ্যিকালে, এখানেও সে কথার আভাস রয়েছে। এই গল্পে শোকস্তব্ধ পিতা পুত্রকে অমরত্ব দান করলেন। আর স্বামীর মৃত্যুতে সতী নারী সমস্ত জীবন চোখের জল ফেলে চলেছেন। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যে কবিমন লুকিয়ে থাকে, লোককথায় তা এভাবেই প্রকাশিত হয়।

দুঃখ এল মানুষের জীবনে। পৃষ্ঠা ১১৭। ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট এলাকার বোন্দো আদিবাসী লোকপুরাণ। পৃথিবীর লোকপুরাণের ঐতিহ্য হল, আদিপিতা কিংবা দেবতা অনেককিছু সৃষ্টি করলেন, তিনি মানুষও সৃষ্টি করলেন। আমার যত সামান্য জানা আছে তাতে কোথাও দেখিনি,—সবার আগে এল মানুষ, তারপরে দেবতাদের জন্ম হল। কিভাবে এই গোষ্ঠীর মধ্যে এরকম মানসিকতার জন্ম হল তা এক বিস্ময়। বোধহয়, বলা ভালো এ গল্প এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম।

শুধু তাই নয়, মানুষ তার দুঃখ-লাঘবের জন্য দেবতাদের পায়ে সবসময় নত হয়ে থাকে। আর এরা বলছেন, দেবতারাই তাদের দুঃখের কারণ, পুজো প্রচলন হওয়াতে তারা গরিব হয়ে গেলেন। আমার অনুমান, বোনদো আদিবাসীদের যারা পুরোহিতগোষ্ঠী, তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ভয় জাগিয়ে সবসময় নানাধরনের পুজোর বিধান দিতেন। আর চাপ সৃষ্টি করে ফসল-ফল ও অন্যান্য দ্রব্য পুজোয় দিতে বাধ্য করতেন। এই অনুর্বর এলাকার মানুষ এমনিতেই বড় গরিব, তার ওপরে এই অত্যাচার। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ক্ষোভে-দুঃখে তারা দেবতাদের সম্পর্কে এমন ঐতিহ্য-বহির্ভূত ধারনা পোষণ করলেন। এ ব্যাখ্যা সত্য কি না জানিনা, কিন্তু এই ধরনের মনোভঙ্গি আমার জানা আর কোনো লোকপুরাণে পড়িনি। আগে পুজো ছিল না,—এরকম কোনো চিন্তার সন্ধানও কোথাও পাইনি। এ লোকপুরাণটি বিস্ময় জাগায়।

এক পাল বুনো মোষ। পৃষ্ঠা ১২০। বিহার রাজ্যের সিংভুম জেলা, ছোটনাগপুরের হো আদিবাসী রূপকথা। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যেও এ গল্প শোনা যাবে। বুনো মোষ দুর্ধর্ষ, রাগী ও হিংস্র, আবার এই মোষই গৃহপালিত হবে কেমন নিরীহ,—এটা কেমন করে হল? সেই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এখানে। বনের পশু কেমন করে গৃহপালিত হল তার অনেক গল্প রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথায়। এ গ্রন্থের ১৭ ও ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মোষ অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থকরী পশু। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই মোষ সম্পর্কে অসংখ্য লোককথার জন্ম হয়েছে। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান, উত্তর ডাকোটার হিদাট্‌সা, কিওওয়া, আপাচে প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে মোষের অনেক লোককথা রয়েছে। মোষকে ঘিরে এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক লোকাচারও গড়ে উঠেছে। একটি ভালো সরল গরিব মানুষ কিভাবে মোষের দয়ায় তার ভাগ্য ফেরাল, অতি নিপুণভাবে তার বর্ণনা এই গল্পে রয়েছে। তার উপকার করবার প্রবণতার পুরস্কার-স্বরূপ সে এসব পেয়েছে। লোককথায় এই মোটিফ্‌টি খুব পরিচিত।

আদিকালের কথা। পৃষ্ঠা ১২৭। লিট্‌ল্‌ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওংগে আদিবাসী লোকপুরাণ। লোকপুরাণটির মধ্যে গল্পের বাঁধুনি কিছু ঢিলেঢালা। যদিও বছর বাটেক আগে গল্পটি সংগৃহীত হয়েছে, তবু এরকম হবার কারণ

কি? লোকপুরাণের বাঁধুনি সাধারণত খুব সংহত হয়। আসলে ওংগে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই চরম ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন। তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। ১৯০১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৬৭২, ১৯৩১ সালে নেমে এসে দাঁড়ায় ২৫০-এ, ১৯৭১সালে আরও কমে দাঁড়াল ১১২-তে। ১৯৮১ সালে দুটি নবজাতক জন্মায়, আর একবছর পরে ১৯৮২ সালের ২৬ অগাস্টে আর একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। বর্তমান জনসংখ্যা ১১৫। দশ বছরে তিনজন মাত্র বেড়েছে। এইরকম ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে লোকসংস্কৃতিও শুকিয়ে যায়। সেই কারণে তাদের অধিকাংশ লোককথাই খুব ঢিলেঢালা গোছের। ভারতের নৃতত্ত্ববিদেরা এই দ্রুত-নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তিনটি শিশুর জন্মের পর আশার আলো দেখা দিয়েছে। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর উত্তরে চুকচি আদিবাসী গোষ্ঠীরও এই শতাব্দীর গোড়ায় ওংগেদের মতোই অবস্থা হয়েছিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের চেষ্টায় সেখানে এখন আশার আলো দেখা দিয়েছে। ওংগেদের ঘিরেও সেই আশা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর আদিমতম নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর অন্যতম হলেন ওংগে আদিবাসী। তারা এখনও প্রধানত শিকারী ও মৎসজীবী। গল্পটিতে আগুন পাওয়ার কাহিনীও রয়েছে।

সাবাই ঘাসের জন্মকথা। পৃষ্ঠা ১৩২। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতাল আদিবাসী রূপকথা। ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ লোককথা হল সাঁওতালী লোককথা। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন সুপ্রাচীন তেমনি উন্নত। সাঁওতালী সংস্কৃতি ও ভাষা ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। পুকুরে জল আনবার প্রচেষ্টায় কুমারী কন্যাকে উৎসর্গ করার কথা রয়েছে এই রূপকথায়। বহু পুরনো কালে বৃষ্টি ও জলের জন্য কুমারী-বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। তার আভাসমাত্র এখানে রয়েছে। প্রাচীন লোকাচার এভাবেই রূপকথার মধ্যে রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। প্রাচীন আন্দীয় সভ্যতায়, ইন্‌কা ও আজ্‌টেক লোকচারে কুমারী উৎসর্গের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আফ্রিকার বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই শতাব্দীর গোড়ায়ও বৃষ্টির জন্য এই লোকাচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আফ্রিকার কেনিয়া দেশের আকিকুয়ু আদিবাসীদের মধ্যে অনুরূপ একটি গল্প আছে। বছরের পর বছর ধরে প্রচণ্ড খরায় বিপর্যস্ত হয়ে তারা কুমারী ওয়ান-জি-রু-কে গাছের নিচে উৎসর্গ করল। মেয়ের পা যত মাটিতে বসে যাচ্ছে, বৃষ্টি নামছে তত জোরে। মেয়ে মাটির নিচে অদৃশ্য হল, বৃষ্টি

নামল প্রলয়ের আকারে। অবশ্য এই মেয়েকে পরে পৃথিবীর গভীর তলদেশ থেকে উদ্ধার করে এক শিকারী। মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সাঁওতালী গল্পেও জল উঠেছে ছলছল্ করে, মেয়েকে ভাসিয়েছে, পুকুর উপচে পড়েছে। এ মেয়েও পরে বেঁচে উঠেছে। সাবাই ঘাস এই গোষ্ঠীর অর্থকরী ফসল, বড় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তার জন্মকথাও বিবৃত হয়েছে কৃতজ্ঞতা থেকে। দুঃস্থ ভাইদের প্রতি বোনের ভালোবাসা এই গল্পে অনবদ্য আন্তরিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। ফুল নিতে যাওয়ার মুহূর্তে 'সাত ভাই চম্পা'র গল্পের কথা মনে পড়ে।

অনেক সয়েছে সে। পৃষ্ঠা ১৪১। উত্তরপ্রদেশর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ ঘিরে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই এই পশুকথাটি শোনা যাবে। কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী জনগোষ্ঠীর খুব প্রিয় পশুকথা। মুসৌরীর চাক্রাতা এলাকায়, কেমটি জলপ্রপাতের কাছে একজন গাড়োয়ালী মহিলের মুখেও ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে এই পশুকথাটি শুনেছিলাম। পশুকথায় শেয়াল এককথায় দিগ্বিজয়ী। তার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে, অপূর্ব চাতুর্যের ফলে সকলেই পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে বিজয়ী হবেই। খুব অল্প পশুকথায় শেয়ালের পরাজয়ের কাহিনী শোনা যাবে। সে যতই প্রবঞ্চনা করুক না কেন, গল্পের মধ্যে তাকে পরাভূত করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় না। ছোট্ট প্রাণীর বিজয়ের মধ্যে দিয়ে পর্যুদস্ত মানুষ শান্তি পেতে চেয়েছে। এই গল্পটি সামান্য কয়েকটি গল্পের অন্যতম। লক্ষ্য করেছি, যেসব গল্পে শেয়ালের পতন ঘটেছে সেখানে দম্ভই তার মূল। যেমন নীলবর্ণ শৃগাল। এই গল্পেও তাই ঘটেছে। লোকসমাজ অনেক কিছু সহ্য করলেও দম্ভকে বোধহয় সহজে মেনে নিতে পারেন না। এই ধরনের একটি পশুকথা রয়েছে আফ্রিকার কংগো দেশের বুশোংগো আদিবাসীদের মধ্যে। সেখানে বিয়ে হয়েছিল শেয়ালের সঙ্গে সিংহীর। শেয়ালের একই পরিণতি হয়েছিল।

বড় ভালো বৌ তারা দুজন। পৃষ্ঠা ১৪৭। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদি আদিবাসী রূপকথা। আদিদের মধ্যে পানুগি, মিনিয়ং, পদম্, আশিং, বোকার, শিমোং প্রভৃতি ভাগ রয়েছে। আশিং-দের মধ্যেই এই রূপকথাটি বেশি জনপ্রিয়। সিয়াং উপত্যকায় এদের বাস। এই গল্পে কয়েকটি আদি শব্দ রয়েছে। উইয়ু হল আদিদের আত্মা। এদের অধিকাংশ লোককথায় এই উইয়ুর কথা রয়েছে। তালেঙ হল আকাশের অপদেবতা, দুষ্ট আত্মা। এই রূপকথাটি

তিব্বতেও শোনা যাবে। বহু শতাব্দী আগে থেকেই আদিদের সঙ্গে তিব্বতীদের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। ব্যবসায় আদান-প্রদান ছিল ব্যাপক। তিব্বতীরা নিতে আসতেন মিথুন, হরিণের শিং, চাল আর আদিরা কিনতেন নুন, পোশাক, রেশম ও পুঁতির মালা। এই আদান-প্রদানের ফলে লোককথার মিশ্রণও ঘটেছে। একই নামের দেবতা-আত্মা-অপদেবতা দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এই এলাকার লোকথাগুলিতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রভাব বড় বেশি। জীবনাচরণে প্রতি মূহুর্তে এগুলোকে মেনে ও বিশ্বাস করে চলার রীতি রয়েছে, তাই লোককথায়ও সেগুলো স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কুকুর কেন শুয়োর দেখলে তেড়ে যায়, তারও একটি উত্তর খুঁজেছেন তারা এই গল্পে। স্বামীর প্রতি সতী বৌদের ভালোবাসার চিত্রটিও বড় মধুর।

জেগে-ওঠা ভাগ্য। পৃষ্ঠা ১৫২। মধ্যপ্রদেশের ভিল আদিবাসী রূপকথা। উত্তরপ্রদেশের উত্তরে কুমায়ুন এলাকার আদিবাসীদের মধ্যেও এই একই ধরনের রূপকথা রয়েছে। বলতে গেলে, কোনোই রূপান্তর ঘটেনি। লোককথায় ভাগ্যবান ছোটভাই বা ছোট ছেলে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ্। এই ছোট ছেলে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেই। সাধারণত এরা তিন ভাই হয়। ছোট ভাই অধিকাংশ সময়েই হয় বোকা, সরল, স্বল্পবুদ্ধি,—কয়েকটি গল্পে অবশ্য তাকে দেখানো হয়েছে অত্যন্ত চতুর ও বাস্তববাদী হিসেবে। এই ছোট ভাই বড় ভাইদের দ্বারা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়, বিশেষ করে বৌদিরা তার সঙ্গে খুব কুৎসিত ব্যবহার করে। কখনও তাকে মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেওয়া হয়। কোনো সম্পদ লাভ করার জন্য অভিযানে যায় একের পর এক ভাই, সকলেই ব্যর্থ হয় কিংবা ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে মারা যায়। সফল হয় ছোট ভাই, ফিরে আসে বিজয়ী হয়ে। এই রূপকথাটিতে ছোট ভাই অত্যন্ত সরল, সে সব কিছু বিশ্বাস করে। ঘুমিয়ে-থাকা ভাগ্যের কথা সে বিশ্বাস করেছে, বেরিয়েছে অভিযানে। একের পর এক উপকার করেছে, তার পুরস্কারও পেয়েছে। ভালো মানুষের প্রতি সমাজের দুর্বলতা থাকে। বোধহয় সমাজে তাকে পর্যুদস্ত হতে হয়। এখানেও বঞ্চিত হতভাগ্য ছোটভাই গুপ্তধন পেয়েছে, পেয়েছে সর্দারের কন্যাকে। ছোট ভাইয়ের এই সফলতার কাহিনী পৃথিবীর অধিকাংশ লোকসমাজের গল্পেই রয়েছে। নাইজেরিয়ার হাউসা আদিবাসীদের একটি দীর্ঘ রূপকথা আছে,—ভাগ্যবান ছোট ছেলে। এই গল্পের সঙ্গে বিশেষ মিল রয়েছে।

ট্যাটন। পৃষ্ঠা ১৫৭। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিকির পাহাড়ের মিকির আদিবাসী রূপকথা এরা অত্যন্ত পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। মূলত কৃষিজীবী। সমাজ খুব সংহত। সমাজে গাঁও-বুড়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনবদ্য সব লোককথা রয়েছে এদের মধ্যে। সমাজে মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক যত মধুরই হোক না কেন, আমাদের দেশের লোককথায় এই সম্পর্কটি কিন্তু আদৌ মধুর নয়। বিশেষ করে ভাগ্নে যদি পিতৃহীন হয়। আবার ভাগ্নে যদি ট্যাটন হয় তবে মামারা তার প্রতিফল ভোগ করেন। যেমন করেছেন এই গল্পে। মানুষ ট্যাটনের বহু লোককথা ভারতে রয়েছে। মামা-ভাগ্নেকে নিয়ে অন্য দেশে তেমন লোককথা গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য গল্প রয়েছে। বোধহয় এখানকার সমাজের পারিবারিক বন্ধনের বিশেষত্বই এর কারণ। এই গল্পের ট্যাটন কিছুটা নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধ-পরায়ণ। তবে মামা-ভাগ্নেকে নিয়ে লঘু-চালের লোককথাই বেশি।